ISSN: 2320-9275

বাঙালির আত্মপরিচয় বিশেষ সংখ্যা

২০১২-২০১৩ যুগ্ম সংখ্যা

ঔদালিক

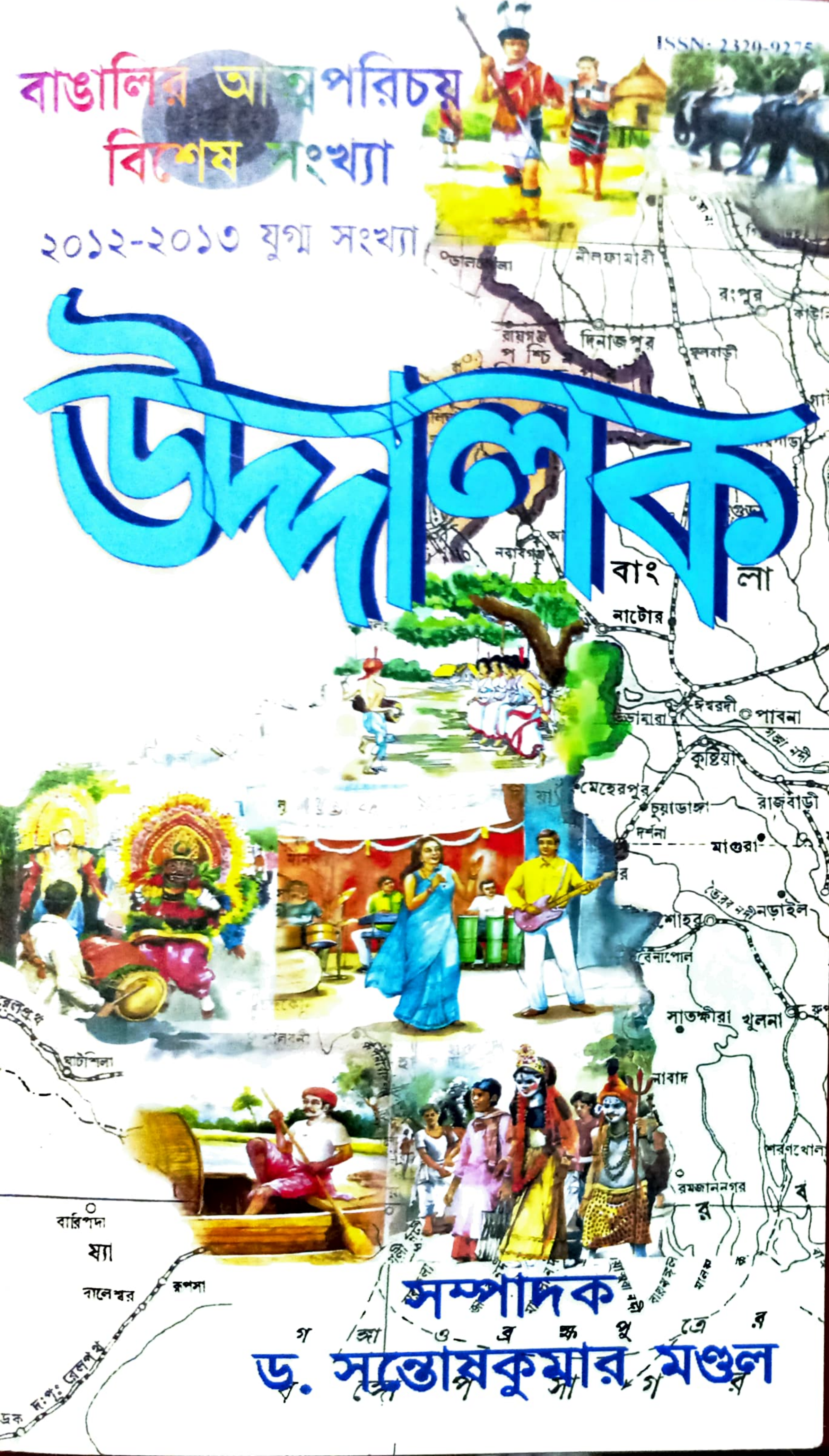

সম্পাদক
ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

উদ্দালক

ষা ণ্মা সি ক সা হি ত্য প ত্রি কা

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষ যুগ্মসংখ্যা

২০১২-২০১৩

বিষয়

বাঙালির আত্মপরিচয়

সম্পাদক

সন্তোষকুমার মণ্ডল

সহসম্পাদক

অমিত দে অনুপ বিশ্বাস কিঙ্কর মণ্ডল

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯

Uddalak Sahitya Patrika, Special issue : Bangaleer Atmaparichaya, 2012-'13 edited by Dr. Santosh Kumar Mandal. Sub-editor : Amit De, Anup Biswas & Kinkar Mondal.

© সম্পাদক

প্রকাশক : সন্তোষকুমার মণ্ডল
উদ্দালক পাবলিশিং হাউস
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯
দূরভাষ- (০৩৩) ২৫৪১ ৪৬১৭

মুদ্রক : সুকান্ত ঘোষ
নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষৎ স্ট্রিট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : তুহীন ঘোষ

পরিবেশক : পাতিরাম, দে'জ, প্রজ্ঞাবিকাশ কলেজ স্ট্রিট।

মূল্য : ৭৫ টাকা
Price: Seventy five rupees only.

সম্পাদকীয়

'জীবনের যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'

-তাইতো বারবার চেষ্টা করি, সময়ের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াই। সত্তার গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক পিতৃত্বের হাহাকারে চিৎকার করে বলি- 'উদ্দালক! বাপ উঠে আয়'। বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিয়েছে, আমার এই মানস-সন্তান। নবযৌবনের সৌন্দর্যে-কলেবরে এখনই তো ওর বিকশিত হয়ে ওঠার সময়। নবযৌবনের শুভলগ্নে উদ্দালককে ISSN –এর রাজটীকা পড়িয়ে দিতে পেরেছি। যৌবনের শক্তি, সাহস আর শৌর্যে উদ্দালক বিকশিত হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস রাখি। শুধু এই কর্মযজ্ঞে শুভানুধ্যায়ী লেখক-পাঠকদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। দু'হাজার বছরের আগের ইতিহাস তার জানা নেই। যেটুকু জানা আছে, তাও আবার বিদেশি লেখকদের লেখা, যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সাহেব পাখী মারিতে গেলে ইতিহাস লেখা হয়, বাঙ্গালীর ইতিহাস কই?' বাঙালির ইতিহাস থাকা না-থাকার আবর্তে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানোর প্রয়াস পাওয়া গেছে বর্তমান সংখ্যায়। ঝিনুকের মুক্তা খোঁজার মতোই অনিশ্চিত আর শ্রমসাধ্য এ প্রয়াস। তবু এ প্রয়াসে যাঁরা সামিল হয়েছেন, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই, আমার কর্মসহযোগী তিন বন্ধুকে, যাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই সংখ্যার প্রকাশ সহজ হতো না।

সন্তোষকুমার মণ্ডল

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত গ্রন্থ :

রবীন্দ্রসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ :

পুলিন দাস	মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ ২৪০
সন্তোষকুমার মণ্ডল	রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য ১০০ রবিকিরণে নবরত্ন ৬০ রবীন্দ্রকাব্যনাট্য : রূপ ও রূপান্তর ৯০ রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন (সম্পাদিত) ২২৫

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সহায়ক গ্রন্থ :

সন্তোষকুমার মণ্ডল	নেট বাংলা দ্বিতীয়পত্র ৪৮০ নেট বাংলা তৃতীয়পত্র ৩৪৫ নেট জেনারেল প্রথমপত্র ৩৫০ এস.এস.সি টেট ১৮০ এস.এস.সি বাংলা (পাস) ১৮০ এস.এস.সি বাংলা অনার্স/ পি.জি ২২৫

শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ :

সন্তোষকুমার মণ্ডল	দূরশিক্ষা দিশারী বাংলা (রবীন্দ্রভারতী) এম.এ পার্ট-১ ৩০০

সৃজনমূলক গ্রন্থ :

বীথি চট্টোপাধ্যায়	আত্মজ (গল্প সংকলন) ৬০

উদ্দালক সাহিত্য পত্রিকা : কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা ছাড়া পুরানো সংখ্যাগুলো এখনো পাওয়া যায়। সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রকাশনা দপ্তর
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯
ফোন- (০৩৩) ২৫৪১ ৪৬১৭
ই-মেল- chai-chai@uphouse.com
ওয়েবসাইট- www.uddalakpublishing.com

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠাঙ্ক
বাঙালির স্বকীয়তা ও বাংলা ভাষা	ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৭
শিকড়াভিলাষী চৈতন্যের সন্ধানে	ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪
বাণিজ্যে বসতি বঙ্গলক্ষ্মী : বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়	ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল	২৪
সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে সুন্দরবন	সঞ্জয় ঘোষ	৩০
বাঙালির সাংস্কৃতিক মিশ্রণ : আদিবাসী জীবনচর্যা- প্রেক্ষিত সুন্দরবন	শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম	৪১
বঙ্গসংস্কৃতি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতি	সুজাতা পড়্যা	৫৬
মুর্শিদাবাদের বাঙালি-মুসলমানের মিশ্র লোকাচার	বিপত্তারণ প্রহরাজ	৬৫
সেকাল ও একালের বঙ্গসমাজ : ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	আবু হান্নান গাজী	৭৩
মধ্যযুগের বাঙালি : আহার বিহার বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা	সোনা মণ্ডল	৮০
বাঙালির সাংস্কৃতিক অভিমুখ	অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৯৯
বাঙালির আত্মপরিচয় : আমার ভাবনায়	ড. রাহুল চট্টোপাধ্যায়	১১০
সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনার বঙ্গীয় পথিকৃৎ : বিদ্যাসাগর	সবিতা মণ্ডল	১১৯
'আমি নারী, আমি মহিয়সী' অনবদ্য বঙ্গরমণী	অমিত দে	১৪২
মসিজীবী বঙ্গনারী শৈলবালা ঘোষজায়া: আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে	সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার	১৫১
বাঙালির আবৃত্তিশিল্প	কিঙ্কর মণ্ডল	১৫৭
বাঙালির কল্পবিজ্ঞানচর্চা	ঈশিতা খাঁ	১৬৮
বাঙালি মধ্যবিত্তের বাসস্থানসঙ্কট: বারো ঘর এক উঠোন	গায়ত্রী আচার্য	১৮১
প্রবাসী বাঙালি : প্রসঙ্গ প্রবাসী পত্রিকা	প্রত্যুষকুমার রীত	১৮৮
বাঙালি খ্রিস্টান-সংস্কৃতি: ধর্মীয় মূলানুগত্য ও বঙ্গীয় ঐতিহ্য	নির্মলকুমার বিশ্বাস	১৯৩

বাঙালির স্বকীয়তা ও বাংলা ভাষা

ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা কয়েকটি বিশেষ উপাদানের প্রেক্ষিতে দানা বাঁধে। যেমন, রাষ্ট্র / রাজ্য / প্রদেশের ভৌগোলিক সীমা, জীব ও জড়প্রকৃতির বেষ্টনী এবং বি-সমধর্মী সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল – যার মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে একদিকে লোকজীবনের সংস্কার, প্রথা, বিধিনিষেধসম্বলিত প্রায়-অনড় জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং অন্যদিকে 'এলিট' বা উচ্চমানের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রেণির মানুষের নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনযাপন ধারা। এই উপাদানগুলির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় এক ধরনের সমসত্ত্ববিধায়ক প্রচেষ্টার অন্তঃস্রোত কাজ করে চলে। পরন্তু সেই গোষ্ঠীর স্বকীয়তার একটি আবশ্যিক বাঁধনশক্তি হলো তার ভাষা, তার নিজস্ব ভাষাসংস্কৃতি। বাংলাভাষা বাঙালির স্বকীয়তার এক অনন্য প্রীতিময় উপাদান।

এই সমস্ত বিচিত্র উপাদান-সহযোগে জাতিসত্তা যেমন ক্রমশঃ গড়ে উঠতে থাকে ও বিকশিত হয়, তেমনি তার জৈবনিক অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি থেকে জন্ম নেয় তার অস্মিতা, তার "আমি বাঙালি" সূচক অহংবোধ, যা তার স্বকীয়তাকে প্রকট করে তোলে। সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং অস্মিতা রূপ পরিগ্রহ করে প্রধানত যে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে, তাদের অন্যতম হল তার নৃতাত্ত্বিক সংগঠন, তার মৌসুমী জলবায়ুলালিত আলস্যপরায়ণ কঠিনশ্রমবিমুখ আচরণ ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তার খাদ্য-বস্ত্র-আচার-অনুষ্ঠান-দেবদেবী-পূজাপার্বণ-এর বারোমাস্যা। এসব বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা এই সীমিত প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। তার জন্য শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনদের প্রামাণ্য গবেষণা ও সুবিস্তৃত বিশ্লেষণসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

উপরিউক্ত উপাদানগুলির মধ্যে যেটি অন্যতম ও সর্বাগ্রগণ্য, তা হলো সেই জাতি বা গোষ্ঠীর মাতৃভাষা। এটি একাধারে রক্ষণশীল ও পরিবর্তনশীল। লেখক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রমুখ বিদ্যাজীবী মানুষেরা এই ভাষার হস্তাবলেপ থেকে সযত্নে রক্ষা করতে চান। একে বলা যায় ভাষার অন্তর্নিহিত

রক্ষণশীলতার ধর্ম। অন্যদিকে, ভাষাতাত্ত্বিকেরা যেমন বলেন, ভাষা বহতা নদীর মত, এতে একদিকে যেমন তার উৎসক্ষেত্রের মৌলিক মৃত্তিকাকণা থাকবে, তেমনি গতিপথের নানা বিচিত্র উপনদী-জলধারা একে নিয়ত পুষ্ট, সমৃদ্ধ, স্বচ্ছন্দ ও পরিবর্তিত করবে। ভাষাও তেমনি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষা-উপভাষার শব্দ বাগ্‌ধারা ইত্যাদিকে গ্রহণ ও আত্মীকরণের প্রচেষ্টা করবে, এতেই তার পরিবর্তনশীলতা।

মাতৃভাষা একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বতন্ত্র-পরিচয়ের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক; তেমনি অন্যদিকে সমগ্রজাতি বা গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের আবেগ, মনন, ও চিন্তনবিকাশের অনন্য উপকরণ। বাংলাভাষা তার সুবিস্তৃত ভৌগোলিক ও পরিবেশিক প্যানোরামার মধ্যে সর্বত্র একই রূপে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হয়না। অঞ্চলবিশেষের উচ্চারণরীতির পার্থক্য , শব্দভাণ্ডারের নামপদবিন্যাসবৈচিত্র্য ও ক্রিয়ারূপের গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারে এবং অবশ্যই বিভিন্ন উপসংস্কৃতিবলয়ের নিজস্ব বাগ্‌ধারা-প্রবাদ-প্রবচনকে সমন্বিত করে নিয়ে উপভাষাবৈচিত্র্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

উপভাষাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট উপভাষা মূলতঃ সেই এলাকার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য সামাজিক প্রভাবের ফলে কৌলীন্য ও মর্যাদা অর্জন করে এবং সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের শিষ্ট সামাজিক ভাববিনিময়ের ও ভাষিক প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করে। ভাষাবিজ্ঞানে এর নাম দেওয়া যায় Standard Colloquial Dialect বা SCD। এই নিয়মেই বাংলার বাণিজ্যিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি কলকাতার উপভাষা উনিশ-বিশ শতকের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙালির 'অফিসিয়াল' ভাষিক আচরণের শিষ্ট চলিত রূপ হিসেবে গড়ে উঠলো।

এখানেই প্রথম প্রশ্নের অবতারণা করে রাখা যাক, যার উত্তর সম্বন্ধেই নানা বিতর্ক উত্থাপিত হতে পারে।

বাঙালির যে 'আইডেনটিটি' বা স্বকীয়তার অনন্য উপাদান তার 'গরব' ও 'আশা' বাঙলাভাষার এই বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষাগুলির মধ্যে কোনটিকে আশ্রয় করে আছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বাঙালি তার নিজস্ব উপভাষাকে গৌণ করে শিষ্ট মান্যচলিত বাংলাকে আপন ভাষা বলে মেনে নেয় কি? একইভাবে, মুর্শিদাবাদ মালদহের প্রাকৃতজন কলকাত্তাই শিষ্টচলিত মান্য বাংলাকে সহ্য করে, স্বীকার করে কি? চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ গ্রাম-শহর-শহরতলি

এলাকায় বসবাসকারী, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তু হয়ে আসা যে কয়েক কোটি মানুষ, তাঁরা সবকিছু বিসর্জন দিয়েও ওপার বাংলার নিজ নিজ বাসভূমের প্রিয় উপভাষা থেকে 'সুইচ ওভার' করে শিষ্টচলিত SCD কে মান্যতা দিতে রাজি আছেন কিনা, সে-কথা তাঁদের আবেগকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে।

অথচ সব ভাষাতেই শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রাঞ্চলের SCD কে এক ধরনের ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ প্রচলন করে। যার ফলে সব অঞ্চলেরই শিক্ষিত মানুষ কর্মক্ষেত্রের সাংস্কৃতিক দাবিতে এবং সামাজিক কৌলীন্যের প্রত্যাশা ও উচ্চাশায় ভাষার এই দ্বিতীয় identity-কে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করার প্রয়াস করেন। বাঙালিরাও এর ব্যতিক্রম নন।

এর ফলে প্রতিটি জেলা / অঞ্চলের প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা এবং নগরকেন্দ্রিক শিষ্ট শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষার মধ্যে এক অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ সূক্ষ্ম ফারাক গড়ে ওঠে। অথচ উভয়ের কাছেই বাঙলাভাষা তাদের অতিপ্রিয় জাতিগত identity । আগেই বলা হয়েছে, এ বিষয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, অঞ্চলের উপভাষা এবং পূর্বপ্রান্তের চট্টগ্রামের উপভাষা – উভয়ই যে বাংলা ভাষা, এ প্রায় কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হলো, বাংলাভাষার সমাজভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন। যাবতীয় উপভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম-স্থূল পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাভাষাকে বাংলা বলে চিনে নেওয়া যায় কিসে? এর উত্তর-

(১) এর Vocabulary বা শব্দভাণ্ডার। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে কিছু তৎসম শব্দ, কিছু তৎসম থেকে সরলীকৃত তদ্ভব শব্দ; অনেকটাই দেশি বাংলা ও অজ্ঞাতমূল কিন্তু বহুল প্রচলিত শব্দ এবং প্রচুর বিদেশি শব্দ, যাদের সংখ্যা ও ব্যবহারপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

(২) এর ক্রিয়ামূল ও শব্দমূলের সঙ্গে প্রযুক্ত নানা প্রত্যয়-বিভক্তির বৈচিত্র্য যা নিয়তই নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে এবং সৃজনশীলচিন্তার ভাষিক রূপায়ণপ্রয়াসে। এই প্রবণতা বিস্তৃত হয় মূলতঃ সামাজিক প্রেক্ষিতে, সমাজের বিভিন্ন আর্থসামাজিক – সাংস্কৃতিক স্তরের মানুষের বাক্যে শব্দ বাছাইয়ের অগ্রাধিকার ও পছন্দের ক্ষেত্রে।

(৩) শব্দের মধ্যে ধ্বনি / বর্ণের সংস্থান এবং বাক্যে শব্দের সংস্থান – এই ব্যাপারে নিয়মের শাসন ও শৈথিল্য যে পর্যন্ত বাংলাভাষা মেনে নেয় , তাই

এর Syntax এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বাংলাভাষার এই আঙ্গিকচারিত্র্য নিয়ে কবি সাহিত্যিক কথাকার ভাষাশিল্পীরা অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। সকলেই এই রীতি না মেনে পারেননি। দু-একটি সহজ উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। শব্দের বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে উদাহরণ যেমন, 'অনেক মানুষ একা হয়েও একটি কাজে অতিমাত্রায় একাগ্র হতে পারেন দলাদলি না করেও'। এই বাক্যে 'অনেক'-এর অ, 'একা'র এ, 'একটি'র এ, 'অতি'-র অ, 'একাগ্র'-র এ, 'দলাদলি'-র প্রথম দ ও দ্বিতীয় দ, – এদের উচ্চারণ লক্ষ করুন। খাঁটি বাংলা উচ্চারণ কী, তা বলে দিতে হবে না বোধহয়।

বাক্যের Syntax নিয়ে উদাহরণ, 'তিনি প্রত্যহ প্রভাতে নদীতীরে ভ্রমণ করেন'– এই বাক্যে বাক্যান্তর্গত শব্দগুলির সংস্থান নানাভাবে পাল্‌টানো যায়। কিন্তু কোন পর্যন্ত বাঙলা ভাষা সহ্য করে এবং কখন করে না, দেখা যাক।

'প্রত্যহ প্রভাতে তিনি ভ্রমণ করেন নদীতীরে' – এও সহ্য করা যায়। কিন্তু যখন সংস্থানটি এই রকম হয়, 'প্রত্যহ ভ্রমণ তিনি নদীতীরে প্রভাতে করেন'- এই বাক্যকে কখনোই বাঙালি বাংলা বলে মেনে নেবে না। এইভাবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, এবং তাদের বিশেষণ ইত্যাদি নিয়ে বাক্যসংস্থান কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে।

এ পর্যন্ত dialect বা উপভাষা ও বাক্যরীতি প্রসঙ্গে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করা গেল। এই প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য কিছু ভাষারূপের উপর আলোকপাত করা যাক। একই মানুষ, নানা উপসমাজবৃত্তের বাক্‌বৈশিষ্ট্য অনুসারে নানারকম ভাষারূপ তৈরি করে নেয়। এদের বলা যায় Sociolect। এও এক ধরনের উপভাষা, এবং অবশ্যই তা ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের মানস-ভূগোলের ভাবনা ও চাহিদাসঞ্জাত। সমবয়সীদের আড্ডায় এক ধরনের ভাষারূপ, সেই একই মানুষ বাড়িতে বয়স্কদের সামনে কথাবার্তায় অন্য একরকম; আবার অফিসে, কর্মক্ষেত্রে, সাহিত্যিক আলোচনায় বক্তৃতায় সম্পূর্ণ অন্য এক শিষ্ট মার্জিত ভাষারূপ। অথচ এরা সবাই বাংলাভাষা-বর্ণালীর নানা বিচ্ছুরণ।

আবার, ব্যক্তিগতভাবে, বিশেষত অধ্যাপক, বক্তা, অভিনেতা, বেতার-দূরদর্শনের নানা মাপের শিল্পী ও কলাকুশলী, সাহিত্যিক, কবি আবৃত্তিকার ইত্যাদি স্তরের বিদ্যাজীবী ব্যক্তিত্ব(?)রা নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গি, ধ্বনিক্ষেপণ, পরিমার্জিত ও সুনির্বাচিত বিষয়স্পর্শী শব্দভাণ্ডার (vocabulary) ও তদনুযায়ী বাক্যবিন্যাসে এক অতি নিজস্ব বাচন ও লিখনশৈলি সযত্নে নির্মাণ করেন,

একে বলা যায় idiolect। এটি বিশিষ্টভাবেই তাঁর নিজস্ব identity.

এছাড়া আরো এক বিচিত্র ভাষারূপ ব্যবহৃত হয় নানা পেশা ও জীবিকার মানুষের নিজস্ব ব্যবসায়িক / পেশাগত গোষ্ঠীর মধ্যে। তাদের শব্দব্যবহার, বাগ্‌ধারা, বাক্যে কিছু শব্দ-উপাদান যা কেবল সেই গোষ্ঠী (group) –র শ্রোতারাই অনুধাবন, আস্বাদন ও তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারেন। যেমন, বিভিন্ন চাকুরিজীবী, তথ্যপ্রযুক্তিশিল্পের কারিগর বা যন্ত্রবিদ, ম্যানেজমেন্ট জগতের সেলস্‌ম্যান গোষ্ঠীর পেশাদার মানুষ – এরা এক বিশেষ সমাজবৃত্তের মানুষ; অন্যদিকে, তথাকথিত রুচিশীল নন, এমন মানুষ – বাস, ট্রাক অটোচালক সহকারী, গরু-ছাগল-শুয়োর ব্যাপারী, সবজি-মাছ ইত্যাদির কারবারি ও ব্যবসাদার, রেসুড়ে, জুয়াড়ি ইত্যাদি মানুষ – এদের সকলেরই নিজ নিজ ছোট ছোট উপদলের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ কথোপকথনের বিশিষ্ট শব্দ সম্বলিত ভাষারূপ আছে। একে বলা হয় jargon। এর মধ্যে প্রচুর মিশেল থাকে মেঠো ইংরেজি, বাংরেজি, (বাংলা শব্দাংশ+ইংরেজি শব্দাংশ), হিংলিশ (হিন্দী শব্দাংশ+ ইংরেজি শব্দাংশ), বাঙদি (বাংলা শব্দাংশ+হিন্দী শব্দাংশ) ইত্যাদি নিত্যনতুন গড়ে ওঠা শব্দ। বিশেষত হিন্দী ফিল্মের সংলাপের ভাষা, গানের ভাষা, বাংলা-হিন্দী মার্জিত ও অমার্জিত গ্রাম্য(?) Slang –এর অবাধ ব্যবহার।

Jargon (জারগন) অর্থে অনেকে কেবল এমন কিছু বিশেষ শব্দকেই বোঝাতে চান যেগুলি বিশেষ সব গোষ্ঠীর মানুষের কথনে বেশি পছন্দের বা ঈষৎ গোপনতা-গন্ধী বক্তব্য বা বার্তা বহনে স্বচ্ছন্দ ও সুসংবাহী। অনেকে আবার jargon বলতে সার্বিকভাবে এদের কথ্যভাষার বিশেষ রূপটিকেই বোঝেন। বিষয়টা আসলে শব্দই, কেবলমাত্র বাংলাভাষার syntax মেনে শব্দগুলিকে গুছিয়ে পরিবেশন করাই প্রধান বিবেচ্য।

এ পর্যন্ত কিছু ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা গেল বাঙলাভাষার রূপবৈচিত্র্য, খণ্ডতা ও অখণ্ডতাকে স্পর্শ করতে করতে। নেপালীরা দার্জিলিং-এ একসময় আন্দোলন করেছিলেন, তাদের প্রিয় ভাষা নেপালীর স্বীকৃতির জন্য; স্লোগান ছিল 'ভাষা হামরো প্রাণ হৈ'। মাতৃভাষা বাংলাভাষার স্বীকৃতি ও সম্মানের জন্য সেকালের পূর্ববাংলা এবং একালের বাংলাদেশের অনেক মানুষ শহীদ হয়েছেন, এ সবই 'মোদের গরব মোদের আশা' বাংলাভাষার সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা-অনুভবের রোমাঞ্চ ও স্বকীয়তার বিন্যাস। কিন্তু বাংলাভাষার সম্পর্কে এতটা রোমান্টিকতার রসবিলাসে আপ্লুত করে দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ

করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একটু আত্মসমীক্ষা করতে চাই। যা বাঙালির মজ্জাগত নয়। যদি বহতা নদীর একটি নমুনা হিসেবে আমাদের গঙ্গামাঈ-কে বিবেচনা করি, তবে হরিদ্বার থেকে কানপুর এলাহাবাদ হয়ে, বারাণসী হয়ে, পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলের যে বিপর্যয়ী বর্জ্যস্তূপ – তরল ও অ-তরল– নিয়ত সেই পুণ্যপ্রবাহিনীর অঙ্গকে পঙ্কিল ক্লেদাক্ত ও বিষাক্ত করছে, তাকেও তো এই বহতা নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। বাংলাভাষাও সেই রকম বিপর্যয়-দূষণের শিকার হচ্ছে না তো। আবেগপ্রবণ যে বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিবাণ বাঙালিপ্রবর প্রতি ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোয় যান, রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে নিয়মিত বা অনিয়মিত নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দর্শকাসন অলঙ্কৃত করেন, তাঁদের শিশুরা ইংলিশ মিডিয়ামের টাই-স্যুট-ইউনিফরমে, স্কুলবাস, বিদ্যালয়-পরিবেশ, মিস্-আন্টিদের ইংরেজিভাষায় কথোপকথনের আগ্রহাতিশয্যে– এসবের মধ্যে বড় হতে হতে কখন যেন 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'কে বর্জ্যপুঞ্জের বস্তু করে ফেলতে সক্ষম হয়। একদিন পথে শুনলাম, এমনি এক শিশুর অভিভাবিকা অপর এক মহিলাকে বেশ গর্বের সঙ্গে বলছেন, 'আমার সোনা আবার বাঙলায় বিষোণ বিষোণ বীক (week) জানেন তো'-। ছেলেবেলা থেকে বাংলাভাষাকে এই যে অনিবার্য অবহেলা করার শিক্ষা – এ এক সাংস্কৃতিক দূষণ।

আবার, যে রকম দ্রুততার সঙ্গে সায়াহ্নজগতের (অন্ধকারজগতের বলা যাবে না) উপদল বা গোষ্ঠীর jargon বাংলাভাষার বহতা নদীতে নিয়ত মিশে যাচ্ছে এবং কিছু আধুনিক (?) সাহিত্যিক-সাংবাদিক রম্যরচনার মোড়কে এই সব মিশ্রণকে 'তোল্লাই' দিচ্ছেন এবং আপামর পাঠক সেই সব ফিচার-কে খুব নিচ্ছে (বা খাচ্ছে), তাতে গঙ্গানদীর দূষণের সঙ্গে, ভাষা-প্রবাহের এই দূষণকে সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। এই যদি বাংলাভাষার ভবিতব্য হয়, তবে রক্ষণশীল ভাষা-প্রেমিকদের অসহায়ভাবে এই দূষণায়নকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

দূষণ আরো অনেক মাত্রায় ঘটে। বানানে নৈরাজ্যজনিত দূষণ, উচ্চারণে উপভাষা-প্রাধান্য ছাড়াও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষার অনাগ্রহ, ছাত্রাবস্থা থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারের দৈন্যহেতু বাক্যে অযথার্থ শব্দপ্রয়োগের ব্যভিচার।

বাংলাদেশে যদিও কোন আঞ্চলিক উপভাষাই মান্যশিষ্ট standard colloquial নয়, তবুও সেদেশে মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা কিভাবে এই বহতা নদীকে দূষণমুক্ত রাখা যায়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা শাহরিক উচ্চবিত্ত

বাঙালির ঔদাসীন্যের ও অনুকম্পার শিকার; বিদ্যালয় স্তর থেকে যাতে শিশুরা বাংলাভাষা (মাতৃভাষা) শিখে সময় নষ্ট না করে তার জন্য সদা-সতর্কতা। অন্যদিকে, লোকসাধারণের কথোপকথনে প্রতিনিয়ত এই অ-শিষ্ট jargon ও slang –বিকীর্ণ অপভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার – এই উভয় শ্রেণির মধ্যদেশে অবস্থান করেন যাঁরা – যাঁরা বুদ্ধিজীবী / বিদ্যাজীবী মানুষ, মুখ্যত মসীজীবী , শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, অফিসার, কেরানি ইত্যাদি, তাঁরা এই উভয় প্রবণতার মধ্যে বাংলাভাষার রক্ষণশীলতা ও বহমানতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের পথ সন্ধান করেন; পত্রপত্রিকা, বইমেলা, খ্যাতিমান ও উদীয়মান কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দূরদর্শনের পাদপ্রদীপের দীপ্ত তারকা বাহিনীর দ্বারস্থ হন। এখন প্রশ্ন, বাঙালি যে বাংলাভাষার সঙ্গে তার identity নিয়ে গর্ব করে, সে বাংলাভাষার আধুনিক প্রোফাইলটি কেমন। সে কি এমন মডার্ণিটি যাতে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' তার ক্লাসিক রূপ বর্জন করে Creative মিক্স্ ও রিমিক্স্-এর সৌজন্যে 'রবিঠাকুরের গান'-এ পর্যবসিত হচ্ছে!

......

শিকড়াভিলাষী চৈতন্যের সন্ধানে

ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাঙালির আত্মপরিচয়' প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই 'বাঙালি' শব্দটিতেই জানা-অজানার একটা রহস্যময় চিন্তা এসে যায়। 'বাঙালি'র উদ্ভব ,বিকাশ সম্পর্কে সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাননীয় নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে। নানা প্রথিতযশা 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখকের গ্রন্থেও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অতএব তার আলোচনার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি, বঙ্গে বসবাসকারী বঙ্গভাষী সমস্ত শ্রেণির, বর্ণের মানুষই বাঙালি। সেদিক থেকে মুচি-মেথর, ডোম, লায়েক, বাউরী, মাঝিরাও বাঙালি। আবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতি তাঁরাও বাঙালি। আদিবাসী সাঁওতাল, মুসলমান তাঁরাও বাঙালি গোত্রভুক্ত। কিন্তু কথা হল, এঁদের বিপরীতে আর্যদীপ্ত যে শিষ্ট বাঙালি সমাজ আছেন, তাঁরা কি তা স্বীকার করেন? বাঙালির আত্মপরিচয় অর্থে তো তাঁদের সবার সংস্কৃতি, আচার ইত্যাদি। সেখানেই 'শিষ্ট বাঙালি' আর 'অশিষ্ট' বা 'ছোটলোক বাঙালি' দুটি অনস্বীকার্য বিভাজন এসে যায়। এবং খুব স্বাভাবিক নিয়মেই বঙ্গসংস্কৃতির নিয়ামক শিষ্ট বাঙালিসমাজ। ছোটলোক বাঙালির সংস্কৃতি এখনো সেখানে ব্রাত্য। যতটুকু গৃহীত তা পেশাগত তাগিদে। কর্মক্ষেত্রে সহজে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি সোপান হিসেবে। সঙ্গত কারণেই শিষ্ট সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের একটু নেকনজরেই থাকতে হয় অশিষ্ট সংস্কৃতির মানুষ-জনকে। এমন কি তাঁদের বিষয়ে মনযোগী ছাত্র বা গবেষকদেরও শিষ্ট সংস্কৃতির শান্ত , ভদ্র, বিনয়ী উদ্ধারকর্তাদের উন্নাসিকতার সম্মুখীন হতে হয়। তখন সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত, বহুচর্চিত বক্তব্যটি ম্লান হয়ে যায়-লোকসংস্কৃতি বা ছোটলোকের সংস্কৃতি আমাদের চিরাচরিত সংস্কৃতির শিকড়। তার উপরে ভিত্তি করে শিষ্ট সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার ইত্যাদি। কবি ব্যক্তিগতভাবে এই অশিষ্ট বাঙালির সংস্কৃতিকে অন্বেষণ করেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন; আত্মস্থ করেছেন। আবার বিশ্বের দরবারে পরিবেশন করেছেন।

তাহলে সত্যদ্রষ্টা কবি কি বর্তমান শিষ্ট শিক্ষিত বাঙালি-গোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে পরা মানুষ? 'হ্যাঁ'- বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু তবুও ....।

জানা-অজানার রহস্যময়তা এখানেই। শিষ্ট বাঙালিসমাজ সংস্কৃতির ভিত লোকায়ত সংস্কৃতি জেনেও অন্তর থেকে অস্বীকার করার প্রবণতা এখনও আর্যদর্পী বাঙালির ষোলআনা। এখনও শিষ্ট সাহিত্যের ইতিহাসে লোকায়ত সংস্কৃতি তেমন ভাবে ঠাঁই পেল কই? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তো শিষ্ট-শিক্ষিত রচয়িতা আর তাঁদের রচনার ইতিহাস। সেখানে নিরক্ষর অশিষ্ট সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কিংবদন্তী, গল্প, সংগীত-এর এক অর্থে কোন স্থান নেই। এগুলি কি বঙ্গসংস্কৃতির বহির্জগতে অবস্থিত? নাকি ছোটলোকের সৃষ্টি বলে তার মননশীলতা নেই? নাকি সুস্থ সংস্কৃতির অন্তরায়? এসব কিছুর উত্তর একটাই- 'না'। দেশে-দেশে, কালে-কালে শিষ্ট সংস্কৃতির মানুষ যেভাবে লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে রসদ আহরণ করেছেন এবং করছেন – সেটিই তার প্রমাণ। তার বাজার মূল্যও কম নয়। কিন্তু তবুও বঙ্গসংস্কৃতির সারস্বত সম্প্রদায় লোকসংস্কৃতি আজও অপাঙক্তেয়। অনেকটা পেট ভরিয়ে না-খাওয়ার অভিনয় করে বদনাম দেওয়ার মতো।

এরপরেও 'বাঙালির আত্মপরিচয়' নামক বিস্তর-বিস্তৃত বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনায় আমি ছোটলোক বাঙালির সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতিরই কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে চাইছি। জেনেছিলাম, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে চীনা তরুণের দল রাজতন্ত্রের উপর গভীর বিদ্বেষ থেকে রাজারাজড়ার পুরানো সমস্ত নিদর্শনগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। জননেতা মাও-সে-তুঙ তা সমর্থন করেননি। তিনি বলেছিলেন , রাজারাজড়াদের প্রাসাদ , পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে যাবতীয় বিলাস-ব্যসনের বস্তুসামগ্রী কোনটিই তাঁদের তৈরি নয়। সেইসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি চীনের লোকসংস্কৃতির নিদর্শন। তাই জাতীয়তাবাদী চেতনা ঋদ্ধ 'মাও' সেইসব প্রত্ন-প্রাচীন নিদর্শনগুলি অক্ষত রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বান তরুণদের মর্ম স্পর্শ করেছিল। এই জায়গা থেকেই আমি আমার জন্মভূমি প্রান্ত-পশ্চিম বাংলার লোকসংস্কৃতির কিছু বিষয় তুলে ধরতে প্রয়াসী। তাতে প্রান্ত-পশ্চিম বাংলার লোকায়ত সমাজের পরিচয়ই পরিস্ফুট হবে।

আত্মশ্লাঘার কোন জায়গা নেই। আবার এই আলোচনা বিশেষ অভিনব বা অশ্রুতপূর্ব, এমনটাও নয়। শুরুতে প্রান্ত-পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম লোকসুর ঝুমুরের কথায় আসি। সাঁওতাল পরগণা থেকে শুরু করে পশ্চিম বাঁকুড়া,

পুরুলিয়া, জঙ্গলমহল প্রভৃতি অঞ্চলের Signature tune এই ঝুমুর। বর্তমানে এই সংগীতশিল্পটির খ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের দরবারে ছড়িয়েছে। শিষ্ট মানুষজন আজ ঝুমুরশিল্প এবং শিল্পীদের বাণিজ্যিকীকরণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয় সম্বলিত নর-নারীর মিলনমূলক এই গান সমাজ চেতনা জাগ্রতকরণের দায়ভার আজ গ্রহণ করেছে। দাঁড়শালিয়া ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর, বারমাসীয়া ঝুমুর প্রভৃতি ভিন্নচালের মিষ্ট সুরকে আধুনিকতা তেমনভাবে গ্রাস করতে পারেনি। বিষয়ের পরিবর্তন সময়োপযোগী হলেও সুরের কাঠামো এখনো প্রায় একই আছে। আমরা সাধারণত ঝুমুরের তালপ্রধান সুরগুলির সঙ্গে বেশি পরিচিত। কিন্তু ধীরলয়ের (বারমাসীয়া ঝুমুর) ঝুমুর গানগুলির চলন বেশ চিত্তাকর্ষক। খরা অঞ্চলে আধপেটা খেয়ে ভাঙা ঘরে লণ্ঠনের আলোয় কীভাবে সুরের এত বৈচিত্র্য আবিষ্কার করেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের।

শলাবত মাহাতোর একটি ঝুমুর গানে চিরকালীন স্বামী-সোহাগী নারীর চপলতা যেমন ধরা পড়েছে , তেমনি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সমাজ সম্পর্কের জটিলতাও এসে পড়েছে। একেবারে লোককবির জীবন অভিজ্ঞতার ফসল –

'বাঁইকে গ্যাল মীনার মায়ের মন গো
যেমন কুকুর ল্যাজেরই মতন গো
রাজা মহাজনের দ্যানা
মীনার মা কিছুই বুঝে না
ও সে জানে কেবল বসন ভূষণ গো।
যদি আনি পয়সা কড়ি
খাতে দেয় ভাতে মুড়ি
করে কেবল উপরে যতন গো।'

অর্থ-সম্পদ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নিয়ামক, এই সত্যটিই উক্ত ঝুমুর গানটির মূল বক্তব্য।

ঝুমুরের নানা সুর আধুনিক কবি-শিল্পীদের প্রাণিত করেছে। শিষ্ট সমাজের গীতিকার আজ ঝুমুর অঙ্গের গীত রচনা করে শ্লাঘা বোধ করেন। আর ঝুমুরের চলনে গীত সৃষ্টিতে নজরুলের দক্ষতা সর্বজন জনজ্ঞাত। সিনেমা, যাত্রা, নাটকেও এই সংগীতশৈলির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার প্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পৃথিবী বিখ্যাত ছৌ-নৃত্যের কথায় আসি। এই নৃত্যশৈলি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে , নাম করা বহু ডিগ্রীধারী গবেষকের দল সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টি করেছেন ভুখা-ভুখা দেশের ভূমিপুত্ররা। শিষ্ট মানুষের দল-আমরা এখন গবেষণায় সিদ্ধিলাভের জন্য এঁদের পর্ণকুটিরে পদধূলি দিই।

ছৌ-নৃত্যে মুখোশ একটি অন্যতম দিক। সেদিক থেকে একে মুখোশ নৃত্যও বলা হয়। পুরুলিয়ায় ছৌ-শিল্পীদের মুখোশের যে সম্ভার দেখেছি , তা আশ্চর্যের। পুরাণের দেবদেবী থেকে শুরু করে দৈত্য-রাক্ষস , নর-বানর, বিভিন্ন পশুর মুখোশ তৈরির কৌশলে এঁরা দক্ষ। ছৌ-নৃত্যের শৈলি বেশ কষ্টসাধ্য। পোশাকের ভার নিয়েও অনায়াসে যে বিশেষ কায়দায় লম্ফনটি তাঁরা দেন – তা দেখবার মতো। বলরামপুর ছৌ একাডেমির নেতৃত্বে থাকা ডাক্তারবাবুর কাছে শুনেছিলাম – ছৌ-শিল্পীর ঘরের বাচ্চারাও শৈশব থেকে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে এই বিশেষ লম্ফনের কায়দা শিখে ফেলে।

ছৌ-নৃত্যে সমান্তরাল ভাবে দুটি শিল্প প্রবহমান। একটি 'মুখোশ শিল্প' এবং অন্যটি 'নৃত্য-শিল্প'। পুরুলিয়ার চড়িদাগ্রামের মুখোশ নির্মাণ আজ স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। আর নৃত্য –এর খ্যাতির কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রয়াত গম্ভীর সিং মুড়ার নাম কে না জানে? দেশে বিদেশে বিখ্যাত গম্ভীর সিং মুড়াকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত করেন। গর্ববোধ করি তখন, যখন শুনি অখ্যাত গ্রামের নিরক্ষর অথবা অল্পশিক্ষিত ছৌ-শিল্পীরা বলেন, "সারা দেশটাই ঘুরা। পেলেন চড়তে আর ভাল্ লাগে নাই।"

বীররস আশ্রিত, যুদ্ধভিত্তি সম্বলিত ছৌ-নৃত্য লোকনাট্যের নানা উপাদানে ঋদ্ধ। পৌরাণিক বিষয় মূল উপপাদ্য হলেও সামাজিক বাস্তব কাহিনিও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছৌ-নাচে এসে পড়ে। সময়কে আত্মস্থ করতে জানে বলেই অত্যাধুনিক কালেও ছৌ-নাচের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। সুখের বিষয় বর্তমানে শিষ্ট সমাজ অপাঙক্তেয় আদিবাসী ও উপজাতির এই নৃত্যশৈলি শেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। শিষ্টজনের উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিবেশন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা, বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলিতে ছৌ-এর প্রভাব আরও প্রসারিত হচ্ছে।

বাংলার বাউল গান লোকসংগীত সাম্রাজ্যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ। তার বিস্তার

কোথায় নেই? সম্ভবত যেসব মানুষ আর্থসামাজিক কারণে উৎপাদন ও বন্টন স্রোতের বাইরে এসে ফালতু হয়ে গিয়েছিল, তারাই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে মন দেয়—, এভাবেই 'বাউল' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তত্ত্ব-দর্শন পরে এসে জুড়েছে। সে যাই হোক, বাউল কোন ঈশ্বর মানে না। জাতিভেদ মানে না। নারীর গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতিতে বাউল – ' ভাণ্ডে করে ব্রহ্মাণ্ডের সাধন'। বাউল মানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বাউল মানে দেহসাধন। বাউল মানে গূঢ় যুক্তি-বিজ্ঞান। জীবের ভেতরে থাকে সৃষ্টির সর্বোচ্চ চৈতন্য শক্তিযুক্ত মানুষ। বাউল সাধনার মধ্যদিয়ে তাকেই অন্বেষণ করতে হয়।

বাউল গান একান্তভাবেই বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় নিঃসারিত এক সৃষ্টি। শৈল্পিক পাগলামি বলতে পারেন। বাউলরা গান গেয়ে পাগল, আমরা তার অর্থ খুঁজতে গিয়ে পাগল। অক্ষরজ্ঞানহীন, চালচুলোহীন, ভিক্ষাজীবী লোকায়ত বাউল সম্প্রদায়ের সংগীত সাধনার, তত্ত্বের অর্থ অন্বেষণে আমাদের প্রচেষ্টা অন্তহীন। জানিনা বা কোন তথ্যও নেই, লালন, হাসন রাজা, সিরাজ সাই, মদন বাউল, নবনী দাস বাউল থেকে শুরু করে স্বর্গীয় গোষ্ঠগোপাল, পুণ্যদাস, ষষ্ঠীখ্যাপা, ভক্তদাস বাউল, মনসুর ফকির প্রমুখ প্রথিতযশা বাউলরা কোন্ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছিলেন? আবার এঁদের গীতিশৈলি পাশ্চাত্যদেশের মানুষকেও প্রভূত আকর্ষণ করে কেন? এমন কি তাঁরাও বাউল হওয়ার বাসনা পোষণ করেন কেন? কী সেই গূঢ়তত্ত্ব? এসবের নান্দনিক উত্তর দেশ-বিদেশের তত্ত্ব উপস্থাপন করে , যুক্তি সহকারে দিতে পারেন একমাত্র শিষ্টজনেরা । কবিগুরুও বাউলে মজেছিলেন। শুনেছি গানের খাতাও কবির কাছে ছিল। নবনীদাস বাউলের সঙ্গেও শান্তিনিকেতনে কবি সময় কাটিয়েছেন। কবির গানে তাঁদের প্রভাবও আছে বিস্তর। গগন হরকরা, লালন, সিরাজ সাঁই প্রমুখ লোককবির গানের সুর কবিগুরু প্রায় হুবহু আত্মস্থ করেছেন। বাউলের তত্ত্ব নিয়েও কবির নিজস্ব ভাবনা আছে।

বাউলগীতি সংকলন, বাউল তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক, বিশেষ খ্যাতিমান বাউলের জীবনী ইত্যাদির সম্ভার আজ কিছু কম নেই। একা লালন-ই তো একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁকে নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে – যা আমাদের কাছে সম্পদ। প্রামাণ্য দলিল। বর্তমানের পুণ্যদাসকে নিয়েও গুণীমহলে আলোচনার অন্ত নেই। তাঁর হাত ধরেই তো বাংলার বাউল বিশ্বের

দরবারে পাকাপাকি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। পিরীতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দূরদর্শনে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর বিশ্বভ্রমণের কাহিনি শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ছোটলোকের সংগীতের এমন বিশ্বজয় যথেষ্ট ঈর্ষণীয় ব্যাপার। পূণ্যদাস বাংলার জীবন্ত কিংবদন্তী।

বাউলের ভাষারীতি, মননশীলতা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। রহস্যময় ভাষার বেড়াজাল আমাদের চর্যাপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'গুরু পুচ্ছিআ জান' ব্যতীত গোত্রান্তর নেই। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে', 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম', 'অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়', ' একটা নারকেলের মালা,তাতে জল তোলা ফেলা', 'বাউলের আউল কথা কীবা চমৎকার', ' আমার যেমন বেণী তেমন রবে চুল ভেজাব না' ইত্যাদি এমন বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে যার অর্থ উদ্ধার সাধারণ শিক্ষিত মানুষজনের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাউলে উপমা, সাদৃশ্য কল্পনা, সাংকেতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'পিরিতি কাঁঠালের আঠা'- এ শব্দবন্ধ তো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। লালন দেহকে খুঁটির সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপন করে বলেছেন –

'সবেমাত্র একটি খুঁটি
খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি'।

দীন শরৎ দেহকে রংমহল ঘরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন –

'বানায়া রংমহল ঘর
সেই ঘরে লুকাইল মন তোর, ঘরের কারিগর'।

সাংকেতিকতা বাউলের সাধারণধর্ম – 'কথা কয়রে দ্যাখা দেয়না' গানটিতে গীতিকার প্রাণের রহস্যময়তাকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। এরকম অজস্র পরিচিত-অপরিচিত বাউল গানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে – যেগুলির সাহিত্যগুণ, মননশীলতা, মাধুর্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গবেষণার বিষয়।

বাউল 'উল্টোচিত্র' অবতারণাও বেশ আকর্ষণীয়। একে 'উল্টো বাউল' বলে। বাস্তব সমাজ, প্রকৃতির রূপের উল্টোরূপ তুলে ধরে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা সৃষ্টি করাতে বাউলরা বেশ তৃপ্তি পান –

'ভোলা, কাক কালো, কোকিল কালো
আর কালো ফিঙে
আমগাছেতে তেঁতুল ধরে তেঁতুল গাছে ঝিঙে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে মদন বাউলের একটি বিখ্যাত গান

উল্লেখ করে জীবন সত্যের সহজ স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন –

'নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে
তোর লোভ প্রচণ্ড ভরসা দণ্ড
এখন আছে কী উপায় রে।'

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় 'মানসমুকুল'-এর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। আবার মানুষকে কষ্ট দেওয়ার ফল জারতন্ত্র বুঝতে পেরেছিল। পতনের মধ্যদিয়ে স্থির হয়েছিল তার ভবিষ্যত ইত্যাদি।

বাউলের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গেলে- প্রশ্ন একটা? – কোথায় নেই? সাধনতত্ত্ব ছাড়িয়ে বাস্তবজীবন সমস্যা, লোকশিক্ষা, রাজনীতি সবই বাউলের বিষয়। বাউল লোককবি আপন অভিজ্ঞতা থেকেই তা রচনা করেন। এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়না। স্বদেশি আন্দোলনে 'বাউল' ছিল প্রেরণাদায়ী সংগীত। চারণকবি মুকুন্দদাসকে ভুলে যাব! রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সকলেই বাউল তত্ত্ব ও সুর আত্তীকরণ করেছেন। বাঙালির আত্মপরিচয়ে 'বাউল' একটি অন্যতম ফলক।

রাঢ়বাংলার টুসু-ভাদু পরব আলোচনার মাধ্যমে লোকায়ত বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় আরেকটু বিস্তৃত করা যেতে পারে। রাঢ়ের শীতকালীন অন্যতম লোক উৎসব টুসু আর শরৎকালীন ভাদু উৎসব। দুটি উৎসবই কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘ একমাস ব্যাপী এদুটি পরবের বিস্তার। পৌষে টুসু আর ভাদ্রে ভাদু। উৎসব দুটিকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বিশদ আলোচনাও আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু বলতে চাই, টুসু ও ভাদুর মধ্যদিয়ে প্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের একদিকে উৎসব, আচার যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি লোকজ শিল্পী ও শিল্পের অভ্যুত্থান ঘটে। টুসু বা ভাদুকে নিয়মিত সন্ধ্যেবেলায় পুজো করার পাশাপাশি বিশেষ রীতির গীতও প্রচলিত আছে। যা টুসুগান ও ভাদুগান নামে পরিচিত।

টুসু-ভাদু দুটি স্বতন্ত্র সুর। বাংলার মাটির সন্তান মনের মাধুরী মিশিয়ে সে সব সুর সৃষ্টি করেছেন। আজকের বাজারে তাদের বাণিজ্যিক মূল্যও উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়ার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অক্ষম অনুসরণ করে একখানা ঝুমুর-টুসু বা ভাদু গান শোনাতে পারলে ভদ্রলোকের সমাজে বিশেষ মূল্য জোটে। আমরা গর্বিত ঝুমুর, টুসু-ভাদু দেশে-বিদেশে মূল্য পাচ্ছে এবং পাবেও। বাঙালির আবার একটু পাশ্চাত্য প্রশংসা না পেলে শিক্ষিত শিক্ষিতজনের কাছে কোন বিষয় ঠিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। বিদেশিদের চোখে

দিয়ে আমাদের আঁতের বিষয়গুলিকে দেখতে হবে। আর তাঁরা মূল্য দিলে তবেই ছোটলোকের শিল্প-সাহিত্য বৃহত্তর বঙ্গবাসীর চেতনায় স্থান পাবে। ঝুমুর, টুসু-ভাদু তো উপন্যাস, গল্প, সিরিয়ালেও প্রসার লাভ করেছে। এখন নারী-পুরুষ বহু গীতিকার টুসু-ভাদু পরবের জন্য নিত্য-নতুন গীত রচনা করেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গেলে শুনতে পাওয়া যাবে। তাতে পৌরাণিক বিষয় থাকলেও সমকালীন ঘটনা, সংকট এমন কি প্রতিবাদও গানের বিষয় হয়ে ওঠে। সব গানই জীবন অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট।

বাস্তবে দেখেছি টুসু-ভাদু দুটি ব্রাত্যশ্রেণির পরব হলেও উচ্চসম্প্রদায়ও যুক্ত হয়ে পড়েন। এঁরা সঠিক অর্থে দেবী নন। দুজনেই কৃষিজ-ভূমিচারী মানব-মানবীর কাছে কখনো সন্তান, বন্ধু আবার কখনো দেবী। শুধুমাত্র যে আদরের টুসালু বা ভাদরকে মনের মতন করে সাজানো, বিবাহ প্রদান ইত্যাদি করা হয় তা নয় – ইচ্ছামত গালাগালও দেওয়া হয়। একে অপরের টুসু বা ভাদুকে অনাবিল সারল্যে কটূক্তি করে থাকেন ব্রতিনীর দল। এক আশ্চর্য নাটকীয়তা লক্ষিত হয় টুসু বা ভাদুকারী দুটি দলের মধ্যে। কবিগানের রীতিতে আপাত ঝগড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাও প্রায়ই উঠে আসে। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কোন বিবাদ তৈরি হয় না। বরং সই পাতানো, মকরপাতানোর মতো বন্ধুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। আজ নিত্য-নতুন মেলা উৎসব হয়, কিন্তু এরকম মিতালি উৎসব কই? মকড় বা সই পাতানো একদিনের জন্য নয়। এ চিরকালীন বন্ধুত্বের । বর্তমানে জটিল যুগ বৈশিষ্ট্যের আবর্তে এই 'মিতালি' সম্পর্ক আরো বেশিমাত্রায় হওয়া উচিত। ভদ্রলোকের কৃত্রিম মিষ্ট হাসিতে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়না। লোকায়ত নারী সমাজ আন্তরিকভাবে 'সই' পাতান। গানে তারই প্রকাশ –

'মাগো,মাগো সই পাতাবো
সই কে আমি কী দুব
সইকে আমি ফুলন তেল দুব।'

এটি তাদের একান্তভাবে নিজস্ব ভাবনা।

গাজন, ছাতাপরব, বাঁধনা, ইতু প্রভৃতি আরো অনেক পরবের কথা বলা যায়। বস্ত্রশিল্প, কাঁসা-পিতল, পোড়া মাটির শিল্প প্রভৃতি বহু লোকায়ত শিল্পও প্রান্ত পশ্চিমবাংলার সম্পদ। এত বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তবুও পোড়ামাটির শিল্প বা মৃৎ-শিল্পের কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত পাঁচমুড়া গ্রামের পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, শঙ্খ কোন্ যুগেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। শিল্পীদের কেউ কেউ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছেন। বাঁকুড়ার এই কুটির শিল্প গৃহসজ্জার অন্যতম বস্তু। অদ্ভুতভাবে মৃৎ-শিল্পীদের তৈরি এই সব হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে বাস্তবের হাতি ঘোড়ার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহের তুলনায় হাতি – ঘোড়া উভয়ের ঘাড় বেশ লম্বা। গোলাকৃতির পা, ছোট্ট লেজ সব কিছুই একেবারে নিজেদের ভাবনাসঞ্জাত। এই হাতি-ঘোড়া আবার মা মনসার থানে পুজো পেয়ে থাকে। দেবতা রূপে স্বীকৃতি পায়। এটা সম্ভবত ধর্মঠাকুরেরই প্রভাব। ধর্মমঙ্গল তো রাঢ়েরই।

অবাক হতে হয় শঙ্খ তৈরি দেখে। সমুদ্রশঙ্খের একটা ইমেজ আমাদের সবার মনে আছে। কিন্তু মাটি দিয়ে তা তৈরি হবে; তার গায়ে টেরাকোটার কাজ থাকবে এবং প্রকৃত শঙ্খের মতো আবার তা বাজবে – এটা ভাবা যায়! কোন্ আর্ট কলেজের কোন্ ডিগ্রীধারী কলা-বিজ্ঞানীর কাছে এই শিক্ষা পাঁচমুড়ার মৃৎ-শিল্পীরা পেলেন, তা অন্বেষণ হয়েছে কি? আমি শুনেছি এর Device একমাত্র এঁদের হাতে। আর পাঁচমুড়ার শিল্পীদের থেকেই উৎসাহী মানুষ জানতে পেরেছেন। গর্বের বিষয় বাঁকুড়ার এই মৃৎ-শিল্পী শুধুমাত্র বাঙালির সংস্কৃতিকেই প্রতিনিধিত্ব করেন না, বিদেশে গোটা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। ছোটলোকের সংস্কৃতির এই শিল্পরূপ সমগ্রদেশেই বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

ঘোড়া একদিকে দ্রুততার প্রতীক আবার ক্ষমতা-শক্তিরও প্রতীক। দ্রুত যান হিসেবেও ঘোড়ার কদর সর্বাগ্রে। অন্যদিকে হাতিও অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীক এবং বাহকের প্রতীক। উভয়েই প্রাচীন যুদ্ধের ইতিহাসে ‘একমেব অদ্বিতীয়ম্’। হাতি-ঘোড়া এখনও অবশ্য প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হয়। রাঢ় অঞ্চলে যুদ্ধবিদ্যায় হাতি-ঘোড়ার ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যও আছে। আমরা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ‘ধর্মমঙ্গলে’ হাতি, ঘোড়ার পিঠে ডোমেদের যুদ্ধযাত্রার কাহিনি পেয়েছি। এসব বর্ণনা থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী কিংবা তারও পূর্বে বাঙালি বীর যোদ্ধার রূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারি –

গজপৃষ্ঠে ধাঙ ধাঙ বাজে জোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাহুদ্যার মামা।
আগে চলে বার ঘন্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ-হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।

এই যুদ্ধযাত্রায় আবার ঢালি হিসেবে ছিলেন কুম্ভকার বা কুমোর সম্প্রদায়। এখান থেকেই সম্ভবত বাঁকুড়ার কুম্ভকার সম্প্রদায় হাতি-ঘোড়ার মৃন্ময় রূপ দেওয়ার প্রেরণা পেয়েছেন। কুম্ভকাররা সুসজ্জিত হাতি-ঘোড়ার যে মূর্তি নির্মাণ করেন, তাতে যুদ্ধযাত্রার সাজটিই পরিস্ফুট হয়। বীররস মণ্ডিত মূর্তিনির্মাণের মধ্যদিয়ে কুম্ভকার সমাজ আপনাদের ক্ষাত্রতেজকেই প্রকাশ করেছেন এবং তৃপ্ত হয়েছেন।

অনুরূপভাবে প্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের বহু লৌকিক সংস্কৃতির পরিচয় উপস্থাপন করা যেতে পারে। যার মধ্যদিয়ে প্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্গীয় বাঙালি সমাজের রীতি-নীতি, জীবনচর্যার সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়। এত কাহিনি, গল্প, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মিথ এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে – যা বাংলার সম্পদ। তাকে রক্ষা করার দায় নিতে হবে। নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সমাজ বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন রীতিকেই লোকাচার, লোকসংস্কার-সংস্কৃতিগুলি বিচার্য। সামাজিক জীবনযন্ত্রণা, বেদনা-হতাশা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আনন্দের প্রকাশ ঘটায়, লোকজীবনের সংস্কৃতি আমাদের জানতে হবে। তবেই সামগ্রিক বাঙালির আত্মপরিচয় সম্ভব। বাংলার মিশ্রসংস্কৃতিতে লৌকিক সংস্কৃতি আদি। আর্যসংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে পরে। সম্ভবত ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকে। মিশ্রণ ঘটেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও। এ সব মিলিয়ে লৌকিক সংস্কৃতি ও শিষ্টজনের সংস্কৃতি। আর সব মিলিয়ে মিশ্রজাতি বাঙালির সংস্কৃতি। সঙ্গত কারণেই লোকসংস্কৃতি ব্রাত্য – এ ভাবনার অবকাশ নেই। আবার যা কিছু চিরকালীন, সত্য-সুন্দর, মৌলিক, মননঋদ্ধ তা-ই শিষ্টজনের সংস্কৃতি – এমন ভাবনার অণু-পরমাণুও মনের গহনে অবস্থান করলে, তা হবে সত্যকে অস্বীকার করা। মানবতাকে অপমান করা। জাতীয় ঐক্যের মূলে আঘাত করা।

....

বাণিজ্যে বসতি বঙ্গলক্ষ্মী : বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে পরাধীনতার ফলে বাঙালি আজ 'ঘরকুনো' অপবাদ শ্রীঅঙ্গে লেপন করে নিলেও একদা স্বাধীন জাতি হিসাবে, দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবে নিজেকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, বাঙালিত্বের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিচয় তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায়। বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে থেকে জানা যায়, গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডার (৩২৫-৩২৬) বঙ্গের গঙ্গারিডি নামে স্বাধীন রাজ্যের নাম জানতেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। প্রবল বর্ষায় পুরুর হস্তিবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে তিনি পরাজিত হন। অতঃপর পূর্বদিকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গঙ্গারিডির হস্তীবাহিনী ও বিপুল শৌর্যবীর্যের সংবাদে আলেকজাণ্ডার তার দিগ্বিজয়ের রথ থামিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অচিরেই উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণরূপে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। সপ্তমশতকের প্রথমার্ধে রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করলেও তার উত্তরকালে বরাবরের জন্য বাংলা পরাধীনতাকে বরণ করে নেয়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক কালে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত পরাধীনতার ইতিহাস। বাঙালির যা কিছু গৌরব প্রাক্-ঐতিহাসিক কালেই বিধৃত হয়ে আছে।

প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল পৌরাণিক যুগ নামে অভিহিত। নানাবিধ পুরাণ, শাস্ত্রাদি এই কালপর্বে রচিত হয়েছিল। ইতিহাসের মতো সত্যনিষ্ঠ না হলেও পুরাণ-শাস্ত্রাদির কাহিনিতে বাস্তবজীবন ঘনিষ্ঠ নানা ঘটনা প্রসঙ্গ ও তথ্যের সন্নিবেশ ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কেননা, অলৌকিকতা ও কল্পনার মোড়কে পুরাণাদি কল্পকাহিনির পর্যায়ে উন্নীত হলেও পুরাণকারদের বাস্তবজীবন অভিজ্ঞতা সেখানে ছাপ ফেলেছে; সর্বোপরি কল্পনার ঘুড়ি আকাশে উড়লেও তার সুতোটি থাকে বাস্তবের মাটিতেই। সমস্ত কল্পনার মূলে প্রোথিত থাকে

বাস্তবতার অনুষঙ্গ। একথা স্বীকার করে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। ঐতিহাসিক কালে রচিত শাস্ত্র-সাহিত্যাদির মধ্যেও সেই অভিজ্ঞতার অনুরণন ধ্বনিত হয়। আবিষ্কৃত নানান অনুশাসন, ভূখননের ফলে উত্থিত লিপি, নানা নিদর্শন ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের সমাবেশে ও তাদের যোগসূত্রের ভিত্তিতে 'বাণিজ্যে বসতি বঙ্গলক্ষ্মী'র পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

পাণ্ডুরাজার ভিবি উৎখননের ফলে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণায় বর্তমানে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত বোলপুর-শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাণ্ডুরাজার ভিবি খননকার্যের ফলে চারটি যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম যুগ অর্থাৎ নবোপলীয় যুগ খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে থেকেই বাঙালি কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল। এইযুগেই প্রথম পশুপালন ও চাষবাসের ভিত্তিতে গ্রাম্যসভ্যতার পত্তন ঘটে। নদীবিধৌত পলিমাটির দেশ বঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই কৃষিকে প্রধান জীবিকা হিসেবে বরণ করেছিল।

দ্বিতীয়যুগ হল তাম্রাশ্মযুগ। খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছর থেকে এই যুগের শুরু। এই যুগেই নগর সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়। বাণিজ্য নগর সভ্যতারই দান। তাই তাম্রাশ্ম যুগেই 'বাণিজ্যে বসতি বঙ্গলক্ষ্মী'। কৃষিসম্পদের পাশাপাশি তাম্রাশ্ম যুগে বাঙালি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। বঙ্গদেশই ছিল তামার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার। এই যুগেই বাঙালি সারা বিশ্বে কৃষিজাত পণ্য ও তামা রপ্তানি করেছে। সারা বিশ্বের সঙ্গে কিভাবে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তার পরিচয় তুলে ধরা হল।

মেদিনীপুরের পান্না গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে এক সামুদ্রিক বাণিজ্যতরীর ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। তাম্রাশ্মযুগেই বাঙালি ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। বাণিজ্যের সূত্রেই ইংরেজ যেভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের বাঙালি সেইভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইজিপ্টবাসী এক বণিকের 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে সেকথা জানা যায়। ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস রচিত 'আরগনটিকা' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৫৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বাঙালি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বাঙালির এই বীরত্বের কাহিনি ভার্জিল তাঁর 'জর্জিয়াস' কাব্যে স্মরণীয় করে রাখার কথা বলেছিলেন।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননকার্যের ফলে ক্রীটদেশের একটি চক্রাকার সীলমোহর পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে সেকালের বাঙালির সঙ্গে ক্রীটদ্বীপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাঙালি মসলা, তুলা, বস্ত্র, স্বর্ণ, রোপ্য, তামা, হাতির দাঁত এমনকি সোনা পর্যন্ত রপ্তানি করতো। এই রপ্তানি দ্রব্যের তালিকায় গুড় ও শর্করা একটা বিশিষ্ট জায়গা নিয়েছিল। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ধানের পাশাপাশি আখের চাষও হত। রোমে এই গুড় বিশেষ আদৃত ছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি শৈব ও শক্তিদেবীর উপাসক। বাঙালি যে যে দেশে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, সে-সকল দেশে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছায়া ফেলেছে। ক্রীটদেশে যেমন শক্তিদেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে। সুমের সভ্যতাতেও মাতৃদেবীর অর্চনা, যার বাহন সিংহ এবং দেবীর স্বামীর বাহন বৃষ ইত্যাদি বাঙালি বিশ্বাস সংস্কারের নানা চিহ্ন বর্তমান, যা প্রমাণ করে বাঙালির সঙ্গে সুমেরের একদা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

কারলো চিপোলো 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে বঙ্গোপসাগরের আশেপাশে প্রথম ধানচাষ শুরু হয়েছিল। সে-গ্রন্থে ধানচাষের স্রষ্টা হিসাবে বাঙালির নাম উল্লিখিত না হলেও ভেতো বাঙালিই যে ধানচাষের স্রষ্টা, এটা মেনে নিতে বোধহয় কারো আপত্তি থাকবে না। বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রে বঙ্গদেশ থেকেই ধান চীনে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে গঙ্গারাঢ়ী কালিঙ্গ রাজের সঙ্গে চীন নৃপতির সামরিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২৮০০ নৌ-সেনা ও বহু রণতরী চীনদেশে প্রেরিত হয়। সেখানে বাঙালিদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সেখানে অর্ণবপোত প্রস্তুত করে নৌযুদ্ধে বাঙালি চীনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। Prof. Terrain de Lacouperie তাঁর 'Western Origin of Chiness Civilization' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন। চীনের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। ফলে সুদূর অতীতে চীনের সঙ্গে বাঙালির বাণিজ্যিক ও হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বহু বাঙালি রক্তসংকরের ফলে বংশপরম্পরায় চীনে বসবাসের ফলে চীনা হয়ে গেছে। মঙ্গোলিয়ায় বাঙালির শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। সাইবেরিয়াতেও শিব ও বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। ম্যাক্সমুলার সম্পূর্ণ চতুর্বেদ মস্কো থেকে আবিষ্কার করেছিলেন, যা প্রমাণ করে ভারতীয় তথা বাঙালিদের মস্কো, মঙ্গোলিয়া, এমনকি সাইবেরিয়াতেও যাতায়াত ছিল।

সেকালের সুবর্ণদ্বীপ একালের ব্রহ্মদেশ তথা মায়ানমারও বাঙালির সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। G.E. Harvy রচিত 'History of Burma' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকেই তাম্রলিপ্ত থেকে ব্রহ্মদেশের গৌড়মিত্তিকা পরবর্তীকালে গৌড়নগর ওরফে গোন ওরফে তাককলায় পর্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করতো। বাঙালিদের বৃহত্তর উপনিবেশ ব্রহ্মদেশে গড়ে উঠেছিল। বহু বাঙালি বার্মায় গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বিবাহ করে বর্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রিক ভূতাত্ত্বিক টলেমি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মালয় উপদ্বীপকে সুবর্ণদ্বীপ রূপে ভূষিত করেন। বাঙালি বণিকদের কাছ থেকেই তিনি ঐ দ্বীপের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যা প্রমাণ করে এই ঘটনার বহুপূর্বেই মালয় উপদ্বীপে বাঙালি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। সেখানে সংস্কৃত ভাষার একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। সেই শিলালিপিতে মুর্শিদাবাদ জেলার রক্তমৃত্তিকা তথা কর্ণসুবর্ণের অধিবাসী মহাবণিক বুদ্ধগুপ্তের নাম উল্লিখিত ছিল। কাজেই বাঙালির সঙ্গে মালয় দ্বীপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।

ইন্দোচীনের অন্তর্গত চম্পা ও কম্বুজ রাজ্যে বাঙালি বাণিজ্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে কৌণ্ডিন্যের নেতৃত্বে একদল বাঙালি চম্পা অধিকার করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-বাঙালি ঘরানার ছাপ ফেলে। বাংলার ক্ষত্রিয়রা মালয় দ্বীপেও বসতি স্থাপন করে। মালয়ের অধিবাসী মল্ল বা মালোরা কলিঙ্গযুদ্ধের পর মৎস্যজীবীতে পরিণত হয়। মালয়ের সঙ্গে তৎকালীন বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগের সূত্রেই তারা দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় চলে আসে। জীবিকার কারণেই তারা বাঙালি মৎস্যজীবীদের মতোই নদীর তীরে বসবাস করে এবং চেহারায় ও আচরণে আজ আর তাদের বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র করা হয়না।

বলি, জাভা, সুমাত্রা, যবদ্বীপের সঙ্গে বাংলার কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি নৌবন্দরের সমুদ্রপথে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রাক্-বৌদ্ধযুগের নানা শিল্পকার্য, দেবদেবীর মন্দির, মূর্তি সেই স্মৃতি বহন করে যে, একদা এখানে বাঙালি বিজয়ের প্রভাব সক্রিয় ছিল। যবদ্বীপে সিংহেশ্বরীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে মহিষ-মর্দিনী মূর্তি পাওয়া যায়, তা বাঙালির নিজস্ব কল্পনার দান বলেই

মনে করা হয়। বরবুদার মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। সেখানে রামায়ণের নানা গল্প-কাহিনি প্রচলিত আছে, যার সঙ্গে ভারতীয় রামায়ণের মিল ও অমিল দুইই ধরা পড়ে। বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও ছিন্ন হয়। তারপর নিজের মতো করে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যাভাযাত্রীর পত্র' ও তাঁর যাভাযাত্রার সঙ্গী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শাকদ্বীপ বা সাগরদ্বীপ গুপ্তযুগে আন্দামানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরাণে এই দ্বীপের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। খুলনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে এর ভগ্নাবশেষের নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে। জগৎ বিখ্যাত বাঙালি বণিকেরা সেই দ্বীপেই বসবাস করতেন। সাগরদ্বীপ ভেঙে যাওয়ায় তারা পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যায় চলে যায়, এরাই অগ্রবাল, মাহেশ্রী, খাণ্ডেলওয়ালা নামে পরিচিত হয়। এই দ্বীপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরই বাঙালির বাণিজ্যগৌরব ম্লান হতে শুরু করে।

চীনের ইতিহাসে তাম্রপর্ণীতে বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের কথা লিখিত আছে। তাম্রপর্ণী হল সিংহলের পূর্ববর্তী নাম, যা প্রমাণ করে বাঙালি বীরসন্তান বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের পূর্বেই বাঙালিদের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রে সিংহলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বিজয়সিংহ সিংহল তথা তাম্রপর্ণী তথা অধুনা শ্রীলঙ্কা জয় করে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং বহির্বঙ্গে বাঙালির রাজত্ব স্থাপন করেন। তারই নামের পদবি অনুসারে নাম রাখেন 'সিংহল'। বলাবাহুল্য, বিজয়সিংহ বাণিজ্যতরী অর্থাৎ অর্ণবপোত যোগেই সিংহল জয় করেছিলেন। তাই বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে সুদৃঢ় ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

সুদূর আমেরিকাতেও বাঙালি বাণিজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। 'হিন্দু আমেরিকা' গ্রন্থে ভিক্ষু চমনলাল মন্তব্য করেন আমেরিকার মেক্সিকোতে একদল বাঙালি তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা পর্যুদস্ত হলেও বাঙালিসংস্কৃতির যোগসূত্র আমেরিকার দক্ষিণে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তারা বাঙালিদের মতোই ধান চাষ করে, ঢেঁকিতে ধান ভানে, চালগুঁড়ো করে পিঠে বানায়, মেয়েরা সিঁথিতে

মনে করা হয়। বরবুদার মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। সেখানে রামায়ণের নানা গল্প-কাহিনি প্রচলিত আছে, যার সঙ্গে ভারতীয় রামায়ণের মিল ও অমিল দুইই ধরা পড়ে। বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও ছিন্ন হয়। তারপর নিজের মতো করে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যাভাযাত্রীর পত্র' ও তাঁর যাভাযাত্রার সঙ্গী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শাকদ্বীপ বা সাগরদ্বীপ গুপ্তযুগে আন্দামানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরাণে এই দ্বীপের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। খুলনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে এর ভগ্নাবশেষের নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে। জগৎ বিখ্যাত বাঙালি বণিকেরা সেই দ্বীপেই বসবাস করতেন। সাগরদ্বীপ ভেঙে যাওয়ায় তারা পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যায় চলে যায়, এরাই অগ্রবাল, মাহেশ্রী, খাণ্ডেলওয়ালা নামে পরিচিত হয়। এই দ্বীপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরই বাঙালির বাণিজ্যগৌরব ম্লান হতে শুরু করে।

চীনের ইতিহাসে তাম্রপর্ণীতে বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের কথা লিখিত আছে। তাম্রপর্ণী হল সিংহলের পূর্ববর্তী নাম, যা প্রমাণ করে বাঙালি বীরসন্তান বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের পূর্বেই বাঙালিদের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রে সিংহলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বিজয়সিংহ সিংহল তথা তাম্রপর্ণী তথা অধুনা শ্রীলঙ্কা জয় করে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং বহির্বঙ্গে বাঙালির রাজত্ব স্থাপন করেন। তারই নামের পদবি অনুসারে নাম রাখেন 'সিংহল'। বলাবাহুল্য, বিজয়সিংহ বাণিজ্যতরী অর্থাৎ অর্ণবপোত যোগেই সিংহল জয় করেছিলেন। তাই বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে সুদৃঢ় ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

সুদূর আমেরিকাতেও বাঙালি বাণিজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। 'হিন্দু আমেরিকা' গ্রন্থে ভিক্ষু চমনলাল মন্তব্য করেন আমেরিকার মেক্সিকোতে একদল বাঙালি তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা পর্যুদস্ত হলেও বাঙালিসংস্কৃতির যোগসূত্র আমেরিকার দক্ষিণে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তারা বাঙালিদের মতোই ধান চাষ করে, ঢেঁকিতে ধান ভানে, চালগুঁড়ো করে পিঠে বানায়, মেয়েরা সিঁথিতে

সিঁদূর পরে। শিব ও গণেশের পূজোও করে। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এরা বাঙালি ক্ষত্রিয়দের বংশধর। স্পেন মেক্সিকো জয় করলে রক্তসংমিশ্রণের ফলে তারা আমেরিকার 'রেডইণ্ডিয়ান' বলে বিবেচিত হয়। এদের প্রাচীনবঙ্গের অসুরদের বংশধর বলে গণ্য করা হয়। শ্রী ধনঞ্জয় দাসমজুমদার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা বাংলার চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে দাবি করে, এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে তারা আমেরিকায় 'মোলেটা' শ্রেণি পরিচয় লাভ করে ও উপনিবেশ তৈরি করে।

সারা বিশ্বব্যাপী বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের কাহিনি ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে , পরিব্রাজকদের বর্ণনায়, স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষে তার চিহ্ন ছড়িয়ে থাকলেও ঐতিহাসিকের মন ও নিষ্ঠা নিয়ে সেই মুক্তা সঞ্চয়ের শ্রমসাধ্য কাজে আজ আর কোন বাঙালিই আগ্রহ দেখান না। নইলে একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস কম-বেশি দু-হাজার বছর আগে থেকে শুরু হবে কেন? তার আগের যুগকে পৌরাণিক যুগ বলে, জানিনা কি কারণে সেই যুগের ইতিহাস অন্বেষণে বিরত থেকে পৌরাণিক গালগল্পে পাতা ভরিয়ে তুলতে হয়! আর বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল বিস্মৃত ইতিহাসের ক্ষীণসূত্র ধরে মঙ্গলকাব্যে বিশেষত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে আমরা 'বাণিজ্যে বসতি বাঙালি'র কল্পলোক গড়ে তুলি। বাঙালির শৌর্য, বীর্য, ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ আভাস চাঁদ সদাগরের অনমনীয় মনোভাবের মধ্যে অনুভব করি। সেই মায়ার জগতে হাল ভাঙা নাবিকের ছদ্মবেশে এক বাঙালি কবির ছবিতে ধরা পড়া সেই 'সবুজ ঘাসের দ্বীপ'-এর মতোই বাঙালির বিস্মৃতকালের বাণিজ্যিক গৌরব সমুদ্রমরীচিকা হয়ে ওঠে।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u> :

১) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) – নীহাররঞ্জন রায়
২) বৃহৎ বঙ্গ– দীনেশচন্দ্র সেন
৩) বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন– অতুল সুর
৪) বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস– ধনঞ্জয় দাসমজুমদার
৫) ঐতিহ্য ও সমাজচিন্তা– আহমদ শরীক
৬) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি– গোলাম মুরশিদ
৭) যাভাযাত্রীর পত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮) দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ– সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

....

মনে করা হয়। বরবুদার মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরের সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। সেখানে রামায়ণের নানা গল্প-কাহিনি প্রচলিত আছে, যার সঙ্গে ভারতীয় রামায়ণের মিল ও অমিল দুইই ধরা পড়ে। বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও ছিন্ন হয়। তারপর নিজের মতো করে বিবর্তিত হয়েছে, ফলে ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যাভাযাত্রীর পত্র' ও তাঁর যাভাযাত্রার সঙ্গী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

শাকদ্বীপ বা সাগরদ্বীপ গুপ্তযুগে আন্দামানের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরাণে এই দ্বীপের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। খুলনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে এর ভগ্নাবশেষের নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে। জগৎ বিখ্যাত বাঙালি বণিকেরা সেই দ্বীপেই বসবাস করতেন। সাগরদ্বীপ ভেঙে যাওয়ায় তারা পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যায় চলে যায়, এরাই অগ্রবাল, মাহেশ্রী, খাণ্ডেলওয়ালা নামে পরিচিত হয়। এই দ্বীপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরই বাঙালির বাণিজ্যগৌরব ম্লান হতে শুরু করে।

চীনের ইতিহাসে তাম্রপর্ণীতে বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের কথা লিখিত আছে। তাম্রপর্ণী হল সিংহলের পূর্ববর্তী নাম, যা প্রমাণ করে বাঙালি বীরসন্তান বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের পূর্বেই বাঙালিদের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রে সিংহলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বিজয়সিংহ সিংহল তথা তাম্রপর্ণী তথা অধুনা শ্রীলঙ্কা জয় করে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং বহির্বঙ্গে বাঙালির রাজত্ব স্থাপন করেন। তারই নামের পদবি অনুসারে নাম রাখেন 'সিংহল'। বলাবাহুল্য, বিজয়সিংহ বাণিজ্যতরী অর্থাৎ অর্ণবপোত যোগেই সিংহল জয় করেছিলেন। তাই বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে সুদৃঢ় ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

সুদূর আমেরিকাতেও বাঙালি বাণিজ্যবিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। 'হিন্দু আমেরিকা' গ্রন্থে ভিক্ষু চমনলাল মন্তব্য করেন আমেরিকার মেক্সিকোতে একদল বাঙালি তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা পর্যুদস্ত হলেও বাঙালিসংস্কৃতির যোগসূত্র আমেরিকার দক্ষিণে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তারা বাঙালিদের মতোই ধান চাষ করে, ঢেঁকিতে ধান ভানে, চালগুঁড়ো করে পিঠে বানায়, মেয়েরা সিঁথিতে

সিঁদূর পরে। শিব ও গণেশের পূজোও করে। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এরা বাঙালি ক্ষত্রিয়দের বংশধর। স্পেন মেক্সিকো জয় করলে রক্তসংমিশ্রণের ফলে তারা আমেরিকার 'রেডইণ্ডিয়ান' বলে বিবেচিত হয়। এদের প্রাচীনবঙ্গের অসুরদের বংশধর বলে গণ্য করা হয়। শ্রী ধনঞ্জয় দাসমজুমদার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা বাংলার চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে দাবি করে, এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে তারা আমেরিকায় 'মোলেটা' শ্রেণি পরিচয় লাভ করে ও উপনিবেশ তৈরি করে।

সারা বিশ্বব্যাপী বাঙালির বাণিজ্যবিস্তারের কাহিনি ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে , পরিব্রাজকদের বর্ণনায়, স্থাপত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষে তার চিহ্ন ছড়িয়ে থাকলেও ঐতিহাসিকের মন ও নিষ্ঠা নিয়ে সেই মুক্তা সঞ্চয়ের শ্রমসাধ্য কাজে আজ আর কোন বাঙালিই আগ্রহ দেখান না। নইলে একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস কম-বেশি দু-হাজার বছর আগে থেকে শুরু হবে কেন? তার আগের যুগকে পৌরাণিক যুগ বলে, জানিনা কি কারণে সেই যুগের ইতিহাস অন্বেষণে বিরত থেকে পৌরাণিক গালগল্পে পাতা ভরিয়ে তুলতে হয়! আর বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল বিস্মৃত ইতিহাসের ক্ষীণসূত্র ধরে মঙ্গলকাব্যে বিশেষত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে আমরা 'বাণিজ্যে বসতি বাঙালি'র কল্পলোক গড়ে তুলি। বাঙালির শৌর্য, বীর্য, ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ আভাস চাঁদ সদাগরের অনমনীয় মনোভাবের মধ্যে অনুভব করি। সেই মায়ার জগতে হাল ভাঙা নাবিকের ছদ্মবেশে এক বাঙালি কবির ছবিতে ধরা পড়া সেই 'সবুজ ঘাসের দ্বীপ'-এর মতোই বাঙালির বিস্মৃতকালের বাণিজ্যিক গৌরব সমুদ্রমরীচিকা হয়ে ওঠে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) – নীহাররঞ্জন রায়
২) বৃহৎ বঙ্গ– দীনেশচন্দ্র সেন
৩) বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন– অতুল সুর
৪) বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস– ধনঞ্জয় দাসমজুমদার
৫) ঐতিহ্য ও সমাজচিন্তা– আহমদ শরীফ
৬) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি– গোলাম মুরশিদ
৭) যাভাযাত্রীর পত্র– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮) দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ– সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

....

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে সুন্দরবন

সঞ্জয় ঘোষ

একসময় সুন্দরবন নামে বিস্তীর্ণ বনভূমি গড়ে উঠেছিল পূর্বতন পূর্ববঙ্গ বর্তমানে যা বাংলাদেশ নামে পরিচিত সেই রাষ্ট্রের ১৬০০০ বর্গ কি.মি. ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগণা জেলার ৯৬৩০ বর্গ কি.মি. জুড়ে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলের ১৩টি ব্লক। যথা ১) গোসাবা, ২) বাসন্তি, ৩) ক্যানিং-১, ৪) ক্যানিং-২, ৫) জয়নগর-১, ৬) জয়নগর-২, ৭) কুলতলি, ৮) মথুরাপুর, ৯) রায়দিঘি, ১০) পাথরপ্রতিমা, ১১) নামখানা, ১২) সাগর ও ১৩) কাকদ্বীপ। প্রায় দু'দশক আগের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সুন্দরবনের অর্থাৎ দুই চব্বিশ পরগণাভুক্ত সুন্দরবনের ৯৬৩০ বর্গ কি.মি.-র মধ্যে বন কেটে বসতি এলাকা, চাষের জমি, মাছ চাষের ভেড়ী ইত্যাদি অঞ্চল গড়ে উঠেছে ৫৩৬৩ বর্গ কি.মি. এলাকায়। সেই সময়ে ১৯৯১-এ বসতি এলাকায় ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৯৫ জন মানুষ বসবাস করতেন বলে জানা যায়। ২০০০ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ বলে অনুমিত হয়েছে।[১] বর্তমানে ২০১৩ নাগাদ তা ৫০ লক্ষের আশেপাশে হবে বলে অনুমান করা যেতে পারে। এই সুন্দরবন নামের সারা বিশ্বের কৌতূহল উদ্রেককারী অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বনাঞ্চল কিন্তু চিরকাল ছিল না। কোন সময় এই বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে সুন্দরবন তথা সমগ্র নিম্নবঙ্গের প্রাচীন সভ্যতা ও আদিম সংস্কৃতির আবিষ্কারক শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত মহাশয় বলেন, " ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি যে সকল পুরাকীর্ত্তি নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন রাজত্বের সময়ের। ঐগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সাগর তীরবর্ত্তী সুন্দরবন প্রদেশেই এই পাল ও সেন রাজত্ব বহুগ্রাম ও নগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল।..... তবে এখানে এ পর্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী সময়ের সভ্যতার

নিদর্শনসমূহের আবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয়, মুসলমান আমলের পূর্বে সম্ভবত সেন রাজত্বকালের শেষ সময়ে এতদ্দেশের প্রাচীন জনপদ সমূহ হয় কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে নষ্ট হইয়া বর্তমান সুন্দরবনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।"[২] তার মানে সেন রাজত্বের (১১৪০ - ১২০৩) শেষ সময়ে অর্থাৎ এখন থেকে ৮০০ বছরের কিছু আগে 'সুন্দরবন' নামে এই বনাঞ্চল গড়ে উঠেছিল। সাম্প্রতিক কালে জয়নগর ব্লকের পিয়ালী নদী তীরবর্তী তিলপী গ্রামে জেলার প্রথম ও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর। এই উৎখননের ফলে এখান থেকে পাওয়া ২২০০ বছর আগের মৌর্য্য যুগের নগর সভ্যতার নিদর্শনসমূহ সুন্দরবনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সরকারি ও পণ্ডিতমহলের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে সুদূর অতীত থেকে বারে বারে ভূমিকম্প, ভয়াবহ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, সুনামী বা আয়লার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওপরের ভূমিস্তর নীচে চলে গেছে ও নীচের ভূমি ওপরে উঠে এসেছে। সুন্দরবনে মানুষ বারে বারে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা ধ্বংস হয়ে গেছে; মানুষ অন্যত্র চলে গেছে আবারও নতুন করে গড়ে তুলেছে গ্রাম বা নগর সভ্যতা। সুন্দরবনের সর্বত্র নানাকারণে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বা নদীর পাড় ধ্বসে সেই সব বিভিন্ন যুগের মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন প্রায়শই উঠে আসছে এর কিছু অংশ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি সংগ্রহশালা।

ভূমিগঠন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষিকা অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু ব্যানার্জীর মতে – প্লেস্টোসিন যুগ থেকে ফুলের রেণু পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে সুন্দরবন অঞ্চলে যে বনভূমি সৃষ্টি তার বয়স কম করেও ১৪ হাজার বছর। আর এখানে প্রাণী জগতের যে অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়স কম করেও ১২ হাজার বছর ।[৩] এই তথ্য থেকে অধ্যাপক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, সুন্দরবন অঞ্চলের আদিম নবভূমি যদি ১৪ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ভূমি গঠিত হয়েছে আরো চার-ছয় হাজার বছর আগে। অর্থাৎ আজ থেকে ১৮–২০ হাজার বছর আগে।

মানুষ আবির্ভাবের প্রত্নসাক্ষ্য : সুন্দরবন অঞ্চলে সর্বপ্রথম কোন জনগোষ্ঠীর মানুষ কোথা থেকে এসেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে বর্তমান প্রবন্ধকারের অন্তত জানা নেই। আদিমতম মানবসংস্কৃতির যে নিদর্শন পাওয়ার কথা জানা যায় দক্ষিণ চব্বিশ

পরগণা থেকে, তা হল বারুইপুরের কাছে হরিহরপুর থেকে পাওয়া ৪টি পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার। ঐ চারটির মধ্যে একটি হল মাংস কাটবার হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার (chopper chopping tool), দুটি তথাকথিত 'হাত কুঠার' অপরটি হল একটি ছুরি অথবা মাংস চাঁচবার হাতিয়ার (scrapper)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের প্রথম অধিকর্তা পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধে জানান, উপরিল্লিখিত scrapperটি levalloisean technique দ্বারা নির্মিত যা নৃতত্ত্ববিদগণের মতে মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগে হাতিয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হত। 'মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অতুল সুর মহাশয়-এর দেওয়া হিসেব মত লেভালয়সিয়ান প্রযুক্তির ব্যবহারের সময়কাল ছিল ২,৩০,০০০ বছর থেকে ৭২,০০০ বছর পর্যন্ত (পৃঃ ২৬)। হরিহরপুরের পাথরের হাতিয়ারগুলি বর্তমানে মজে যাওয়া একটি নদীর পাশে পাওয়া যায়, সেটি বর্তমানে লুপ্ত আদিগঙ্গা অথবা তার কোনো শাখা হতে পারে বলে পরেশবাবু বলেছেন।[৪]

পরেশবাবুর এই আবিষ্কারের বিষয়ে সবাই অবশ্য একমত নন। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, পরেশবাবু এই আবিষ্কার করেছেন আমাদের আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্গত ১৩টি ব্লক অঞ্চলের বাইরে উত্তরদিকে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, প্রথমত সরকারিভাবে এই ১৩টি ব্লক সুন্দরবন অঞ্চল বলে স্বীকৃত হলেও একসময় সুন্দরবনের বনভূমির বিস্তার ঘটেছিলো উত্তরে কলকাতা এমনকী হাওড়া হুগলী পর্যন্ত বহুদূরে। সে-তুলনায় বারুইপুর বেশ নিকটবর্তী অঞ্চল। দ্বিতীয়ত, ৯টি বড় নদীসহ ৩১টি নদী ও তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে জালের মত ঘেরা 'সুন্দরবন' যে তিনটি প্রধান নদী প্রবাহ ধরে আদিম মানব বা প্রাচীন সভ্যতার জন্মদাতা মানবগোষ্ঠী প্রবেশের প্রত্নসাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেই তিন প্রবাহের অন্যতম হল আলোচ্য সুন্দরবনের মধ্যভাগে বর্তমানে লুপ্ত আদি গঙ্গার ধারা-প্রবাহ। উল্লেখ্য পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় আবিষ্কৃত হরিহরপুরের পাথুরে হাতিয়ার এই আদি গঙ্গা বা তার শাখার ধারে পাওয়া গিয়েছে।

হরিহরপুরের হাতিয়ারগুলির কথা বাদ দিলে, সুন্দরবনের কাছাকাছি বা একদা বিস্তৃত সুন্দরবনের অংশ হিসাবে সবার চেয়ে প্রাচীন মানবনির্মিত প্রস্তর হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায় পশ্চিম প্রান্তে। একদা সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহ দ্বারা পুষ্ট বর্তমান ভাগীরথী-হুগলী নদীর ধারার তীরবর্তী ডায়মণ্ডহারবার থেকে কয়েকমাইল উত্তরে দেউলপোতায়। এখানে মধ্যপ্রস্তর

যুগের পাথুরে হাতিয়ার পাওয়ার কথা জানা যায়। এ বিষয়ে পরেশ দাশগুপ্ত বলেছেন –'অবশ্য একদিক থেকে স্বতন্ত্র গুরুত্বের অধিকারী ২৪ পরগণা জেলায় গঙ্গার তটভূমিতে অবস্থিত দেউলপোতায় আবিষ্কৃত শেষপ্রত্নাশ্মীয় নিদর্শনাবলির' বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। এখানে সংগৃহীত....প্রস্তরে নির্মিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন আয়ুধ, শল্ক ও প্রস্তরপিণ্ড যে এক প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের সাক্ষ্য দেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'[৫] অন্যত্র তিনি ব্যাখ্যা করেছেন – 'ভারতে এইসব দৃষ্টান্তকে শেষ প্রত্নাশ্মীয় (আপার প্যালেওলিথিক) অথবা মধ্যপ্রস্তরযুগীয় (মিডল স্টোন এজ) ... হাতিয়াররূপে বর্ণনা করা হয়।' দেউলপোতায় প্রাপ্ত হাতিয়ার-এর বয়স সম্বন্ধে কেউ কেউ একমত হলেও অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। প্রত্নবিদ কালিদাস দত্ত মহাশয় ডায়মণ্ডহারবারের কয়েক মাইল দক্ষিণে ঐ একদা সরস্বতী নদী বিধৌত হুগলী নদীর তীরবর্তী হরিনারায়ণপুর থেকে নব্য প্রস্তরযুগের হাতিয়ার কয়েকটি ও আদিম প্রকৃতির মূর্তিপুতুল পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন, "...the village of Harinarayanpur, stands of the river Hooghly. The makers of the tools the neolithic people most probably lived there ....Besides the terra-cotta statuettes and stone tools... other artifacts...were discovered..."[৬]

হুগলী নদীর আরও দক্ষিণে সাগরদ্বীপের বামনখালি ও মন্দিরতলা থেকে ক্ষুদ্রায়তন হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা যায়। কাকদ্বীপের পাকুড়তলা থেকেও হাতিয়ার আবিষ্কারের কথা জানা যায়। দক্ষিণতম প্রান্তের পাথরপ্রতিমার বঙ্গোপসাগরের ধারে জি প্লট থেকে যে পাথরের হাতিয়ার পাওয়ার দাবি করা হয়েছে তা পরীক্ষা ও প্রমাণসাপেক্ষ।

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সম্ভাবনাময় নতুন পথ ধরে সুন্দরবনের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অনুসন্ধান : মানুষ ও তার সংস্কৃতি কিভাবে আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের অন্যতম বা হয়তো প্রধান অধ্যয়নের বিষয়। আর একজন পণ্ডিতের মতে মোটা দাগে মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু করে তাই সংস্কৃতি। মানুষ(নৃ) সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নৃতত্ত্বের অধ্যয়নের বিষয়। শারীরিক নৃতত্ত্বে যেমন শারীরিক মাপজোখ, গায়ের, চুলের চোখের মনির রঙ ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে তেমনই জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, সংক্রান্ত নানা প্রথা, পূজা, পার্বণ, ব্রত ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সরেজমিন

পর্যবেক্ষণ যাকে ক্ষেত্রসমীক্ষা বলা হয়, তার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসা হয়।

সুন্দরবন অঞ্চল তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আদিম অধিবাসী কারা? সোজা ভাষায় কারা প্রথম সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাস করতে আসেন এবং কোথা থেকে? আমরা প্রত্নসাক্ষ্যে দেখেছি, হরিহরপুরের প্রাচীন প্রস্তরযুগের নিদর্শন বাদ দিলে সর্বপ্রাচীন মানব আগমনের নিদর্শন পাই আমরা বর্তমানে লুপ্ত প্রাচীন সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহে পুষ্ট হুগলী নদীর পূর্বতীরে দেউলপোতায়। এখানে মধ্য প্রস্তরযুগের যে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে, তার স্রষ্টা কারা এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা 'সোঁদর' বুড়ি নামক একটি মেয়েলি ব্রতের কথা বর্ণনা করব। পৌষসংক্রান্তিতে সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলের মহিলারা এই ব্রত পালন করেন মূলত সন্তান-সন্ততির তথা পরিবারের মঙ্গল কামনায়। প্রকৃতপক্ষে এর পাশাপাশি ধরিত্রী তথা পৃথ্বী মাতার কাছে ধান ওঠার পরবর্তী ধান তথা প্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কামনাও থাকে একইসাথে। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির মানুষ এই ব্রত পালন করেন কিছু সাধারণ (common) মিলসহ কিছু স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নিয়েই। মাহিষ্য জাতির মধ্যে আদি গঙ্গার লুপ্ত মজা অংশে গড়ে ওঠা মজিলপুর ও গঙ্গার শাখা মনি নদীর তীরবর্তী কঙ্কনদিঘিতে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে – এ পর্যন্ত সমীক্ষায় সবার চেয়ে প্রাচীন স্তর এঁদের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। তুলসীতলায় তাঁরা সোঁদর বুড়ির প্রতীকরূপে যাকে তাঁদের কেউ কেউ গোবর বুড়িও বলেন। একতাল গোবর বা মাটি অথবা গোবরের একেবারে আদিম ধরনের কিম্ভূতকিমাকার পুতুল রাখেন যমপুকুর নামে মাটিতে খোঁড়া ছোট্ট একটি গর্তের পিছনে। এখানে ব্রতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়, তাই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিই বর্ণনা করা হচ্ছে। পাশে থাকে একটি ৮″ – ১০″ বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে ছড়ি বেঁধে তৈরি তীর ও ধনুকের প্রতীক একটি অন্য কঞ্চি। প্রত্ন-উৎখননে জানা গেছে মানুষ প্রথম মাটির আদিম পুতুল বা পাত্র তৈরি করতে শেখে নব্য প্রস্তরযুগে। এখানে আমর প্রাক্ নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির স্তরের ইঙ্গিত পাচ্ছি, কারণ মাহিষ্যদের মহিলারা মাটির পুতুল ব্যবহার করে না। সোঁদর বুড়ির প্রতীক হিসেবে। সুন্দরবনের অনেক গ্রামে সমীক্ষায় দেখা গেছে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বড় গাছের তলায় মাটির বেদীর উপর মাটির স্তূপ প্রতীকে তাঁদের দেবদেবীর পূজা করেন। এঁরা মনুষ্যপম মূর্তি পূজার আগের স্তরে রয়েছেন। মাহিষ্যদের পূর্বপুরুষ যে স্তরে

ছিলেন সুন্দরবনে প্রবেশের কালে। মাহিষ্যদের এই ব্রতে আরও একটি প্রতীকী তাৎপর্যের বিষয় থাকে ঐ যমপুকুরের পাশে তা হল ফুল ও পাতাসহ একটি ডাল। শুধু মহিষ্যরা নন অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রেও এটি থাকে। নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণে এই যমপুকুর নদীর প্রতীক, ফুল পাতাসহ ডাল ফলমূল সংগ্রহকারী সমাজ তথা বনের প্রতীক এবং ঐ তীরধনুক শিকারজীবী সমাজের প্রতীক। নব্যপ্রস্তর যুগের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ব্যাপী মধ্য ও পুরাপ্রস্তরযুগের সুদীর্ঘ সময়ে মানুষ শিকার ও সংগ্রহের জীবন যাপন করেছে। তবে ওই তীর-ধনুক বলে দিচ্ছে মাহিষ্যদের এই ব্রত মধ্যপ্রস্তর যুগের কথা বলছে। কারণ মধ্য প্রস্তর যুগেই মানুষ প্রথম তীর-ধনুকের ব্যবহার আরম্ভ করে।[৭] মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা গুহাচিত্রে শিকারী মানুষদের তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতে দেখা যায়, যার বয়স ৮০০০ বছর আগের (মধ্যপ্রস্তর যুগে) হতে পারে বা উত্তরপ্রদেশের সরাই-নাহাররাই তীর-এর মধ্যপ্রস্তর-এর প্রত্নানিদর্শন কার্বন ডেটিং অনুযায়ী ১০,০০০ বছর আগের বলে জানা গেছে বলে ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন।[৮] বাগদী, রাজবংশী, পৌণ্ড্র, কায়স্থ, ব্রাহ্মণসহ যতগুলি জাতির মধ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে, তাদের কারো মধ্যেই এই স্তরটি পাওয়া যায় নি। বাগদীদের মধ্যে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির ইঙ্গিত মেলে। তাই দেউলপোতায় এই মাহিষ্যগণের পূর্বপুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন একথা বলা যায়। এঁরা আদতে কৈবর্ত এবং এঁদের আদিবাস মেদিনীপুরে। কৈবর্তদের মধ্যে চাষী। কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবি করেন পরবর্তীকালে। আর একটি অংশ জেলে কৈবর্ত হিসেবে থাকেন। মধ্যপ্রস্তর যুগের শেষ ও নবপ্রস্তর যুগের শুরুর সন্ধিক্ষণে সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪-পরগণায় উপস্থিত হয়েছিলেন যে কৈবর্ত্য জনগোষ্ঠী, তাঁরা আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীর মানুষ ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীকে আমরা প্রথম দেখি আরও পরে, তামা ও পাথর ব্যবহারের যুগ বা তাম্রাশ্ম যুগে । তবে আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীর কৈবর্তদের মধ্যে প্রথমে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী ও পরে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। সোঁদর ব্রতে আমরা পরবর্তী যে স্তরটি পাই তা বাগদী জাতির মধ্যে ওদর বুড়ো ও সোঁদর বুড়ির মাটির হাতে টেপা পুতুল ও ঝাঁটার কাঠির তীর-ধনুক প্রতীক তাঁরা ব্যবহার করেন। এই বাগদীগণও আদি অস্ট্রাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। সাঁওতাল নামে পরিচিত আদি অস্ট্রাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পৌষ-সংক্রান্তিতে বুড়ো-বুড়ী পূজা ও ভাদ্র-সংক্রান্তিতে মনসা পূজার প্রাবল্য দেখা যায় এই বাগদীদের

মধ্যেও। মনে হয় কোনো এক সময় এদের এক সাধারণ (common) পূর্বপুরুষ ছিল। সেই সাধারণ পূর্বপুরুষদের থেকে বাগদীগণ নব্যপ্রস্তর যুগে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের ব্রতের উপকরণ থেকে। প্রথম কথা মাটির আদিম ধরনের মাটির পুতুল মানুষ প্রথম নব্যপ্রস্তর যুগেই তৈরি করতে শেখে, যে ধরনের পুতুল মাহিষ্যদের ব্রতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, মানুষ প্রথমে মাতা তথা দেবীকে পূজা করত, সেখানে পুরুষ তথা দেবতার স্থান ছিল না। বিশ্ব প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়নে তা জানা যায়। নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও বিশেষত পশুপালন শুরু হলে সন্তান জন্মদানে প্রসবকারিণী মাতার পাশাপাশি পিতারও যে ভূমিকা আছে, তা মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলো। তখন থেকেই মাতার পাশে পুরুষ সঙ্গী তথা দেবতা হিসেবে পিতা বা সন্তানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আমরা আগেই দেখেছি, বাগদীদের ব্রতে বুড়ি তথা মাতার পাশে বুড়ো তথা পিতার মাটির পুতুলরূপে প্রতীকী উপস্থিতি।

চব্বিশ পরগণার তফসিলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা সবার চেয়ে বেশি পোদ জাতির, যাঁরা বর্তমানে নিজেদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেন। পোঁদর ব্রতে দেখা যাচ্ছে বাগদীদের মতই অবিকল একই ধরনের মাটির হাতে টিপে তৈরি পুরুষ ও নারীর প্রতীক পুতুল তাঁরা পূজা করেন কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণ নামে। এটা একদিকে তাঁদের ওপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বোঝায় অন্যদিকে বোঝা যায় তাঁরা যে মূল গোষ্ঠীর অংশ ছিলেন, তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন অনেক উন্নত পর্যায়ে। অর্থাৎ অনুমান করা যায়, সমৃদ্ধশালী এবং কৃষিকাজ নির্ভর গ্রামসমাজে যেখানে শিকার ও সংগ্রহের ভূমিকা বেশ কম। অতুল সুর মহাশয় তাঁর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তপসীলভুক্ত জাতিসমূহের উৎপত্তি হয়েছে উপজাতিসমূহ হতে। মাত্র হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর থেকেই, তারা বর্ণ ও জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে।'[৯] তার স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পৌণ্ড্রগণ তাঁদের ঐতিহ্যশালী চিরাচরিত ব্রতের দেবদেবীর নিজস্ব জাতিগত নাম ছেড়ে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নামে পূজা করছেন। বর্তমানে আলোচ্য পুস্তকে ১৮৭২-এর জনগণনার প্রতিবেদন থেকে অতুল সুর মহাশয় সিদ্ধান্তে এসেছেন 'পোদেরা মুখ্যত চব্বিশ পরগণার লোক। কেননা ঐ জেলাতেই তাদের ৯১ শতাংশ বাস করত'।[১০] এর থেকে বর্তমান প্রবন্ধকারের ধারণা হয়েছে, এই পোদ জাতির সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে আদি অধিবাসী

কৈবর্ত জাতি থেকে। এর সপক্ষে মাথা, নাক ও দেহদৈর্ঘ্য বিষয়ে বিভিন্ন জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া যায়, যাতে কৈবর্ত ও পোদগণের মিল দেখা যায়।

জাতি	শিরসূচক (সংখ্যা)	নাসিকাসূচক	দেহদৈর্ঘ্য (মি.মি.)
ব্রাহ্মণ	৭৮.৮	৭০.৮	১৬৭৬
কায়স্থ	৭৮.৪	৭০.৭	১৬৩৬
সদগোপ	৭৮.৬	৭৪.২	১৬৩৩
গোয়ালা	৭৭.৩	৭৪.৬	১৬৪৬
কৈবর্ত	৭৭.৫	৭৬.৬	১৬২৯
পোদ	৭৭.৮	৭৬.৪	১৬২৫
রাজবংশী	৭৫.৪	৭৬.৯	১৬০৭
বাগদী	৭৬.৪	৮০.৮	১৬০৩
বাউরী	৭৫.১	৮৪.৩	১৫৮৫

অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজবংশীগণের মধ্যে মঙ্গোল জাতির প্রভাব দেখা যায় কিছুটা তাঁদের কারো কারোর মুখাবয়বে, যদিও মূলত তাঁরা আদি অস্ট্রাল। আদি অস্ট্রাল অন্যান্য তফসিল জাতির মত তাঁরাও সাতবিবি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা করেন। তাঁদের পদবী যেমন আড়ং, ঘুঘু ইত্যাদি অন্যান্যদের থেকে পার্থক্য দেখা যায়। এঁরাই প্রধানত বাঁশের সরু কঞ্চি দ্বারা তৈরি মাছ ধরার আদিম খাঁচার মত ঘুনি, আটল, ঝাঁঝড়া প্রভৃতি তৈরি করেন, যেগুলি মূলত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মঙ্গোলিয়ান নাগা, মিজো, অসমীয়া, ত্রিপুরী প্রভৃতি যাদের বাঁশ সংস্কৃতির অংশ তাঁদের সঙ্গে সাঁওতাল প্রভৃতি আদি অস্ট্রালদের দ্বন্দ্ব ও মিলনের ফল মনে হয়। কাওড়াগণ নিঃসন্দেহে মুণ্ডা উদ্ভূত ভূমিজ, তারপরে কোড়া শেষে কাওড়ায় রূপান্তরিত জাতি যাঁরা বারা দেবতা দক্ষিণ রায়ের আদি পূজক গোষ্ঠী। মাহিষ্য তথা কৈবর্ত, বাগদী ও পোদ তথা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মত সুন্দরবনের প্রাচীন অধিবাসী না হলেও এঁদের নিজস্ব দেবতা দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীকে বাদ দিয়ে সুন্দরবনের কথা বলা যায় না। এঁদের আদি অস্ট্রাল উৎস সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ্য অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, ১) মুণ্ডারী – সাঁওতাল, মুণ্ডারা এই ভাষায় কথা বলেন ২) মোন্-খ্মের – আসাম ও উত্তর পূর্ব সীমান্তের উপজাতিরা এই ভাষায় কথা বলেন।[১১]

ভারতে আর্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ দুটি পর্যায় প্রবেশ করেছিল। আদি অস্ট্রাল ও ভূমধ্যসাগরীয় (দ্রাবিড় ভাষী) নরগোষ্ঠীর পর প্রথম আর্যভাষী গোষ্ঠী হিসেবে এসেছিল 'অ্যালপাইন' বা 'আল্‌পীয়' জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আগত 'নর্ডিক' পর্যায়ভুক্ত বৈদিক আর্যদের ভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। এই আল্‌পীয়রাই বাংলার পশ্চিমাংশের মত আলোচ্য সুন্দরবনেরও কায়স্থদের পূর্বপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র প্রভৃতি পদবী আদিতে আল্‌পীয়গণের উপশ্রেণির (tribe) নাম ছিল। পরে বর্ণসৃষ্টির সময় সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসেবে গৃহীত হয় বলে অতুল সুর মহাশয় অনুমান করেছেন।[১২] তবে এই আল্‌পীয়দের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তাদের পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোকেদের মিশ্রণ ঘটেছিল।[১৩] আমাদের সুন্দরবনের জয়নগর-মজিলপুরই হল একমাত্র পুরসভা, সেখানে মজিলপুরের ঘোষ কায়স্থ পরিবারেও সোঁদর বুড়ি ব্রত পালিত হয় কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ। যেমন এঁদের ব্রতে সোঁদর বুড়ির হাতে টেপা মাটির পুতুলের কোলে একটি হাতে টেপা মাটিরই পুত্রের প্রতীক পুতুল থাকে ও তার হাতে ঝাঁটার কাঠির সাথে সূতো ঝোলান প্রতীকী ছিপ দেওয়া থাকে। এ ধরনের পুত্র ও ছিপের প্রতীকী উপস্থিতি এ পর্যন্ত যে জাতিগুলির মধ্যে সোঁদর পূজার ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে, তাদের কারো মধ্যে দেখা যায়নি। স্থানীয় আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠী উদ্ভূত তফসিলি জাতিগুলির থেকে শুধু এঁরা গ্রহণ করেননি, নিজস্ব এক রকমফের সৃষ্টি করেছেন যা অনন্য। এর থেকে আদি অস্ট্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর উদ্ভূত জাতিসমূহের সঙ্গে আল্‌পীয়দের রক্ত সংমিশ্রণের ইঙ্গিত মেলে। সুন্দরবনের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক তথা নর্ডিক আর্যদের প্রভাব দেখা যায়, শারীরিক উচ্চতা, রঙ ও সংস্কৃতিতে, তবে এঁদেরও কিছু অংশের সঙ্গে পূর্ববর্তী আদি অস্ট্রাল, দ্রাবিড় ও আলপীয় প্রভাব সামান্য পড়েছে বলে মনে হয় শারীরিক গঠন থেকে। যদিও ব্রাহ্মণগণ (নর্ডিক আর্য) সবার পরে সুন্দরবনে প্রবেশ করেছেন, এবং এঁরা কিছু অংশ এখনও ব্রাহ্মণ গর্বে গর্বিত। অপর একশ্রেণির ব্রাহ্মণ দেখা যায়, যাঁরা তফসিলি পরিবারগুলির গৃহে বিভিন্ন পূজা, পার্বণ, অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

সুন্দরবনের মুসলমানগণের বিরাট অংশের পদবী তফসিলি বা অন্যান্য মধ্যবর্ণের মতই মণ্ডল, পুরকায়েত, নস্কর, জমাদার ইত্যাদি। তাই তাঁরা যে আদিম অধিবাসীদের থেকে উদ্ভূত তথাকথিত নিম্ন ও মধ্যবর্ণের থেকেই নানা

কারণে ধর্মান্তরিত তা বোঝা যায়। খ্রিস্টানগণও স্পষ্টত ধর্মান্তরিত তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ।

শেষকথা : সুন্দরবন এক অনন্য ভূভাগ ও বনভূমি। এখানকার বনভূমিতে বিশ্বখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, সাপ, নদীতে কুমীর, প্রচণ্ড ঝড়, প্রাকৃতিক নানা দুর্বিপাকের মধ্যে বাস করতে এসে মানুষ এই ভয়ঙ্কর বিপদের মোকাবিলা করতে নেমে জীবন-জীবিকার তাগিদে এক নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন। মেদিনীপুর বা ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে সুন্দরবনের আদি অধিবাসীগণ আসেন প্রধানত হাওড়া, হুগলী হয়ে তৎকালীন সরস্বতী নদীর জলপ্রবাহে পুষ্ট বর্তমান ভাগীরথী হুগলীর খাত ধরে। যদিও তাঁদের সংস্কৃতি বিশ্লেষণে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানকার মূল অধিবাসীগণ প্রধানত আদি অস্ট্রাল নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ, পরবর্তীকালে যাদের সঙ্গে ক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় নৃ-গোষ্ঠীর দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটে। আরও পরে আলপীয় আর্যভাষী মানুষদের সঙ্গেও কিছু মিশ্রণ ঘটে। মোঙ্গলীয়দের প্রভাব সামান্য। তবে তা শারীরিক গঠনের চেয়ে সংস্কৃতিতে নর্ডিক আর্যদের প্রভাব বেশি। অনেক কম হলেও বাড়ছে। বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনের বদ্বীপ এই সুন্দরবনের অনন্য ও ভয়ঙ্কর ভূভাগ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে এখানকার মানুষ এক অনন্যসাধারণ সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এক লোকধর্মের জন্ম দিয়েছে বনবিবি, গাজীবাবা, সাতবিবি, নয়বিবি, বিভিন্ন পীর, হিন্দু-মুসলিম একই সাথে যাঁদের পূজা-উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলাও হয়। আদি অস্ট্রাল মূলের সূর্যদেবতার পূজা ক্রমে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় ধারার প্রভাবে শিবে পরিণত হয়। এই সূর্যদেবতার মূর্তিতে যতই নর্ডিক আর্যদের প্রভাব পড়ুক, সুন্দরবনে তাঁর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব গাজন ও চড়কে লক্ষ লক্ষ মধ্য ও নিম্নবর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। সুন্দরবনের জনপ্রিয়তম লোকনাটক 'গাজনে' হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান একসাথে অংশ নেয়। এইভাবেই আদিমকালে আদি অস্ট্রাল নৃ-গোষ্ঠী যে স্রোতধারার জন্ম দিয়েছিলেন কালে কালে তাতে ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয়, মঙ্গোলীয়, নর্ডিক নৃ-ধারাগুলি ও আদিম, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ধর্মীয় ধারার স্রোতে পুষ্ট হয়ে 'বাঙালি' নামে এক মহাস্রোতধারারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

।।তথ্যসূত্র ।।

১. পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন: প্রকৃতি ও পরিচিতি – কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ

চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা – ১৪০৬ (২০০০ খ্রীস্টাব্দ), পৃঃ ৪০৮।

২. দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত – ৪র্থ পর্ব, কালিদাস দত্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫, [২য় খণ্ড]

৩. প্রত্নতত্ত্বে সুন্দরবন – ডঃ মঞ্জু ব্যানার্জী, 'শ্রীখণ্ড সুন্দরবন', সম্পাদক দেবপ্রসাদ জানা।

৪. অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরেশ দাশগুপ্তের মন্তব্য: The ancient site of Hariharpur... on the side of a silted-up river which might have represented the Adi Ganga(the old Ganges) or one of its tributaries...The palaeolithic implements which have all come from Hariharpur are altogether four in nunber consisting of a typical chopper-chopping tool as also two so called hand-axes and one knife or scraper whose shapes along with the striking platforms and flaking style remind us, among others,.of the Levalloisean technique of the prehistoric Soan industry of the Punjab.

৫. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা – পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫৬।

৬. Art of some unknown aboriginal people of Sundarban – Kalidas Dutta.

৭. "....invention of bow are some of the characteristics of mesolithic culture." - Introducing social and cultural anthropology – H.N. Banerjee, P- 194

৮. প্রাক-ইতিহাস – ইরফান হাবিব, বাংলা অনুবাদ কাবেরী বসু, পৃঃ ৪৩ ও ৪০ দ্রষ্টব্য।

৯. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়- অতুল সুর, পৃঃ ৩২।

১০. ঐ, পৃঃ ৫০।

১১. ঐ, পৃঃ ৩০।

১২. ঐ, পৃঃ ২২।

১৩. ঐ, পৃঃ ৩৫।

....

বাঙালির সাংস্কৃতিক মিশ্রণ: আদিবাসী জীবনচর্যা – প্রেক্ষিত সুন্দরবন

শেখ রেজওয়ানুল ইস্‌লাম

১

বাংলার সংস্কৃতি নানা ঘাত-অভিঘাতের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে আজও। বাঙালি মানসবৃত্তের ভাঙচুর, ওঠা-পড়া কখনই একরৈখিক হয়নি। বহুরৈখিক দিক থেকে বাঙালি 'মানস সংস্কৃতি'[১] তার জীবনবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছেছে। নমনীয়তা, সমন্বয়ধর্মিতা, জীবনধর্মিতা ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যকে আত্মীকরণ করেই বাংলার সংস্কৃতি আজ নিজস্ব ঐতিহ্যে ভাস্বর। বহুধা বিভক্ত জনজাতির বিমিশ্র সাংস্কৃতিক চেহারাই আজ বঙ্গসংস্কৃতি নামাঙ্কিত। বঙ্গসংস্কৃতির এই বিমিশ্র চেহারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে – অস্ট্রিক আদিবাসী সম্প্রদায়, যারা মৃত্তিকার আদিমতম সন্তান (Son of Land) - তাদের জীবনচর্যার মধ্যেই নিহিত বাংলার সংস্কৃতির মৌল শিকড় (Grass Root) ।

বাঙালি জীবনধর্মে সংস্কৃতির কোন পূর্ণায়ত রূপ বিরাজিত? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের জন্ম হয়েছে। জন্ম হয়েছে নৃতত্ত্ববিদদের। তাঁরা বলেন, সমাজের সঠিক অবয়বই তার সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি সমাজদেহের মধ্যে শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়।'[২] সমাজস্থ মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস, নৈতিকতা, প্রথা, আচার-অভ্যাস, শিল্প-সাহিত্য – এ হেন সমূহ বৃত্তেই সংস্কৃতির পূর্ণায়ত রূপ। ই.বি.টাইলার যথার্থই বলেছেন- 'culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'[৩] একটা জাতি বা সভ্যতার রূপ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় সভ্যতাজনিত উৎকর্ষসাধন তথা 'সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি'।[৪]

বাঙালি জাতিসত্তার শুধু মুকুলিত রূপ নয়; আমরা তার অঙ্কুরিত সত্তা

অর্থাৎ উৎসের দিকে দৃক্‌পাত করব। তাহলেই বেরিয়ে আসবে অনেক অনেক আদ্যিকালের অস্ট্রিক জীবনচর্যার মিথস্ক্রিয় বিন্যাস। কেননা, 'অস্ট্রিক জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালী জীবনচর্যার বুনিয়াদ।'[৫] বাংলায় নানাবিধ জনগোষ্ঠীর আগমন নিষ্ক্রমণে এবং বিরোধ-বিনিময়-বিসম্বাদে (Thesis-Antithesis-synthesis) বঙ্গসংস্কৃতির বিকশিত রূপ দেখা গেল বটে, কিন্তু তার মেদমজ্জাতেই রয়ে গেল আদিবাসী জীবনচর্যার নানান দিক।

২

আদিবাসী শব্দটির আগমন 'Atavika, Vanavasi'(Forest dwellers) এবং 'girijan'(hill-people) থেকে।[৬] গভীর অরণ্য কিংবা পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী অজ্ঞেয়, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু উপজাতিরাই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধু কি তাই? আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে, যেসব প্রাগার্য জনগোষ্ঠী এখনো প্রাচীন জীবনধর্মকে আঁকড়ে ধরে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে,[৭] তারাই একবাক্যে আদিবাসী। স্থানভেদে এই উপজাতির বিবিধ নামকরণ করা হয়েছে। বাংলায় এদের বলা হয়েছে 'আদিবাসী'(হয়ত আদি বাসিন্দা, তাই) কিন্তু নেপালে এহেন উপজাতিকে বলা হয় 'জনজাতি'-janajati এবং শ্রীলঙ্কাতেও বলা হয় 'Vedda people'। অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী আসলে উপজাতি বিশেষ।

২০১১ সালের সর্বশেষ আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতীয় জনসংখ্যার ৮.৬% হল উপজাতি যা সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে ১০৪ মিলিয়ন। ২০০১ সালের গণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২,২৮০,৫৪ জন। এই দশ বছরে তা প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালের ১লা এবং ২রা জানুয়ারি আসানসোলের বার্ণপুরে সর্বভারতীয় আদিবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যে, প্রবেশাধিকারের জন্য এতগুলো মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এরাই কিন্তু দেশের ভূমিসন্তান। এদের আদি ভুবনটি চিনে নিতে হয় শুরুতে।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। বাঙালি একবাক্যে মিশ্রজাতি। কোনো একক রক্তের বিশুদ্ধতা দাবি করতে পারে না। স্মরণে রাখি, বাঙলায় আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিকড় চারানোর পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষি মানুষের আধিক্য ছিল। পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Austroloid) জাতির একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে।

তাদের সঙ্গে পূর্ববর্তী আদিবাসী নেগ্রিটোদের মিশ্রণে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি হয়। নেগ্রিটোরাই ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, " বাঙলার পশ্চিমপ্রান্ত রাজমোহল পাহাড়ের বাগদীদের মধ্যে , সুন্দরবনের মৎসশিকারী নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে , মৈমনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে ক্বচিৎ কখনও , বিশেষভাবে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের ভিতর , যশোহর জেলার বাঁশফোড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ ও ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় উর্ণাবৎ কেশ, পুরু ওল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতো নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়া মনে হয়।"[৮] এই জাতিগোষ্ঠী নানান সংঘর্ষ-সংঘাতের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েডদের মিশ্রণ অবশ্যই ঘটেছিল, কিন্তু কীভাবে এবং কতটা – তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েডদের সঙ্গে তাদের দেহের গঠনগত সাদৃশ্য আছে। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েডরাই এদেশের আদিম অধিবাসী, যাদের চিহ্ন এখনও বর্তমান। এদের দেহের গঠন খর্বাকার , চুল ঢেউ খেলানো, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো। প্রাচীন সাহিত্যের 'নিষাদ'রাই প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠী। ড. অতুল সুর যথার্থই বলেছেন, 'বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, মহালি , মুণ্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতি সমূহ ও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ।'[৯] এদের বংশধরেরা বনে-জঙ্গলে পর্বতের কন্দরে আজও রয়ে গেছে। নিম্নবর্ণের বাঙালিদের মধ্যে এই রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে বেশি বেশি। এই অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে অতঃপর মিশ্রণ ঘটে আগন্তুক দ্রাবিড় জাতির। পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে বাংলাদেশে। তারা ছিল মূলত আলপীয়(Alpine) ও নর্ডিক(Nordic) নরগোষ্ঠী।

আর্য আগমনের পরে ভারত তথা বাংলায় সাংস্কৃতিক সংঘাত চরম আকার নিয়েছিল। আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার প্রবল বিরুদ্ধাচারণ করেছিল অনার্য আদিবাসীরা। ঋক্‌বেদের দশরাজার যুদ্ধ বর্ণনাতে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। গাঙ্গেয় অববাহিকায় দশরাজার যুদ্ধের সময়ে প্রবল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল দুর্গবাসী বা পরিখাবেষ্টিত জনপদ তথা অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী। এই সংঘর্ষে আর্যরাজ শেষপর্যন্ত দেবতাদের হস্তক্ষেপও চেয়েছিল। শুধু সংঘর্ষ নয়; তারা অনার্যদের সঙ্গে একটা সমন্বয়েরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যক্ষরাজা ভেদে (Bhede) আর্যরাজ সুদাসের পক্ষাবলম্বন করেছিল। পশুপালক আর্যরা সেই সময় থেকেই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে বরণ করে নিয়েছিল। ভারতবর্ষের দিকে

দিকে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছিল বটে, কিন্তু আদিবাসীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই মিশ্র সংস্কৃতিতে মিশে যেতে চায় নি। তারা স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সমতল ছেড়ে দুর্গম বনাঞ্চল কিংবা পাহাড়ি এলাকায় বসতি স্থাপন করল।[১০] ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল আদিবাসীরা। তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত তো হয়নি; বরং তাদের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আত্মীকরণ করল বাঙালি মনন। ড. অতুল সুর তাই বলেন, বাঙালি জাতি মূলত তিন নরগোষ্ঠী – প্রোটো অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় এবং আলপীয় মিশ্রণেই উদ্ভূত। বাঙালি জাতির বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তিন রক্তের ধারাই প্রবহমান।[১১] অনেক অনেক বছর ধরে সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে বাঙালি জাতিসত্তার মিশ্রণ সংগঠিত হয়েছিল।

প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণসমূহে আদিবাসীদের রাক্ষস (Demons), বানর (Monkey) জম্বুভান (Boarmen), নাগা (Serpents), ভুশণ্ডি কাকা (Crow) - ইত্যাকার নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মধ্যযুগে এদেরকেই বলা হয়েছে – কোল, ভিল, কিরাত, নিষাদ, দাস-দস্যু। রামায়ণের লঙ্কা এবং কিষ্কিন্ধ্যা – যেটা চিত্রকূট পর্বত এবং মধ্যভারতের নর্মদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত – সেখানকার রাক্ষস এবং বানররা আদিবাসী উপজাতি শবর ও করকূ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। [১২] বাঙালির লৌকিক জীবনে এই অস্ট্রিক জীবনচর্যার প্রভাব সর্বাধিক। এই সৌধের ওপরেই ক্রমে ক্রমে সজ্জিত হয়েছে দ্রাবিড় ও আল্পীয় উপাদান।এই তিনজাতির সাংস্কৃতিক মিশ্রণে যা জীবনচর্যার সূচনা, আল্পীয়দের নামানুসারে তা 'অসুরজাতির জীবনচর্যা'।[১৩] আর্যরা এদের ভাষাকে নিন্দা সূচক 'অসুর ভাষা', 'পক্ষীর ভাষা' বলে হেয় প্রতিপন্ন করত – 'অসুরাং ভবেৎবাচ গৌড় পুন্ড্রোদ্ভব সদা'। 'কোল মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও অসুর বুলি।।..... এই বুলিই একসময় গৌড়ে পৌণ্ড্রে বহুল প্রচলিত ভাষা ছিল' [১৪] – সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এদের জীবনচর্যার উপরেই আজ দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গসংস্কৃতি।

৩

এবার আসি ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মিশ্রণের কথায়। আদিবাসীদের 'বোঙ্গা' (Bonga) একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি (Supernatural Power)। 'বোঙ্গা' আর 'মানা' (Manna) সমপর্যায়ভুক্ত। 'মানা'র মতোই 'বোঙ্গা' জীবজগতে ও

জড়জগতে বিস্তৃত সুগুপ্ত এক অদৃশ্য শক্তি। আদিবাসীদের বিশ্বাস, এই নৈসর্গিক শক্তি ভালো-মন্দ উভয় ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। এরই রোষদৃষ্টিতে যেমন বন্যা-খরা-ভূমিকম্প হয়, তেমনি কৃপাদৃষ্টিতে বৃষ্টিও হয়। 'বোঙ্গা'র তাই দ্বিবিধ রূপ –

+ Bonga = মঙ্গলজনক
– Bonga = অমঙ্গলজনক

ই.বি.টাইলার তো এমনই অদৃশ্য শক্তিকে নাম দিয়েছিলেন - Animism। আর. আর. ম্যারেট বলেছেন - Animitism । এই অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করতে আদিবাসী সম্প্রদায় নানাবিধ ক্রিয়া-আচার (Ritual) সম্পাদন করে।

আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারে দু'টি নিজস্ব দেবতা থাকে। একটি গৃহদেবতা- Household god, যার নাম – Orakbonga, অপরটি পবিত্র দেবতা- Secret god যার নাম- abgebonga। স্মরণীয় যে গৃহদেবতার নামকরণ করা হয় উক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রের নামানুসারেই।[১৫] এই বোঙ্গা বা আত্মার সঙ্গে সেই পরিবারের বন্ধুত্বপূর্ণ হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের আত্মা-পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস, মানা, টোটেম – ইত্যাকার ভাবনার ভিত্তি এরই মধ্যে নিহিত।

হিন্দুধর্মের কতিপয় মৌল প্রথা আদিবাসী জীবনচর্যা থেকেই এসেছে। আদিবাসী উপজাতিদিগের আচার-প্রথা-মিথ-ধর্মীয় আদর্শ ইত্যাকার বিষয়গুলো হিন্দুসমাজের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। পূর্বসূরিদের পূজা , শস্যদেবতার আরাধনা, বাঙালি হিন্দুসমাজের বহুল প্রচলিত 'উপবাস' প্রথা (কাঙ্ক্ষিত বাঞ্ছাপূরণের জন্য অনশন) – এসবই আদিবাসী অস্ট্রিক জীবনচর্যা থেকেই আগত। অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুত্ববাদের ধারণাগুলো কোনোভাবেই 'Indo – Aryan' নয়; তা অস্ট্রিক-ই। পণ্ডিত এস.জি.সরদেশাই –এর কথায় তারই প্রতিধ্বনি- 'The centre of Rig-Vedic religion was the yaina, the Sacrificial fire.... There is no Atma, no Brahma, no Mosksha, no idol worship in the Rig Veda.'[১৬] হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পশুপূজা ও বৃক্ষপূজার আদি উৎস অস্ট্রিক সমাজ-ই। বানর-গরু-ময়ূর-সর্প (Cobra – naga) হাতি এবং তুলসী (Ocimum tenuiflorum) , নিম (Azadirachta Indica) ইত্যাদি পশু ও বৃক্ষপূজা আদিবাসী অস্ট্রিক জীবনচর্যা থেকেই এসেছে।[১৭] হিন্দুবাঙালির বিভিন্ন আচার ও পূজাকর্মে যে ধান, দূর্বা, হলুদ, পান, সুপারি, কলা – ইত্যাকার সামগ্রী ব্যবহৃত হয় – যেগুলি মূলত অস্ট্রিক

জীবন ও সংস্কৃতি থেকে এসেছে। আদিবাসী ওঁরাও সমাজের 'সরণা' দেবী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সমীকৃত হয়ে গেছে। নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন- 'ধান্যশীর্ষপূর্ণ যে লক্ষ্মীর ঘটের পূজা বাঙলাদেশে প্রচলিত তাহার অনুরূপ পূজা তো এখনও ওঁরাও-মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায়, ইহাদের 'সরণা' দেবীর মাথায় ধান্যশীর্ষের জটার কল্পনা সুপ্রাচীন'।[১৮] আর শিব আর্যদেবতা ছিল না প্রথমে, মূলত ছিল অরণ্যকেন্দ্রিক এক উপজাতীয় দেবতা বিশেষ।'Shiva was a 'tribal – deity' ro begin with and forest dwelling communities, including those who have ceased to be tribals and those who are tribals today'।[১৯] তাই বাঙালি হিন্দুদের নানাবিধ আদর্শ আচার, প্রথা, লৌকিকতা-অলৌকিকতা যে আদিবাসী অস্ট্রিক সংস্কৃতিসঞ্জাত – সে কথা মানতে দোষের নয়।

৪

শুধু সাংস্কৃতিক মিশ্রণ নয়; ভাষাগত ঐতিহ্যের দিকেও আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হয়। অস্ট্রিক জাতির ব্যবহৃত ভাষাই ভারতে অস্ট্রিক ভাষার তিনটি শাখা ভারতে প্রচলিত। এর মধ্যে প্রধান -- কোল(kol) বা মুণ্ডা (Mundei)। মুণ্ডা ভাষার দু'টি শাখা – পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত 'শবর' 'কোরকু' 'খেরিয়া' ভাষা এবং পূর্বী শাখার আন্তর্গত সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, ভূমিজ প্রভৃতি। এই সমস্ত অস্ট্রিক ভাষা থেকে আগত শব্দগুলো 'দেশি' শব্দ নামাঙ্কিত হয়েছে এবং তা বাংলার ভাষাগত ঐতিহ্যকে বহন করছে আজও।

বাংলায় বহুল প্রচলিত শব্দ – খোকা, খুকি, খুঁটি, খড়, ঢিবি, চিংড়ি – এগুলো অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে। অরণ্যচারী নিষাদ-ভিল-কোলরা জীবিকান্বেষণে পশুশিকার করত। শিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত – ধনুক, বাণ, পিনাক শব্দগুলোর মূল অস্ট্রিক।[২০] বাঙলায় কুড়ি(২০) এবং পন (৮০) দিয়ে যে গঠনরীতি, তার আদি উৎস অস্ট্রিক।[২১] সাঁওতালি ভাষায় উপুন>পুন>পন কথাটির অর্থ ৮০। মানবপদেহের হাতে পায়ে কুড়িটি আঙুলের উপর ভিত্তি করেই অস্ট্রিক ভাষাভাষি মানুষজন কুড়ি দিয়ে সংখ্যা গণনা করত। এখনও প্রান্তিক বাংলায় এক কুড়ি, দুকুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি = এক পন এই রীতি কার্যকর আছে। অস্ট্রিক 'গণ্ড' থেকে এসেছে বাংলায় 'গণ্ডা'। ১ গণ্ডা = ৪। বাখারি, বাদুর, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের অংশ), ঠোঁট, পেট, কলি(চুন), ঝোপ-ঝাড়, চোঙ, করাত, দা, লাউ, লেবু, ডুমুর – প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক ভাষার দান। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন- "বাঙলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের

মধ্যে পুণ্ড্র > পৌণ্ড্র, তামত্তি > তাম্রলিপ্তি এবং বোধ হয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ – এই দুটি নামও এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল কব-দাক এবং দাম-দাক হইতে গৃহীত। কোলদা বা দাক = জল এবং দাক দাক হইতে সংস্কৃত উদক। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিল – এই অনুমানই ত যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন তখনও বাঙলা বুলিতে লাগিয়া আছে, যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাইদা, বাঁশদহ বা বাঁশদা (দহ = জলভরা নদী, নদী গর্ভের গর্ত), মুণ্ডা ঢেঙ্কি = বাংলা ঢেঁকি, মুণ্ডা মেটো = বাঙলা মোটা।"[২২] দেশি শব্দ হিসেবে এগুলি আজ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

৫

সুন্দরবনে আদিবাসী আগমনের প্রেক্ষিতটা একটু অন্যরকম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলার পতনের পর মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের কুল্‌পি পর্যন্ত জমিদারি স্বত্ব লাভ করে। শুরু হয় ঘোষড় জঙ্গল চিরে আবাদপত্তনের কর্মযজ্ঞ– শাসনের নামে শোষণের নতুন অধ্যায়। ইংরেজ সরকার বাঙালি জমিদার-লাটদারদের এক একটা চক ইজারা দেয়। আর্থিক মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা জঙ্গল সাফাই করতে মরিয়া প্রয়াস চালায়। ঘন নিবিড় জঙ্গল তদুপরি হিংস্র জীবজন্তু – দক্ষিণরায়ের আনাগোনা – 'মুনিস' পাওয়া দায় হয়ে যায়। তাই জমিদারের নায়েব-গোমস্তারা ক্রমশ বহির্মুখী হয়ে ওঠে। বিহার, ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি জায়গা থেকে জমির লোভ আর অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের টোপ দেখিয়ে আদিবাসীদের এনে কাজে লাগায়। আড়কাঠিরা আদিবাসীদের কাছে agreement করে, জমি সাফ করলেই জমি পাওয়া যাবে। আদিবাসীদের কাছে আড়কাঠিরা 'গিরমিট'(<agreement) বাবুতে উন্নীত হয়। দলে দলে বলিষ্ঠ কর্মঠ আদিবাসী মুনিসরা পাথুরে ও রুক্ষজঙ্গল ছেড়ে আর এক জঙ্গলে চলে আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই জমি জায়গা পেয়ে আর স্বভূমিতে ফিরে যায়নি। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে গেল সুন্দরবনে অতঃপর। এখানকার বহিরাগত আদিবাসীরা তাদের জীবনচর্যায় দেশীয় রীতির সঙ্গে স্থানীয় রীতির একটা মেলবন্ধন ঘটালেন।[২৩] ক্রমে

সুন্দরবনের বহিরাগত আদিবাসী উত্তরাধিকাররা বাঙালি সুন্দরবনবাসীই হয়ে উঠেছে। আদিবাসী 'সাদরি' ভাষা ছাড়াও তারা এখন বাংলায় কথা বলে, বাঙালি পূজাকর্ম, উৎসব, অনুষ্ঠানে নিজেদের সাঙ্গীকৃতও করে।

আদিবাসীদের এই সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ কতগুলো পর্যায়ে[২৪] সংগঠিত হয়েছিল।

প্রথম পর্যায় : আদিবাসী রূপান্তর (Tribal transformation)
দ্বিতীয় পর্যায় : পরিচিতি বিলুপ্তি (Loss of Identity)
তৃতীয় পর্যায় : হিন্দুত্বকরণ পদ্ধতি (Hinduization process)
চতুর্থ পর্যায় : পরিবর্তিত বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে অভিযোজন (Adaptation with change ecology)

ড. রেবতীমোহন সরকার এই পর্যায়গুলিকে চিহ্নিত করেন। এই চতুর্বিধ প্রক্রিয়ায় অবাঙালি আদিবাসীরা শেষাবধি সুন্দরবনেরই বাসিন্দা হয়ে উঠেছে।

সুন্দরবনে পাঁচ প্রকার আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রাধান্য :

১। মুণ্ডা– বসতিস্থান : গোসাবা, সন্দেশখালি, ক্যানিং, বাসন্তি, কুলতলি, ঝড়খালি, পাঠানখালি, শম্ভুনগর, রাধানগর, মোল্লাখালি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ।

২। ওঁরাও – বসতিস্থান : ক্যানিং, গোসাবা, সন্দেশখালি, কালিনগর, ভবানীপুর, ন্যাজোট, বটতলি।

৩। সাঁওতাল – বসতিস্থান : ক্যানিং, বাসন্তি, সাগর, কুলতলি, নামখানা, কাঁটামারি।

৪। হো – বসতিস্থান : কুলতলি, বাসন্তি, ক্যানিং।

৫। ভূমিজ – বসতিস্থান : গোসাবা, ক্যানিং, বাসন্তি, ঝড়খালি, কুলতলি।

সুন্দরবনে আদিবাসীদের এই শ্রেণিবিভাজন কেউ মান্য করে না। তারা নিজস্বগোষ্ঠী পরিচয় হারিয়ে আদিবাসী বানুয়া> 'বুনো' নামাঙ্কিত হয়েছে। জঙ্গল আবাদ করতে এসে বনের বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে তাদের। তাই তারা এক অর্থে বনের সন্তান – 'বুনো'। তাদের 'বুনো' অভিধার পেছনে বাঙালি জমিদারদের নির্মম পেষণও কাজ করেছে। একটি গানে উঠে এসেছে তাদের জীবনের মর্মন্তুদ ইতিহাস-

'বনজঙ্গল কাটিকুটি না জানি কাঠি কাটে
জমি জায়গা লুট লেলা বাঙ্গালী?
হানি হলি বানুয়া আদিবাসী।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

ক্রমশ বাঙালি হয়ে ওঠা এই সব 'বুনো' আদিবাসীরা উত্তরাধিকারীর ঐতিহ্যটুকু হারাতে চায়নি তাদের জীবনচর্যায়। এখানে নেই ছোটনাগপুর, মানভূম, সিংভূম অঞ্চলের লালরুক্ষ পাথুরে মাটি, নেই মহুয়া-পলাশের সারি; পরিবর্তে আছে কর্দমাক্ত সোঁদা ভেজা মাটি আর হেতাল-বগড়া-করঞ্জার বন। সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ অভিমুখে উৎখাত হয়েও নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঙালিয়ানার মধ্যে দিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে চায় তারা।

আদিবাসীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে কতগুলি পূজা-পার্বণ-উৎসব পালন করে।[২৫] এগুলি সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – কারাম পূজা – যা আদতে বৃক্ষপূজা (ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে), টুসু পূজা – শস্যকেন্দ্রিক লক্ষ্মীপূজা (পৌষ মাসে), সহরাই পূজা – আসলে পশুপূজাই । গোয়ালপূজা – গৃহপালিত পশুর মঙ্গল কামনায়, সারহুল পূজা – প্রকৃতি পূজা (চৈত্র সংক্রান্তিতে), ফাগুয়া পূজা- (দোল পূর্ণিমাতে), ভুত পূজা – স্থানীয় ভাষায় 'ছায়া ঢোকানো' – গৃহমধ্যে শান্তিভূত আনয়নের জন্য এই পূজা সম্পন্ন করে। এই সমস্ত পূজাকর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'হাড়িয়ার জল' ও 'মুরগি' মৌল উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। আদিবাসীদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কতগুলো পূজা-পরব হলঃ ১. খাসি – মাতৃ পূজা, ২. বেদিয়া - ছাগল পূজা, মনসা পূজা, মুরগি পূজা, ৩. ওঁরাও – সূর্যাহি পূজা, ৪. কোরামুদি – গোষ্ঠ পূজা, জাঁতাল পূজা, ৫. মাহাতো – শ্যামাকলি পূজা, ষষ্ঠী পূজা , মনসা পূজা।[২৬] 'সেরমা দিসম' বা স্বর্গ দেবতা মারাং বুরুং , সূর্যদেবতা সিং বোঙ্গা, পাহাড় দেবতা বুরু, জঙ্গল দেবতা ইকিরের পাশাপাশি মনসা, বনবিবি, দক্ষিণ রায়, নারায়ণী, কালি, চণ্ডী, দুর্গা – ইত্যাকার হিন্দু দেবদেবীকেও তারা সাদরে বরণ করে নেয়। বিমিশ্র সংস্কৃতির অবিমিশ্র চেহারা ধরা পড়ে সুন্দরবনে।

৬

পূজা ও পরবে আদিবাসীরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ঝুমুর। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'পশ্চিমবাংলার মুণ্ডা ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী উপজাতীয়দিগের গোষ্ঠী নৃত্যের নাম ঝুমুর। এই উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তাহাকেও ঝুমুর গানই বলে।'[২৭] ঝুমুর ও টুসু গান আদিবাসীসংস্কৃতির অন্দরমহলকে চিনিয়ে দেয়। ঝুমুর আদিরসাত্মক গান। তবে এই গানের বিষয়ের বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে। সুন্দরবনের আদিবাসী রমণীরা রামায়ণের কাহিনিকে ভেঙেচুরে, টুকরো টুকরো নানান ঘটনাকে

অবলম্বন করে গান বাঁধে। সুর, তাল, মাদল-নৃত্য-ঢোলক সহযোগে তা পরিবেশন করে। রামায়ণের কাহিনি কিভাবে তাদের গানে উঠে এসেছে , তা দেখা যেতে পারে-

১। ক. রামের বনবাসযাত্রা প্রসঙ্গ :

'রাম নাকি বনে যাবি হাতে লেরে ধনুক বান,
চোদ্দ বছর বনে থাকবি বুঝে লেরে মায়ের প্রাণ।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

খ. বনবাসী রামের দুর্দশায় মা'এর অন্তর্বেদনা :

'ও রামের মা ও রামের মা রামের কী দুর্দশা
অন্ন বিনে ভত্তর খাড়া তেল বিনে মাথায় জটা।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

গ. সীতাপুত্র লব-কুশ কর্তৃক যজ্ঞঘোড়ার রাশ টেনে ধরা :

'রাম ছেড়েছে যুগের ঘোড়া অশোকবনের কাননে
লব কুশে ধরেছেন ঘোড়া সীতা বলে দাও ছেড়ে।
লবের বনে ঝোড়ো ঝোড়ো কুশের বনে যায় জীবন,
ঝল্‌কে ঝল্‌কে রক্ত উঠছে ভাইয়ের মুখেতে।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

ঘ. সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রসঙ্গ :

' উপরে তক্তা নিচে তক্তা তার তলে দিব আগুন,
আগুন যখন প্রবল হবে সীতাকে দেব ঠেলে।
কাগজ পোড়ে পত্র পোড়ে আর পোড়ে তপবন,
শোনো বাছা বীর হনুমান না পুড়াইয়ো সিংগাসন।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

ঙ. নারীর অন্তর্বেদনায় শিব-রাম-সীতা অনুষঙ্গ একাকার হয়ে যায় :

' রাজা যায় মা বে করিতে শিয়াল চাঁদের মহলে
রাণী যায় মা কান্দে কান্দে শিবের মাথায় জল দিতে।
শিবের মাথায় শিব গণ্ডি মা রামের হাতে ধনুক বান
যে ছাড়িবে ধনুকবাণ মা তাকে দিব সীতা দান ।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

২। টুসু দেবী উর্বরতাশক্তির প্রতীক। শস্যকেন্দ্রিক এই পূজায় ব্যবহৃত গান টুসুগান। আদিবাসীদের গার্হস্থ্যজীবনের নিঁখুত চালচিত্র ধরাপড়ে টুসুগানে।

ক. সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায় জঙ্গল হাসিলের প্রাক্কালে আগত। জমিদার কাছারি বাড়িতে কাজের সূত্রে নিয়মিত আনাগোনা হত। টুসু গানে সেই জ্বলন্ত সামাজিক প্রসঙ্গও উঠে আসে:

একটা ঝিঁয়ে দুইটা ঝিঁয়ে তিনটা ঝিঁয়ে তরকারি
ভালো করে রাঁধো টুসু খেয়ে যাব কাছারি।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

খ. টুসু পূজায় টুসুর মা-বাবা সাজতে হয়। সংসার যাপনের চিত্র উঠে আসে গানেও :

'কি তরকারি খেলে টুসুর মা কি তরকারি খেলে গো,
টুসুর মাসির বাড়ির বেগুন রাম ঝিঁয়ে আর গুগলি।
কলের চালে কলের জলে থরকে আধান দিয়ো গো,
তরু শাকে লটর পটর থরকে তেঁতুল দিয়ো গো।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

৩। প্রাকৃতিক তাণ্ডবে সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভাঙনের প্রসঙ্গও গ্রামীণ আদিবাসী রমণীর আলাপনে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে :

' কাঁটামারির গাঙ ভেঙেছে / নড়াগড়া যায় ভেসে।
পুঁটি মাছের কিলবিলানী / বাগ্‌দা মাছের আমদানী।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

৪। আদিবাসীরা ' বিহাকে গান' (বিয়ের গান) এ দাদার শালীকে নিয়ে রঙ্গতামাশা করে। সেই গানে আদিরসের ছোঁয়া যেমন আছে, তেমনি আছে নির্ভেজাল মশকরা। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

ক. 'গৈরাম' অর্থাৎ দাদার শালীর জন্য আহার-বিহারের উদ্ভট ব্যবস্থা:

' নয়া নয়া গৈরাম আলায় কাতিয়ান খিয়াবে
টেটেঙ্গাকের হাড়গোড় মাগুরাকে ঝররে......।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

নতুন নতুন দাদার শালীরা এসেছে। তার জন্য টিক্‌টিকের হাড় আর মাগুর মাছের ঝোল খাওয়ানোর ব্যবস্থা। উদ্ভট উপমা-উৎপ্রেক্ষাতে এই গান রসঘন ভাবে পরিবেশিত হয়।

খ. ' আঙ্গনামে দমপেশ খেলা পিছড়ামে চোর রে
ছোটা মোটা গৈরাম ছুড়ি লে ভাগ্‌লায়ে চোর রে।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

খেলার ছলে শালীদের চুরি করে নিয়ে যাওয়ার মজার কথাই উঠে এসেছে।

গ. ' মাড়ুয়াকে গুড়ুক তামুক কে কেরে খিয়াবে
দাদাকে শালী গৈরাম ছুড়ি সে কেরে খিয়াবে।' (নিজস্ব সংগ্রহ)

আদিবাসীদের বিবাহ সংক্রান্ত এক প্রথা – 'মাড়ুয়া'। সেই মাড়ুয়া অনুষ্ঠানে গুড়াখু আর তামাক খাওয়ানো হবে শালীকে। আদিবাসীদের পারিবারিক

জীবনের প্রকাশভূমি হয়ে উঠেছে এই সব গান।

৫। একটি গানে ফুটে উঠেছে স্বামী বিচ্ছেদে স্ত্রীর ব্যথাতুর হৃদয়ের গোঙানি। আশ্চর্য প্রতিতুলনার মাধ্যমে গানটি সরস হয়ে উঠেছে-

' তালগাছে সোয়া পোকা
ছাইলা বলে হামার কাকা।
ও ছাইলা বল না তোর কাকাকে
'কি দোষে ছাড়িল হামাকে ।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

৬। আদিবাসী পুরুষরা মদমত্ত হয়ে পরনারীতে আসক্ত হয় কখনো কখনো। সেক্ষেত্রে স্ত্রী রমণীরা স্বামীর প্রবল প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। এবং অব্যর্থ ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করে ঝাঁটা। ঝুমুর গানে উঠে আসে সেই প্রসঙ্গও-

' মদখালি এথায় ওথায়
গামছা হারালি কোথায়....
মদ খাওয়া শিখাবো তোর ঝাঁটাতে
গামছা পাওয়ালি নালাতে।'

(নিজস্ব সংগ্রহ)

এইসব গানে সুন্দরবনের আদিবাসী উজ্জ্বল প্রাণপ্রবাহের ছবি ধরা পড়ে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুরের রুক্ষ পাহাড়ি পরিবেশের গান নয়; এ গান একান্তভাবে সুন্দরবনেরই। নিজস্ব ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরেছে বলেই এই সাধারণ কথাগুলোও গায়েনীরীতি এবং উপস্থাপনার গুণে শেষাবধি আদিবাসী 'ঝুমুর' 'টুসু' হয়ে উঠতে পেরেছে। সুন্দরবনের আদিবাসীদের হৃদ্‌স্পন্দন টুকুও অনুভব করা যায় এই সব গানে।

৭

আদিবাসী গ্রামগুলিতে গোষ্ঠীগত এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য তারা নিজস্বগোষ্ঠীর একজনকে গোষ্ঠীপ্রধান করে রাখে। সাধারণত 'পাহান' এবং 'মাহাতো'দের কেউ গোষ্ঠীপ্রধানের দায়িত্ব পালন করে। গোষ্ঠীপ্রধানদের কাজ নানাবিধ-

ক. বিবাহসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
খ. সামাজিক ও গোষ্ঠীগত সমস্যা নিরসন।
গ. বিষয়সম্পত্তি মোকাবিলা ও বন্টন।
ঘ. ধর্মীয় দিক – উৎসব, পূজা-পার্বণ পরিচালনা। (মূলত পাহানরাই এই দায়িত্ব সামলায়)

পূর্বেই বলেছি, আদিবাসীরা আদতে হিন্দু নয়। হিন্দুদের দাহ প্রথার

পরিবর্তে আদিবাসী সম্প্রদায় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের কতগুলো নিজস্ব সংস্কার আছে। কবর দেওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে কাঁচা হলুদ জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করায়; পায়ে আল্‌তা পরায়। অতঃপর সাদা কফিন জড়িয়ে কবরে শায়িত করে। মৃত ব্যক্তির মুখ বরাবর কবরের ঠিক উপরের অংশটি ফাঁকা রাখে। গিট ছাড়া নলাকার বিশিষ্ট একটি বাঁশদণ্ড তার মধ্যে দিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখ বরাবর প্রবেশ করায়। কবরের পাশে একটি জলভর্তি কলসি রাখা হয়। তিনদিন ধরে নাকি জলপান করে উক্ত মৃত ব্যক্তি। কবর সোজা নিরাপদ স্থানে ভাত-খাবারও রেখে আসে। মৃতব্যক্তির আহার্য দানের এই রীতিই হিন্দুসমাজে পিণ্ডদান প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু তাই নয় , লিঙ্গ পূজারও আদি উৎস এরাই। যাই হোক, অপদৃষ্টি রোধের পাশাপাশি মৃত আত্মার শান্তি কামনায় আজও এই সংস্কার মান্য করে চলে আদিবাসী সম্প্রদায়। এক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কিছুটা সাযুজ্য চোখে পড়ে। মুসলমানরা মৃত ব্যক্তিকে স্নান ও শুদ্ধিকরণ করার পর কবর দেয়। কবরের ওপরে সবুজ গাছের কাঁচা ডালপালা পুঁতে দেয়। পবিত্র কোরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সবুজ উদ্ভিদ আল্লার 'জিকির' (স্মরণ) করে। শুধু মানুষের প্রার্থনা নয়, উক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় সবুজ উদ্ভিদকেও শরিক করায় মুসলমান সম্প্রদায়।

আদিবাসীরা বিবাহের ক্ষেত্রে নিজ গোত্রকেই বেশি মান্যতা দেয়। তবে ইদানীং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীপ্রদান পাহানরা একটি নির্দিষ্ট ফতোয়া জারি করে। একটা বিশেষ প্রথা পালন করে আদিবাসী সমাজ। অন্য গোত্রের মেয়েকে বধূ হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে হাড়িয়ার জলে গলাকাটা মুরগির রক্ত মিশ্রিত করে, সেই জল পান করানো হয়। গোত্রভুক্ত করার এই প্রথা ট্যাবুর প্রতিবিধান বলা যেতে পারে।

মোটকথা, বাঙালির বহুরৈখিক জীবনের বহুবিধ ক্রিয়া-আচার-প্রথা বিবিধ সাংস্কৃতিক মিশ্রণেই গড়ে উঠেছে। অস্ট্রিক জীবনধর্মকে মধ্যমার্কে (Middle Point) রেখে বাঙালি মানস তার সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। সুন্দরবনের আদিবাসীরা বিমিশ্র ভাবধারার সংক্রমণে শেষাবধি বাঙালিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সুন্দরবনের আদিবাসী জীবনচর্যা শুধু বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়; বিমিশ্র সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণজাতও বটে – যা বাঙলার সংস্কৃতির মুকুটে আর এক প্রস্থ পালক যোজনা করেছে। অস্ট্রিক জীবনচর্যা , সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐতিহ্যের উত্তরণ ও মিশ্রণেই বাঙালি মানসসংস্কৃতির পূর্ণায়ত রূপ বিকশিত।

অস্ট্রিক জীবনচর্যা যে বাঙালির লৌকিক জীবনের ভিত্তিভূমি – সে কথা অস্বীকার করা যায় কি ?

।। তথ্যসূত্র ।।

১. আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতির তিনটি রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ক. বস্তু সংস্কৃতি – Material Culture খ. অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি - Functional Culture এবং গ. মানসসংস্কৃতি – Spiritual Culture । সাধনকুমার ভট্টাচার্য এই তিন রূপকে বলেছেন – ত্রিসঞ্চয় – দ্রব্যসঞ্চয়, শিল্পসঞ্চয়, সত্যসঞ্চয়। আবার ওয়াকিল আহমেদের ভাষায় – মূর্তিমান সংস্কৃতি, অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি, এবং অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি।

২. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, কলকাতা ,১৯৬৫, পৃ.৪২।

৩. Edward Burnett Taylor, Religion in Primitive Culture, Ed. Paul Radin, Harper and Row Publishers, Newyork , 1958, p.1.

৪.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা , চতুর্থ প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ.১৪।

৫. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.৯।

৬. Wikipedia, The Free encyclopaedia, www.google.com

৭.সনৎকুমার নস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকসাংস্কৃতিক ভূগোল, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা – গোকুলচন্দ্র দাস , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ – নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২৪৮।

৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস , আদিপর্ব, দে'জ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ.৩১।

৯. অতুল সুর , বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ঐ, পৃ.৪২।

১০.শ্যামাচরণ দুবে, ভারতীয় সমাজ, অনুবাদ – রজত রায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লি, ১৯৯৬, পৃ.৬।

১১. অতুল সুর, ঐ , পৃ.২০৭।

১২. C. R. Bijoy , A History of Discrimination Conflict and Resistance PUCL Bulletin, Feb 2003, (www.google.com)

১৩. অতুল সুর, ঐ , পৃ.৯।

১৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস , আদিপর্ব, ঐ , পৃ.৪৫।

১৫. P.C.Biswas, Santals of Santals Parganas, Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Delhi, 1956, (www.google.com)

১৬. S.G.Sardesai, Progress and Conservatism in Ancient India, People Publishing house, 1986 (www.google.com)

১৭. Shivkumar Tiwari, Tribal Roots of Hinduism, Sarup and Sons, 2002 (www.google.com)
১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস , আদিপর্ব, ঐ , পৃ.৫৫।
১৯. Kumar Suresh Singha, Tribal Society in India: An anthrop – historical perspective, Monohor, 1985, www.google.com
২০. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯।
২১. তদেব, ঐ, পৃ.৪৩।
২২. তদেব, ঐ, পৃ.৪৪।
২৩. ড. রেবতীমোহন সরকার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আদিবাসী সংস্কৃতিঃ প্রকৃতি – পরিস্থিতি এবং রূপান্তর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা – গোকুলচন্দ্র দাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স , কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ – নভেম্বর ২০০৯, পৃ.২০৮।
২৪. তদেব, ঐ, পৃ.২০৬।
২৫. কালিপদ সরদার, সাদরি পাড়হা, বারাং বুরু প্রেস, কলকাতা, ১৯৯৫ – এই গ্রন্থে আদিবাসীদের নানান পূজা- পার্বন- উৎসব- অনুষ্ঠানের কথা 'সাদরি' ভাষাতেই লিপিবদ্ধ আছে। জিজ্ঞাসু পাঠক পড়ে নিতে পারেন।
২৬. পূর্ণেন্দু ঘোষ , সুন্দরবনের আদিবাসীঃ একটি অসম্পূর্ণ তথ্যচিত্র, সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা – নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা , ২০০৮, পৃ.১১১।
২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য , বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা – প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭, পৃ.২০০১।

** আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক নানান তথ্য সংগ্রহে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমার সহকর্মী শ্রী বসন পাহান (শিক্ষক, বয়স – ৪০), কাঁটামারি, কুলতলি – দঃ চব্বিশ পরগণা।

** গানগুলি সংগ্রহে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র বাবলু সর্দার (দশম শ্রেণি – দেবীপুর এইচ.এম.বিদ্যাপীঠ, কুলতলি, দ.চব্বিশ পরগণা)। এছাড়া কল্পনা সর্দার (বয়স – ৩০) ও প্রবীর সর্দার (বয়স – ৩২) – কুলতলি, দ. চব্বিশ পরগণা ।

....

বঙ্গসংস্কৃতি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতি

সুজাতা পড়্যা

নৃতাত্ত্বিকদের মতে, ভারতবর্ষে আর্যজাতির অনুপ্রবেশের পূর্বে এদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। এরা আর্যপূর্ব বলে এদেরকে 'অনার্য' বা 'প্রাগার্য' বলা হয়। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোল গোষ্ঠীর মানুষেরা এর অন্তর্ভুক্ত। এরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, শবর, লোধা, খেড়িয়া, হো প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাংলার রাঢ়-বরেন্দ্রই প্রাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাংলার ইতিহাসের শুরু। বাঙালির গায়ে আর্য রক্ত সামান্য, নিগ্রো রক্ত কম নয়, তবে বেশি আছে দ্রাবিড় ও মঙ্গোল রক্ত অর্থাৎ আমাদের নিকট জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কাছাড়ী প্রভৃতি।

আদিবাসী বা উপজাতি হল আদিম মানুষের উত্তরসূরি। এদের পূর্বপুরুষ একদিন প্রত্নপ্রস্তর যুগে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করে নতুন সভ্যতার পত্তন করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী সেই সভ্যতায় ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন এসেছিল। এখনও এই গোষ্ঠীর দলভুক্ত লোকজনের জীবনে সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অবস্থান। এই জেলার পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভূম জেলা, উত্তরে বাঁকুড়া জেলা ও পূর্বে হুগলী ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। জেলার পশ্চিমে ঝাড়গ্রাম মহকুমা প্রধানত কাঁকুড়ে প্রস্তরময় ও অতিরুক্ষ বনাঞ্চল। মেদিনীপুর সদর মহকুমার উত্তর ও পশ্চিম অংশ এবং খড়্গপুর মহকুমার পশ্চিম অংশ অনুরূপ রুক্ষ কাঁকড় প্রস্তরময় বনাঞ্চল। উল্লিখিত তিনটি মহকুমার বনাঞ্চলে ও তৎসংলগ্ন সমভূমি এলাকায় সাঁওতাল, লোধা, শবর, খেড়িয়া, মুণ্ডা, ভূমিজদের বাস। তবে সাঁওতালদের সংখ্যাই বেশি। বনভূমিকে এরা নিজেদের জীবনধারার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে এরা জীবনকে রূপায়িত করেছে।

হাজার হাজার বছর আর্যভারত ও অনার্যভারত একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে থাকলেও একাত্ম হতে পারেনি। তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠতে পারেনি। যদিও বিরাট হিন্দু সমাজের সুবৃহৎ জাতের প্রভাবে কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নিজেদের আগ্রহে এসে

হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। আদিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব উৎসব , পূজাপদ্ধতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন এবং তার মধ্যে অনেক হিন্দু দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও হিন্দুসুলভ ধর্মবিশ্বাসকেও তাঁরা নিজেদের করে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে হিন্দুধর্মবিরোধী কোন প্রতিক্রিয়া নেই কিন্তু হিন্দুসমাজবিরোধী একটা বিক্ষোভ আছে, যার মূল কারণ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। । যেসব অঞ্চলে আদিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার জন্য হিন্দুদের সংস্পর্শে এসেছে; সেখানেই দেখা গেছে যে; উপজাতীয়েরা তাদের প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম থেকে অজস্রভাবে উপাদান সংগ্রহ করেছে। যদিও মনের দিক দিয়ে তাদের প্রাচীন চিন্তা ধারণা অপরিবর্তিত থেকেছে। আবার অনেক উপজাতীয় ধর্মকে হিন্দু তার নিজের মতো করে আত্মস্থ করে চলেছে। উপজাতীয় দেবদেবীর উপর হিন্দুরা নিজেদের দেবদেবীর নাম আরোপ করে এই নতুন দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলেছে। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ওয়ান্স মার্টিনের মতে, “ যদিও সাঁওতালরা বহু পুরুষ ধরেই হিন্দুজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং নিজেদের সংস্কৃতিতে অনেক হিন্দু বৈশিষ্ট্যই গ্রহণ করেছে তবুও এই রূপান্তরিত সংস্কৃতির উপজাতি নেতারা নিজেদের উপজাতি স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে হিন্দু সমাজ থেকে নিজেদের আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক সামাজিক আন্দোলন তৈরী করেছে। এর ফলে হিন্দু কৃষকের কাছে তাঁরা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পেরেছে।” শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটেনি, মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গেও ঘটেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে মুসলমান শব্দের জন্য গ্রাম্য শব্দ খাড়িয়া ব্যবহৃত হয়। আসলে কোন গোষ্ঠীর এক বিরাট সম্প্রদায় হল খাড়িয়া বা খেড়িয়া। নানা দলে বিভক্ত শবর সম্প্রদায়ের শাখা এরা। পশ্চিম মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকাতে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী পাহাড়ে খেড়িয়া আদিবাসীরা গোমাংস ভক্ষণ করায় হিন্দু সমাজে স্থান পায়নি বলেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্বের কিছু কিছু সংস্কার এখনও থেকে গেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেবী চণ্ডী প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শবর পূজারী (দেহেরী) দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। বাকড়া পিতল কাঁঠির জয়চণ্ডীর মন্দির, গুপ্তমণিতে দেবী গুপ্তমণির মন্দির, প্রেমবাজারে দেবী চণ্ডীর মন্দির, কেশিয়াড়ীর দুধেবুধেতে পাগলাচণ্ডীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এসকল দেবীমন্দিরে শবর পূজারীরাই প্রাধান্যলাভ করেন। আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির

শিবপূজার ধারণা সম্ভবত এসেছে খেরওয়াল গোষ্ঠীর পৌরাণিক দেবতা মারাংবুরু থেকে। ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর 'বঙ্গসংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য' গ্রন্থে বলেছেন " মারাংবুরু অর্থাৎ 'প্রধান দেবতা' বা 'মহাদেব'। আবার মারাংবুরু অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ পর্বত'। যে অদৃশ্য দেব-শক্তি সকলকে রক্ষা করেন, তিনি পর্বতে আসীন। এর থেকেই কৈলাসবাসী শিবের কল্পনা বা রূপচিন্তন।" শুধু শিব নয়, তাঁর মতে শালগাছের নীচে পড়ে থাকা বড় বড় শিলাখণ্ড যা 'গরাম থান' নামে পরিচিত, তাই হয়তো তাদের শালগ্রাম শিলা। আমাদের 'শালগ্রাম শিলা' শব্দের উৎস ঐ শাল গাছের তলায় পড়ে থাকা শিলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

বর্তমানে বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে বিচিত্র জাতি-উপজাতির সমন্বিত লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হল বাংলার আদিম জনগণ। বাংলার লোকসংস্কৃতির সমস্ত ধারা, ছড়া, ব্রতকথা, লোককথা, ভাষা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহকে ঘিরে বিচিত্র সংস্কার, শাঁখা ও সিঁদুরের ব্যবহার, জলভরা মঙ্গলঘট, এমনকি সামাজিক কাঠামো সবই আদিবাসী সমাজে আদিমরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এই উপজাতিগুলির মধ্যে যেমন মিল দেখা যায় আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে প্রত্যেক উপজাতি অন্যগোষ্ঠী থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। যেমন – সাঁওতালরা নিজেদেরকে 'হড়' (মানুষ) বলে ভাবে, অপর গোষ্ঠীকে তারা 'দিকু' বলে। তেমনি লোধারা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, শবরদের 'আদিবাসী' বলে আর বর্ণহিন্দুদের 'বাঙালি' বলে। প্রত্যেক সমাজই কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত। এদের গোত্র অনেকটাই হিন্দুদের গোত্রের মত। তবে পার্থক্য এই যে, হিন্দুদের গোত্রগুলির নাম হয়েছে মুনিঋষিদের নাম থেকে, আর আদিবাসী বা উপজাতিদের গোত্রের নাম হয়েছে কোন জীবজন্তু, গাছপালা, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি থেকে। হিন্দুদের গোত্র হল কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য ইত্যাদি। ঠিক তেমনি সাঁওতালদের কিস্কু, হাঁসদা, মুরমু, হেমব্রম, মার্ডি বা মাণ্ডি, সরেন, টুডু, বাস্কে, বেস্‌রা, চঁড়ে, পাঁউরিয়া ও বেদেয়া; লোধাদের ভক্তা বা ভুক্তা, মল্লিক, কোটাল, নায়েক বা লায়েক, দিগার, পরামাণিক, দণ্ডপাট বা বাঘ, আড়ি বা আহরি, ভুঁইয়া; মুণ্ডাদের ভেঙরা, হার্ণসা, জিরহুল, বুলুম, আম্বা, মুনভরি, কানদরা, গোন্দাল, কেরকোটা, পরতি; খেড়িয়ারা বা ভুঁইয়া, বিলুং, হেমব্রম, গুলগু, সরেণ, হাঁসদা, কুলু ইত্যাদি। শবরদের মধ্যে কোন গোত্র বা জাতিভেদ প্রথা নেই। এদের প্রত্যেকটি গোত্রের একটি করে 'কুলদেবতা'(totem) আছে। সেই কুলদেবতা একএকটি

বিষয়বস্তু বা প্রকৃতির অঙ্গ বলে তাকেই তারা শ্রদ্ধা বা ভক্তি জানায়। যদি সেসব কোন ভক্ষ্য বস্তু হয় তবে সেই কুলদেবতাকে ঐ দলের লোকজন সযত্নে পরিহার করে। যেমন হাঁসদা গোত্রের লোকেরা হাঁসকে তাদের কুলের দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানায়। ভক্তা গোত্রের লোকেরা জঙ্গলে একরকম আলু (চিরকা) পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কুলদেবতার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে ভেবে তারা কিছুতেই ঐ আলু খায় না। একইরকমভাবে ভুঁইয়ারা শোল মাছ খায় না, মুর্মু গোত্রের লোকেরা কখনও চাঁপাফুল স্পর্শ করে না ইত্যাদি। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে এই 'টোটেম' বা ধর্মীয় প্রতীক মানা হয় না। যেমন – বা (ধান) গোত্র কিংবা বিলুং (লবণ) গোত্রের টোটেম মানবার কোন উপায় নেই। এই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা নানারকম কিংবদন্তী বা অলৌকিক কাহিনির মাধ্যমে তাদের এই সম্পর্কের ইতিহাসকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

এরপর রয়েছে পরিবার। বঙ্গসমাজের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মতোই সাঁওতাল, লোধা, খেড়িয়া, শবরদের সমাজও পিতৃতান্ত্রিক। সেখানে বয়স্ক পুরুষই কর্তা হিসেবে অধিকার ও সম্মান পেয়ে থাকেন। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হলেও নারীর প্রাধান্যও যথেষ্ট দেখা যায়। জাতিতত্ত্বের নিরিখে আদিবাসীরা প্রাগার্য রক্তের বাহক হলেও ক্রমশ তাদের সমাজে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রভাব দেখা যাচ্ছে । এদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার লক্ষণ দেখা যায় কন্যাপণের ক্ষেত্রে। সামাজিক দু'একটি ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য ছাড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারে পিতার ভূমিকা ব্রাহ্মণ্যশাসিত বৃহৎ বঙ্গসমাজের মতোই। এদের সমাজেও অনেকসময় 'একান্নবর্তী' যৌথ পরিবার দেখা যায়। প্রত্যেকটি আদিবাসী সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধনের এক বহিঃপ্রকাশ পূর্বপুরুষ পূজা। বিশেষ করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধারা বছরের বিশেষ এক সময়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে ফলমূল নিবেদন করে।

প্রতিটি আদিবাসী সমাজের জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা আচার আচরণের মধ্যে যেমন সেই লোকসমাজের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, আবার অনেকক্ষেত্রেই বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে মিলও দেখা যায়। বাঙালি সমাজে সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান চলে পঞ্চম, সপ্তম ও নবম মাসে, অনুরূপভাবে লোধাদের ও শবরদের ক্ষেত্রে সাধভক্ষণ হয় সপ্তম ও নবম মাসে; সাঁওতাল ও খেড়িয়াদের মধ্যে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের রীতি নেই। লোধা ও শবর শিশুর জন্ম হওয়ার একুশ দিন পর 'একুশ' অনুষ্ঠান পালন হয়। সেদিন শিশু সন্তানের মা স্নান করে, নখ কাটে এবং পবিত্র হয়। এই একই সংস্কার বাঙালি সমাজেও

দেখা যায়। কিন্তু খেড়িয়া সমাজে নয়দিনে, সাঁওতাল সমাজে ছেলে হলে পাঁচদিনে এবং মেয়ে হলে তিনদিনে 'জানাম ছাটিয়ার' বা শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান হয়। তবে অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালি সমাজের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের জন্মকেন্দ্রিক সংস্কারে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, সাঁওতালদের কোন শিশুর জন্ম হলেই সমস্ত গ্রাম অশুচি বলে ধরা হয় এবং অশৌচ না কাটান পর্যন্ত গ্রামে কোন পূজা অনুষ্ঠান হয় না। নামকরণের ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের রীতিনীতির কোন ছাপ নেই বাঙালি সমাজে, ব্যক্তিবিশেষে কোন সংস্কার থাকতেও পারে। সাঁওতালদের ও মুণ্ডাদের প্রথম সন্তান পিতৃকুলের নাম পায়। ছেলে ঠাকুরদার নাম আর মেয়ে ঠাকুরমার নাম। পরবর্তীকালে দাদু-দিদিমা, কাকু-কাকিমাদের নাম একে একে রাখা হয়। খেড়িয়া ও শবর সমাজে শিশু একবৎসর না হওয়া পর্যন্ত নামকরণ হয় না। আবার লোধাদের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সমাজেরই ছয় মাসে শিশুর 'মুখে ভাতে'র অনুষ্ঠান হয়। লোধাদের মধ্যে শীতলা ঠাকুরের থানে 'ভোগ বা 'ক্ষীর' তৈরি করে ঠাকুমা বা দিদিমাকে দিয়েই শিশুর মুখে ছোঁয়ানো হয়। সাঁওতাল সমাজের মুখে ভাতের অনুষ্ঠান প্রায় একই রকম হয়, মামার বাড়ির লোকজন এসে আচার পালন করে, এই ঐতিহ্য আমরা বাঙালি সমাজেও দেখি।

প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সমাজে পরিণত বয়সে বিয়ে করার প্রথা আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিয়ের প্রচলন হয়েছে। তবে বাঙালি সমাজের যেটা মূল পার্থক্য সেটা হল আদিবাসীদের মধ্যে কন্যাপণের প্রচলন আছে, কন্যার মাকে পণ দিতে হয়। বিবাহ-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপজাতির বিচিত্র রীতি প্রচলিত। সাঁওতাল সমাজে ছেলেমেয়ে উপযুক্ত হলে বাবা-মায়েরাই পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে। নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না। এদের মধ্যে আট ধরনের বিবাহ আছে। এত প্রকার বিবাহের কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। যেমন – উভয়পক্ষের অভিভাবকের কোন একজনকে মাধ্যম করে বর-কন্যাকে পছন্দ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে কনের বাড়িতে বিবাহ সম্পন্ন করে, একই রকম পদ্ধতিতে বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়, কন্যাপক্ষ বিয়ের খরচ বহন করতে অক্ষম হলে পাত্রীকে বরের বাড়িতে এনে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়, বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতিতে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলে কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়, পরে উভয়ের বাড়ির লোকে মেনে নিয়ে নিয়ম-সংস্কার পালন করে। অবিবাহিত মেয়ে গর্ভবতী হলে তার জন্য অর্থের বিনিময়ে পাত্র সংগ্রহ

করে বিবাহের আয়োজন করে, পাত্রী দেখতে কুৎসিত হলে পাত্রীর বাড়িতেই বিবাহের পর 'ঘর জামাই' থাকার ব্যবস্থা হয়, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন করে। সাঁওতাল সমাজে এইসব বিবাহগুলির নামকরণ থাকে, কিন্তু নামকরণ না থাকলেও এই ধরনের বিবাহপদ্ধতি বাঙালি সমাজেও প্রচলন আছে। সাঁওতাল ও বাঙালি সমাজের বিবাহের মধ্যে মিল যেমন দেখা যায় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যও আছে। যেমন – বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজের গায়ে হলুদের মতো সাঁওতালদের বিয়েতে গায়ে হলুদ একদিনে হয় না, তিনদিন ধরে হয়। তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে অনেকে একদিনে তিনবার গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করেন। বিবাহস্থলে চারদিকে শালগাছের ডাল দেওয়া থাকবে, মূল বিবাহের আগে মেয়ের সঙ্গে মহুলগাছের বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে অনাবশ্যক আড়ম্বর এরা পছন্দ করে না। বিয়েতে অতিপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া মেয়ের সঙ্গে কোনকিছু দেওয়ার নিয়ম নেই। সাঁওতালদের বিয়ের সময় ছাত্‌না তলার মাটির ঢিবি নদী থেকে মাটি নিয়ে এসে করা হয়। টগর ফুলের মালা দিয়ে এদের মালাবদল হয়।

লোধাদের বিবাহের রীতির সঙ্গেও বাঙালির বিবাহের মিল ও অমিল দুটিই আছে। লোধাদের বিয়ের দিন বরের পিসি কনের বাড়িতে পাঁচখণ্ড হলুদ, সরষের তেল, ঘুনসি, কাঠের মালা কন্যার জন্য নিয়ে আসে। একে গায়ে হলুদ বলে। এদের মধ্যেও কনে বাড়িতে ছাত্‌না তলায় মাটির ঢিবি বা বেদী তৈরি করা হয়। সেখানেই বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। ছাত্‌না তলায় পাত্রপাত্রীকে সামনাসামনি বসিয়ে মাথার উপর দুইজন লোক কাপড় ধরে থাকে। তখন বরের ভগ্নীপতি বরের মাথায় পাগড়ির সঙ্গে কন্যার শাড়ি বেঁধে দেয়। সেই সঙ্গে বর এবং কনে পরস্পরের কপালে সিন্দুর ছুঁইয়ে দেয়। লোধাদের মধ্যে গাছ বিবাহেরও প্রচলন আছে। বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করলে তখন তার পূর্বে আমগাছ বা মহুয়া গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়।

খেড়িয়া সমাজে ছেলের পক্ষ থেকে ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব আসে। উভয়ের বিবাহ মণ্ডপে মহুয়া গাছের ডাল পোঁতা হয়। উভয়ের বাড়িতেই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। এরপর নিকটবর্তী কোন পুকুর বা নদীতে স্নান করানো হয়। এদের মধ্যেও গাছ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বরের সঙ্গে আমগাছের, কনের সঙ্গে মহুল গাছের বিবাহ দেওয়া হয় অপদেবতাদের কুনজর এড়ানোর জন্য। এদের বিয়ের অনুষ্ঠান হয় সকালবেলা। পুরোহিতের সাহায্যে এদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত উভয়ের মাথায় প্রচুর তেল মাখিয়ে লক্ষ্য করেন

তেল কোথা দিয়ে গড়াচ্ছে। যদি নাকের উপর দিয়ে গড়ায় তবে বুঝতে হবে তাদের কপালে দুঃখ আছে। তার দোষ কাটাবার জন্য নানা তুকতাকও করা হয়। বর ও কনে পরস্পর পরস্পরের কপালে সাতবার সিঁদুর লাগায়। এরপর মালাবদল ও গাঁটছড়ার দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হয়। শবরদের মধ্যে বাল্য বিবাহকেই বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রায় সব উপজাতিগুলির মধ্যে বিধবা বিবাহের চল আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় ভাইয়ের মৃত্যু হলে ছোট ভাই তার বিধবা বৌদিকে বিবাহ করতে পারবে কিন্তু ছোটভাই মারা গেলে বড়ভাই কখনো ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না।

জন্ম ও বিবাহের মতো মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানেও সাঁওতাল, লোধারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচরণবিধি মেনে চলে। হিন্দুদের মত সাঁওতালরাও মৃতদেহ দাহ করে, তবে অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুকে কবরস্থ করা হয়। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে তেল হলুদ মাখানো হয়। মেয়েরা শ্মশানে যেতে পারে না, কুলহি মাথা (গ্রামের শেষপ্রান্ত) পর্যন্তই যেতে পারে। শ্মশানে পুনরায় তেলহলুদ মাখানো হয়ে থাকে, সধবাদের সিঁদুর পরানো হয়। চিতা সাজিয়ে দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়ানো হয়। এই সময় একটি মুরগি বাচ্চা বলি দেওয়া হয়, সেটি মৃত আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, এই তাদের বিশ্বাস। এরপর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখাগ্নি করে। দাহ শেষ হলে দগ্ধাস্থি সংগ্রহ করে একটি মাটির ভাঁড়ে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পাঁচদিন পর 'তেলনাহান' অনুষ্ঠানের দ্বারা অশৌচ ত্যাগ করা হয় এবং গ্রামবাসীদের ভোজ খাওয়ানো হয়। লোধাদের মৃতদেহ সৎকারও সাঁওতালদের মতো। অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু ও সংক্রামক রোগী ছাড়া মৃতদেহকে দাহ করা হয়। মৃতদেহের মাথার কাছে কাস্তে রাখে, যাতে দুষ্টু ভূত না আক্রমণ করতে পারে। লোধাদের নির্দিষ্ট কোন শ্মশানভূমি নেই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই দাহ করে, দাহ করে ফেরার সময় গাছের সাথে মৃতের খাটিয়া দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় যাতে ভূত আসতে না পারে। মৃতের রক্তসম্বন্ধীয় লোকেরা দশ দিনে অশৌচ পালন করে এবং নাপিত ডেকে চুল কাটায় এবং পুত্রদের মাথা মুণ্ডন করায়। এগারো দিনে শ্রাদ্ধ পালন করে। গ্রামের লোকেদের ভোজের ব্যবস্থা করে। কিন্তু শবররা ও খেড়িয়ারা মৃতদেহ দাহ করে না, কবরস্থ করে। শবররা খাটিয়াকে উলটো করে তাতে মৃতদেহ সাজিয়ে কবরের মত নিয়ে যায়। কবরস্থানে মেয়েদের যাওয়ার অধিকার নেই। উত্তরদিকে মাথা রেখে কবর দেওয়া হয়। খেড়িয়ারা মৃতদেহ

কবরস্থ করলেও হিন্দুসংস্কৃতির মতো মৃতদেহকে ভাল করে তেল ও হলুদ মাখায়। তারপর খাটিয়ায় করে 'হরিবোল' বলতে বলতে কবরস্থানে নিয়ে যায়। মেয়েরা যেতে পারে না। মৃতদেহকে শবরদের মতো উত্তরদিকে মাথা রেখে কবরস্থ করে। সাতদিন বা দশদিন পর্যন্ত অশৌচ চলে। সেইসময় বাড়ির লোকেরা সবকিছু সেদ্ধ খায়, তেল-নুন ছাড়া। অশৌচকাল শেষ হলে নখ-চুল কেটে , স্নান করে শুদ্ধ হয়। এই উপজাতিগুলির মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কারগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত বাঙালি সমাজেরই হিন্দু ধর্মসংস্কৃতি ও মুসলিম ধর্মসংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।

এছাড়াও বেশ কিছু ট্যাবুরও আলোচনা করা যেতে পারে, যেগুলির সাধারণ বাঙালি সমাজের মতো আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলন আছে। যেমন বাঙালিরা শুভকাজের প্রতীকরূপে জলপূর্ণ কলস স্থাপন করে। আদিবাসীদের মধ্যে ঐ একই পদ্ধতির আদিমরূপ দেখা যায়। কনে দেখতে যাওয়ার আগে পাত্রপক্ষ জলপূর্ণ কলস বাড়িতে রেখে যায়। তার জল যদি কমে যায় তবে সেটি অশুভ হিসেবে ধরা হয়। নারীদের যেসব নিষেধ মেনে চলতে হয় তা আদিবাসী সমাজ ও বাঙালি সমাজে প্রায়ই এক। যেমন – সন্ধ্যাবেলা একা কোথাও বের হতে পারবে না, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরের বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ, কোন কিছু সেলাই করতে পারবে না ইত্যাদি। আদিবাসী সমাজের মতোই বাঙালিরাও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সেলাই করা কাপড়কে নিষিদ্ধ মনে করে। একই গোত্রে বিবাহ উভয় সমাজেই নিষিদ্ধ।

শুধুমাত্র ধর্ম বিশ্বাস-সংস্কারে নয়, পরব-উৎসব-অনুষ্ঠানেও আদিবাসী সমাজ ও বাঙালি সমাজ নিজেদের সংস্কৃতি একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান করেছে। যেমন- পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকসমাজ ও আদিবাসী লোকসমাজ উভয়েরই 'টুসু' এক স্মরণীয় উৎসব। এছাড়া লোধারা বড়াম পূজার সময় যে মকর পরব উদ্‌যাপন করে তা লোকসমাজের মকর পরবের সাথে অভিন্ন। অনুরূপভাবে এই দুই সমাজের মধ্যে বাঁধনা পরবেরও প্রচলন আছে। সাঁওতালদের শস্যসংগ্রহ হয়ে যাওয়ার উৎসব যেমন 'সহরায়', বাঙালিদের তেমনি 'নবান্ন'। আবার মেদিনীপুরের 'সহরায়' উৎসব হয় কালীপুজোর সময়, তখন এই উৎসবে গৃহপালিত গবাদি পশুর কল্যাণ কামনা করে তাদের পুজো করা হয়। ঐ একই সময়ে বাঙালিদের 'বাঁধনা' পরব অনুষ্ঠিত হয়। পৌষসংক্রান্তিতে সাঁওতালদের 'সাকরাত' উৎসব ও বাঙালির পৌষপার্বণ একইরকম পালনীয় অনুষ্ঠান।

পরিশেষে বলা যায় যে, আদিবাসী সংস্কৃতি ও বঙ্গসংস্কৃতির মানুষের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও আদিবাসী সভ্যতার মানুষেরা আপন মহিমাতে বেঁচে আছেন। কিছু কিছু আগের সংস্কার এখনও থেকে গেছে। তাঁদের ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথ বহুদিন থেকে রুদ্ধ হয়ে আছে। এদের সীমাহীন দুর্গতির থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় স্বজাতিভুক্ত শিক্ষিত সচেতন মানুষ। আর তাই হয়তো বর্তমানে তারা নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। একই সামাজিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে বসবাসকারী মানুষেরা আজ পুনর্মূল্যায়ন করছেন।

....

মুর্শিদাবাদের বাঙালি মুসলমানদের মিশ্রলোকাচার

বিপত্তারণ প্রহরাজ

ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জেলা মুর্শিদাবাদ একসময় অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ছিল। নবাবী আমলে এই জেলা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত সমগ্র বাংলা। ধর্মে মুসলিম শাসকদের ইচ্ছাতেই একসময় দলে দলে হিন্দুদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এই সময় থেকেই এই জেলায় বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে একটি মিশ্রসংস্কৃতি। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে হিন্দুরা মুসলিম হলেও দীর্ঘদিন ধরে যে লোকাচার পালনে অভ্যস্ত, তার বেশকিছু রেশ তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। আর এভাবেই মিশ্রসংস্কৃতির জন্ম হয়েছে , যা আজও প্রবাহিত হচ্ছে বিভিন্ন লোকাচারে।

সন্তানধারণ থেকে সুন্নৎ সময়কালীন যে সমস্ত লোকাচারগুলি মুসলিম সমাজে পালিত হয়, সেগুলিও এই মিশ্রসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। আমরা এই লোকাচারগুলিই কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে নিয়ে আলোচনা করব।

১. গর্ভধারণ থেকে জননী : গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভধারণ লক্ষণ যেদিন থেকে প্রকাশ হতে থাকে, ঠিক সেই দিন থেকে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন প্রকার সংস্কার। মা ও ভাবী সন্তানের সুস্থতা ও মঙ্গলের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রতিমুহূর্তেই সচেষ্ট। আর এই সচেষ্টতা ও সাবধানতা থেকেই জন্ম বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধের। যেমন-

(ক) সন্ধ্যার সময় গর্ভবতী মেয়েদের বাইরে যেতে নেই।
(খ) সন্ধ্যার সময় (ভরা সাঁঝে) মাথার চুল খোলা রাখতে নেই।
(গ) কোথাও গেলে চুল খোলা রেখে যেতে নেই।
(ঘ) ভরা সাঁঝে একা একা পুকুর ঘাটে যেতে নেই।
(ঙ) সন্ধ্যার পর ঘরে মাটি দিতে নেই।
(চ) কখনো পা ধুলে যেন পুরো পা ভেজে তা দেখা।
(ছ) ঘরের চৌকাঠে বসতে নেই।

- এই সময় নানা প্রকার অপদেবতা ভর করতে পারে, এই ভয় বা বিশ্বাস থেকে এই সংস্কার বা বিধিনিষেধগুলির উৎপত্তি। এই ভয় থেকে, অপদেবতার ছোঁয়া থেকে রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে গৃহীত হয় দুটি লোকাচার-

এক।। মেয়েদের (গর্ভবতী) হাতে একটি লোহা পরিয়ে দেওয়া হয়।
দুই।। কোথাও বেরুলে মাথার চুলে গিঁট দেওয়া হয়।

২. সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান : প্রাচীনকালে চিকিৎসাবিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। প্রসব ঘটানো হতো স্থানীয় দাই-এর সহযোগিতায়। আর প্রযুক্তির কোন প্রকার সাহায্য তখন মিলত না। তাই সেই সময় প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটত আক্‌ছার। অর্থাৎ প্রসূতিরা এক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করত। এই জন্য তাদের সাধপূরণের লক্ষকে সামনে রেখে সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান করা হত।

২.১. পাঁচ মাসের সাধ : পাঁচ মাসের মাথায় একবার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান একান্তই পারিবারিক ও বাহুল্যবর্জিত। পাঁচ মাসের মাথায় যে কোন একটি শুভদিন দেখে অনুষ্ঠান করা হয়। মুসলমানদের কাছে শুক্রবার যেহেতু একটি পবিত্র দিন, তাই কোন একটি শুক্রবারকে বাছতে হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা মাসের প্রথম দিন ও সংক্রান্তির দিনে এই অনুষ্ঠান করা হয় না। অর্থাৎ সাধ খাওয়ানো হয় না। অনুষ্ঠানের দিন ভাল করে গোসল (স্নান) করে প্রসূতি একটি লালপাড় সাদা শাড়ি পরে অথবা পুরো লাল শাড়ি পরে। এইদিন প্রসূতিকে শুধুমাত্র পায়েস খাওয়ানো হয়। ভাবী(বৌদি) স্থানীয় সাতজন এয়োস্ত্রী এসে পায়েস খাওয়ায়।

২.২. সাত মাসের সাধ : সাত মাসের সময় সীমার মধ্যে আর এক সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আড়ম্বরের মধ্যেই পালিত হয়। এই দিনে যে সব সংস্কারগুলি পালন করা হয়, সেগুলি হল গর্ভবতী মেয়েটি সকালবেলায় মাথা ভিজিয়ে ভালভাবে স্নান করে, স্নান করার পর হয় লাল পাড় সাদা শাড়ি অথবা লালরঙের শাড়ি পরে। সাধ খাওয়ানোর জন্য সাতমাসের মাসটির যে কোন একটি শুভদিন দেখে সেই দিনে সাধ খাওয়ানো হয়। এক্ষেত্রে মাসের প্রথম দিন ও শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন সাধ দেওয়া হয় না। সাধ দেওয়া হয় না অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন। ইসলাম ধর্মমতে শুক্রবার একটি শুভদিন তাই সপ্তাহের কোন একটি শুক্রবারকেই শুভদিন হিসেবে বাছা হয় এবং ঐ দিন সাধ দেওয়া হয়। উপকরণ হিসাবে প্রধান হল পায়েস এবং সঙ্গে সাত রকমের মিষ্টি, সাত রকমের ফল দিতে হয় (পাকা কলা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক)। সাধভক্ষণের সময় গ্রামের সাতজন মেয়েরা (ভাবি স্থানীয়) পর্‌পর এসে পায়েস খাওয়ায়।

৩. বাপের বাড়ি যাওয়া : প্রথম সন্তান বাবার বাড়িতেই হবে এটাই সংস্কার। বাপের বাড়ি থেকে ৮-৯ মাসের মাথায় বেশ কয়েকজন লোক আসে

(আত্মীয়) মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা উপহার হিসাবে নিয়ে আসে মেয়ে-জামাইয়ের জন্য নতুন জামাকাপড়। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যও নিয়ে আসে। পাড়াপ্রতিবেশিদের খাওয়ানোটা একটা রেওয়াজ। প্রত্যেক পাড়া প্রতিবেশিদের লুচি খাওয়ানোটাই প্রথা। আর খাওয়ানোর জন্য সমস্ত জিনিসপত্র মেয়ের বাবার বাড়ির লোকেরা নিয়ে আসে। যদি কারও পাড়া প্রতিবেশিদের খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে আটা-গুড় পারলে আরও কিছু বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আর প্রসূতি বাপের বাড়িতে যাওয়ার আগে বাড়ি এবং পাড়া প্রতিবেশি প্রত্যেকের কাছ থেকে যদি সে কোন দোষ করে থাকে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়। আর প্রত্যেককে তার নিজের জন্য, ভাবীসন্তানের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া মাগ্‌তে বলে। আসলে পূর্বে সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুর ঘটনা খুব ঘটত। তাই এই ক্ষমা চাওয়া ও দোয়া প্রার্থনা।

৪. আঁতুড় ঘর ও আঁতুড় ঘরের সংস্কার : সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রসূতিকে অন্দরমহল থেকে আলাদা করে পৃথক করে একটি ঘরে রাখা হয়। এই ঘরটিকে বলে আঁতুড় ঘর। অবস্থাপন্ন বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট ঘরই থাকে আঁতুড় ঘর হিসাবে। আর যেখানে সামর্থ্য নেই, সেখানে কোনভাবে একটি অস্থায়ী ঘর খাড়া করে দেওয়া হয়। আঁতুড় ঘরের কর্ত্রী হল দাঁই (স্থানীয় ভাষায় বলে 'ধাই')। দাঁইরাই সন্তান প্রসব করাতো। সন্তান প্রসব হয়ে যাওয়ার পর নাড়ি কাটার কাজটা পূর্বে করতো এই দাঁইরা। সরু বাঁশের ফালি যা যথেষ্ট ধারালো হত, তা দিয়ে নাড়ি কাটত। নাড়ি কাটার পর তাতে তেল ও পাঁশের গুড়ো লাগিয়ে দিত। এই নাড়ি কাটার বিনিময়ে দাঁই যা পেত –

ক) ছেলে হলে – চাল ও কিছু টাকা।

খ) মেয়ে হলে – চাল ও কিছু টাকা (ছেলের অর্ধেক পরিমাণ)

একটি বাঁশের তৈরি কুলাতে করে দাঁইকে এই চাল ও টাকা দেওয়া হত।

ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দাঁই নবজাতককে ভাল করে স্নান করাতো, এরপর ধুয়ে-মুছে একটি নতুন কাপড়ে ঢেকে দিত এবং দু'হাতের মধ্যে নিয়ে 'ছেলে গো', 'কার ছেলে গো' বলে দোলাত। শিশুটির মা তখন বলত 'আমার' এবং সাধ্য অনুসারে টাকার বিনিময়ে ছেলেটিকে দাঁইমায়ের কাছ থেকে নিত। দাঁই আঁতুড় ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় কিছু সরষে নিয়ে আঁতুড় ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে দিত। একে বলে আঁতুড় ঘর বাঁধা। এর ফলে কোন ভূত – প্রেত বা অপদেবতা এই আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করতে পারতো না।

মা ও ছেলে আঁতুড় ঘরে থাকার সময় উভয়ের মঙ্গলের জন্য বেশ কিছু সংস্কার মানা হতো। যেমন– ছেলের মাথার সামনে (শিয়রে) একটি মুড়ো ঝাঁটা রেখে দেওয়া। ঘরের ভিতর একটি মালসাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা (যদি গরমের কাল হয় তবে এই আগুন বাহিরে রাখা হয়), ছেলের হাতে একটি চামড়ার তৈরি বালা পরিয়ে দেওয়া হয়; ছেলের হাতে বেঁধে দেওয়া হয় একলতি লতা; ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয় তিনকাটি গাছ (ফণিমনসা), ছেলের মাথার সামনে একটি লোহাও রাখা হয়। ছেলের যদি চোখ লেগে যায় তাহলে খাবার পূর্বে মা হাতে ভাত নিয়ে তিনবার ফুঃ দেয়। আঁতুড় ঘরে থাকার সময়টা অশৌচ চলে। তাই মা প্রত্যেকের নিত্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র স্পর্শ করতে পারতো না (যেমন – প্রত্যেকের ব্যবহার করা টিউবওয়েল থেকে জল নিতে পারতো না)। যে পথ দিয়ে সে যেত বা বাইরে যেখানে তার খাবার রাখা হত (এই খাবার সে ভিতরে নিয়ে নিত) – সে জায়গাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে দিত। মায়েদের হাতে একটি লোহা রাখতে হতো এবং আঁতুড় ঘরের চৌকাঠে কোনভাবেই বসা চলত না, মাথার চুল সন্ধ্যার পর খুলে রাখা চলতো না।

৪.১. সন্তান জন্মানোর পর ছয় দিনের রাতটা ভয়ানক রাত। এই রাত শেষ হলেই সাত দিনের দিন আঁতুড় ঘর থেকে মা-ছেলে বেরুতে পারত। তাই এই দিনে নানা প্রকার অপদেবতা, ভূত-প্রেত, জিন-পরি আক্রমণ করে এইরকমই বিশ্বাস। এই জন্য ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলে সারারাত জেগে পাহারা দিতে হত। একটি কাঁসার থালাতে করে আঁতুড় ঘরের ভিতর চাল, দূর্বা, টাকা ও লোহা রাখা হত। আর একে বলা হত সেঁটের বাড়ানি। আর একটি কলাপাতার উপর রাখা হত কালি ও কলম – বিশ্বাস এই দিন নবজাতকদের ভাগ্য লেখা হত। মাকে ভাতের সঙ্গে ছয় রকমের সেদ্ধ খেতে দিত। অবশিষ্ট খাবার সাত দিনের ভোরে লোকচক্ষুর অন্তরালে পুকুর ঘাটে দিয়ে আসতে হতো।

৪.২. সন্তান জন্মের ঠিক সাত দিনের মাথায় হত শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। এই দিনে মা ও ছেলে আঁতুড় ঘরের থেকে মুক্ত হত। অশৌচ কাটানোর জন্য কিছু নিয়ম-সংস্কার মানতে হত। যেমন, একটি পাত্রে (একটি বড় পেতলের বা কাঁসার থালা) জল নেওয়া হত, তাতে দূর্বাঘাস ও হলুদ দেওয়া হত। নিমপাতাবাটা নবজাতকের সারা শরীরে ভালো করে মাখিয়ে দেওয়া হত। এরপর ঐ থালার জলে ভালো করে স্নান করানো হয় এবং ঐ থালাটি মাটিতে

উপুড় করে দেওয়া হত। নবজাতককে যে স্নান করায় সে এরপর তাকে মাটিতে / মেঝেতে সুইয়ে দেয়, অন্য একজন গায়ে জল ছিটিয়ে তুলে নেয়, যে তাকে তুলে নেয় তাকে অবশ্যই স্নান করে ধোয়া কাপড়-জামা পরে সুদ্ধ থাকতে হবে।

মা ভালো করে স্নান করে এবং মা-ছেলে এরপর নতুন জামাকাপড় পরে। এই নতুন জামা-কাপড় এবং মিষ্টি আসে মা-এর শ্বশুর / স্বামীর বাড়ি থেকে। এই সময় মাকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়, ছেলের মুখেও মিষ্টি লাগানো হয়(খেতে পারে না বলে শুধু ছুঁইয়ে দেওয়া হয়), ছেলের মুখ দেখে অনেকে বিভিন্ন উপহার দেয় (টাকাই বেশির ভাগ দেয়)।

এইদিন ঝালভাত রান্না করা হয়। এটি নামেই ঝালভাত, আসলে এটি ঝাল হয় না। সাতটি তরকারি দিয়ে এটি খেতে দেওয়া হয়। সাতদিনের দিন আঁতুড় ঘরে যে চাল দেওয়া হয়, তা বিক্রি করে মাছ কেনা হয়। এই শুদ্ধিকরণের পর মা অশৌচ থেকে মুক্ত হয় এবং সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫. নামকরণ : নবজাতকের জন্য পিতামাতার একটি বিশেষ কর্তব্য হল সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে তারজন্য শ্রুতিমধুর ও অর্থবোধক নাম রাখা। আল্লাহ্‌তালার ৯৯টি নাম এগুলির সাথে আরও কিছু অর্থপূর্ণ কাজ যোগ করে নাম রাখাই শরিয়তি।

৬. চল্লিশা : সন্তান জন্মের চল্লিশ দিনের দিন অনুষ্ঠিত উৎসব 'চল্লিশা'। এটিও একধরনের শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। এই দিন মা ও ছেলে ভাল করে স্নান করে এবং নতুন জামাকাপড় পরে। মা-এর হাতে যে চুড়ি থাকে তা এদিন খুলে ফেলা হয়, তারপর নতুন চুড়ি পড়ানো হয়। এরপর ৯ জন পোয়াতি যে – জায়গাটিতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেইখানে দুই থালা ভাত ঢেলে দেয়।

৭. আকীকা : বুখারী ও মুসলিম সূত্রঃ মিশাখাত (পৃঃ ২৪১)-এ বলা হয়েছে – 'ইমামগণের ঐক্যমতে 'আকীকা' একটি মুস্তাহাব আমল। তাই নবজাতক সন্তানের পিতার পক্ষে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়পূর্বক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আকীকা করা মুস্তাহাব'।

৭.১. সময় : আকীকা হল সন্তানের নামে পশু জবাই করা। লোক প্রচলিত বিশ্বাস হল – 'রক্তের বদলে রক্ত, লোমের বদলে লোম' – অর্থাৎ সন্তানের হিত বা মঙ্গলই জড়িয়ে আছে এই আচার-অনুষ্ঠানে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে চতুর্দশতম দিনে, তাও যদি না হয় তবে একবিংশতিতম দিনে।

আর একবিংশতি দিনে না পারলে যেদিন সম্ভব হবে সেইদিন। তবে এক্ষেত্রে সন্তানের জন্মের ৭ দিনের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অর্থাৎ যে তারিখে সন্তানের জন্ম হয়েছে, সেই তারিখ থেকে ৭ দিনের গুণিতক দিনে আকীকা দিতে হবে।

নবজাতক শিশুর নাম রাখার পর কর্তব্য হল, ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি কুরবানীতে যবেহযোগ্য পশু দ্বারা আকীকা করা । নামকরণ বাড়ির লোকেরাই ঠিক করেন এবং সেই নামটি 'যবেহ' করার সময় যিনি যবেই করেন (মসজিদের মৌলবি) তিনি দিয়ে দেন এবং ঐ নামেই যবেই করা হয়।

নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দুটি পশু ও মেয়ে হলে একটি পশু 'যবেহ' করতে হয়। কেউ একটি বা দুটি পশু দিতে না পারলে তবে ছেলে হলে গরু বা মহিষের দুই অংশ এবং মেয়ে হলে এক অংশ আকীকা করা হয়। এই আকীকা অনেকটা কুরবানীর মতই। আকীকার দিন যে পশুটিকে যবেহ করা হবে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং যবেহ করার সময় তাকে পশ্চিম দিকে মুখ করে ফেলতে হয়। এরপর ঐ নবজাতকের নামে আড়াই প্যাঁচে যবেহ করতে হয়। কুরবানীর মতই আকীকার ক্ষেত্রে পশুর বয়সের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। ছাগল, ভেড়া হলে এক বছর বয়সী , মহিষ হলে দুই বছর বয়সী এবং উট পূর্ণ পাঁচ বছর বয়সী। যবেহ করার পর পশুটির চামড়া রক্ত, হাড়-গোড় এবং অন্যান্য অংশ কোথাও ফেলে দেওয়া চলে না, এগুলিকে মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

আকীকার পশুর গোশতকে নিখুঁত করে তিন ভাগে ভাগ করতে হয়, এর এক তৃতীয়াংশ নিজেদের বাড়ির সদস্যদের জন্য রেখে বাকি এক তৃতীয়াংশ গরীব মিস্‌কীনদের জন্য সাদাকা করে দিয়ে বাকি আর এক তৃতীয়াংশ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। বাড়ির সদস্যদের জন্য যে গোশত (মাংস) রাখা হয়, তা সকলে খেতে পেলেও সন্তানের মা বাবা খেতে পায় না।

আকীকার দিন এক বিশেষ সংস্কার হল মাথা মুড়ানো বা কামানো। আকীকার দিন নাপিত অথবা বাড়ির কেউ নবজাতকের মাথার চুল কামিয়ে দেয়। পরিত্যক্ত চুলগুলিকে নিখুঁতভাবে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে সমপরিমাণ সোনা বা চাঁদি দিতে হয়। ঐ সোনা বা চাঁদির যা বাজার মূল্য সেই পরিমাণ টাকা ফকির / ভিখারিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয় এবং ঐ চুলগুলি কোথাও না ফেলে দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

৮. মুসলমানি বা সুন্নৎ খৎনা : ছেলেদের মুসলমানি বা খৎনা অবশ্য

করণীয় এক সংস্কার। মুসলমানী – এই কথাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই আচার-অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু। মুসলমানি অর্থাৎ মুসলিম হিসাবে পরিগণিত হওয়ার বা ছাড়পত্র পাওয়ার। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) খাললুল্লাহ্ নিজের এবং ছেলের সুন্নত / খৎনা / মুসলমানি একি দিনে করেছিলেন। আর এর পর থেকেই এই প্রথা প্রচলিত হয়। হাদিশে এই কথাই লিখিত আছে। আর দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় এটি প্রচলিত হয়ে আজও সমভাবে বিদ্যমান।

৮.১. মুসলমানির বয়স : ছেলের ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে মুসলমানি করতেই হবে। তবে এক্ষেত্রে কোনভাবেই কোন জোড়া বৎসরে (যেমন – ২, ৪, ৬, ৮, ১০)- এটি করা যাবে না। করতে হবে কোন বিজোড় বৎসরে অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ, সাত, বা এগারো বৎসর বয়সের মধ্যে। মুসলমানি বিজোড় বৎসরের যে কোন মাসেই দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে কোন একটি শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠানটি করা হয়।

৮.২. থুবড়ো : যেদিন মুসলমানি হবে ঠিক তার আগের দিন থুবড়ো দেওয়া হয়। থুবড়ো সন্ধ্যার সময় খাওয়ানো হয়। যার মুসলমানি হবে সে ভালভাবে গোসল করে, ওজু করে, নতুন পায়জামা পাঞ্জাবী অথবা শেরওয়ানি পরে এবং মাথায় টুপি বা পাগড়ি পরে বসে। মাদুর বা শতরঞ্চি-র উপর একটি আসনের উপর বসে। সামনে রাখা হয় একটি কাঁসায় পায়েস, মিষ্টি। আর একটি কাঁসার থালা খালি রাখা হয়। আর একটি তর্সে (গ্রাম্যকথায় চিলিঞ্চি – হাত ধোয়ার পাত্র) রাখা হয়। এরপর মৌলবি সাহেব বা নানা স্থানীয় কেউ দোয়া পড়ান যার মুসলমানি হবে তাকে। সকলে এরপর একে একে এসে থুবড়ো খাওয়ায়, চামচে করে তুলে তুলে। থুবড়ো খাওয়ানোর পর তর্সে হাত ধুয়ে নেয় এবং পাশের খালি থালাটিতে টাকা বা উপহার রাখে। থুবড়ো খাওয়ানোর কোন বাধা-নিষেধ নেই, যে কোন সম্পর্কে স্থানীয়রাই এই থুবড়ো খাওয়াতে পারে। থুবড়ো খাওয়ানো হয়ে গেলে নানিমা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেন। কিছু প্রাথমিক শর্ত-

(ক) একটি নতুন গামছা কোলের উপর পেতে রাখে।

(খ) পশ্চিম দিকে মুখ করে বসতে হয়।

(গ) প্রথমে নানী স্থানীয় যে থুবড়ো খাওয়ান তিনি বিসমিল্লা বলে খাওয়ান।

যে নতুন গামছাটি থুবড়ো খাওয়ানোর সময় কোলের উপর রাখা হয়, থুবড়ো খাওয়ানো পর্ব শেষ হয়ে গেলেই সমস্ত পোষাক খুলে রেখে এই

গামছাটি পরিয়ে দেওয়া হয়। মুসলমানি যিনি করেন তাকে বলে হাজাম। হাজাম এটি একটি বংশানুক্রমিক পেশা নয়, এটি একটি শিক্ষণীয় পেশা। অর্থাৎ একজন হাজামের বিদ্যা ভাল করে রপ্ত করে ধীরে ধীরে কেউ এই হাজামে পরিণত হয়। হাজাম এই কাজটি করার জন্য নিজেকে পুণ্যবান মনে করেন, এবং প্রতিটি মুসলমানি করার সাথে সাথেই তার পুণ্য বেড়ে যায় বলে বিশ্বাস করেন। হাজাম যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন ভাল করে গোস্ল ও 'ওজু' করে নিজেকে শুদ্ধ করে নেন এবং মন্ত্রবলে নিজের শরীর বন্দনা করে নেন , তারপর বাড়ি থেকে বের হন। হাজাম যে সব অস্ত্র ব্যবহার করে সেগুলি হল বাঁশের তৈরি দুটো সরু সরু মাপকাঠি, একটি বাঁশের তৈরি চিম্‌টি এবং কাটার জন্য খুর (পূর্বে বাঁশের ফালি ব্যবহার করা হত, নাম চোঁদালি) ব্যবহার করে।

৮.৩. পদ্ধতি : মুসলমানি যার করা হবে তাকে একটি ধামার উপর বসানো হয়। ধামার উপর পেতে দেওয়া হয়, থুবড়ো খাওয়ানোর সময় ব্যবহৃত নতুন গামছাটি। এরপর হাজাম ভাল করে একটি গণ্ডি ঐ ধামাটির চারপাশে কেটে দেয় এবং গণ্ডি কাটার পূর্বে যে ছেলেটাকে ধরবে তাকে ঢুকিয়ে রাখে। গণ্ডি কাটার পর ঐ গণ্ডিতে আর কাউকে ঢুকতে দিত না। এরপর হাজাম জায়গাটাকে ভাল করে বন্দনা করে নিত, যাতে কেউ কোনপ্রকার ক্ষতি করতে না পারে, যার মুসলমানি হবে তার। এরপর মাপকাঠি দিয়ে কতটা কাটবে তা মাপ করে নিয়ে বাঁশের চিমটে দিয়ে চামড়াটাকে টিপে ধরে এবং নিখুঁত দক্ষতায় খুর দিয়ে কেটে ফেলে এবং সানের চামড়াটিকে উলটে দেয়। এখন বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার পাউডার লাগিয়ে দেয়, আগে লাগতো পাশ এবং তেলপোড়া। অবশিষ্ট চামড়াটিকে যত তাড়াতাড়ি শুকোবে তত তাড়াতাড়ি ক্ষতটাও শুকোবে। মোমবাতি / প্রদীপ জ্বেলে একটি তেলে ভেজা সলতে গরম করে ক্ষতে বুলিয়ে দেওয়া হয়, যতদিন না শুকিয়ে যায়, ততদিন নিয়মিত ভাবে এটা করা হয়। হাতে বেঁধে দেওয়া হয় একলতি লতা – বিশ্বাস ঐ একলতির লতা যত তাড়াতাড়ি শুকোবে ক্ষতও তত তাড়াতাড়ি শুকোবে। আর যতদিন না ক্ষত সেরে যাচ্ছে ততদিন ঐ গামছাটিই পড়ে থাকতে হয়।

....

সেকাল ও একালের বঙ্গসমাজ: ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আবু হান্নান গাজী

"আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখণ্ডকে বাংলা বা বাংলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের।"[১] প্রাচীনকালে এ দেশের নাম বাংলা ছিল না। তখন বাংলা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বা জনপদে বিভক্ত। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম[২] শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশ বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।[৩] সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনপদগুলো এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে।[৪] এরপর থেকে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, ও বঙ্গ এই তিনটি জনপদই যেন বাংলাদেশের সমার্থক হয়ে উঠে।[৫] তবে বঙ্গ বা বাংলা নামে বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয় চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজত্ব কালে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ)। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশ বিজিত হওয়ারপর 'বাঙ্গালা' শব্দেও সারা বাংলাদেশ নির্দেশ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।[৬] উল্লেখ্য যে, 'বাঙ্গালা' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। ঐতিহাসিকদের ধারণা 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যোগে[৭] বঙ্গাল অথবা বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ 'বঙ্গাল' থেকে 'বাঙ্গালা' বা 'বাংলা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[৮] মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সময় থেকে বাংলাদেশ 'সুবা বাংলা'[৯] নামে পরিচিত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় পর্যটক এই দেশকে 'বঙ্গালাহ' 'বেঙ্গলা' ও 'বেঙ্গল' নামে উল্লেখ করেন।[১০]

এমনিভাবে সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া, ওঠা-পড়া, উত্থান-পতন, বিভিন্ন রাজশক্তির আগমন-নির্গমনের মধ্যদিয়ে বাংলার জনপদের একীকরণ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার ঐক্যসাধনের ফলে এক সুবিশাল দেশ ও সুমহান জাতি গড়ে উঠে। ইতিহাসে এই দেশই 'বাংলা' এবং এই জাতিই বাঙালি নামে পরিচিত হয়। মূলত বাঙালি জাতির সেকাল-একালের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মনোভাবের অর্ন্তলীন সুর একই মর্মে ধ্বনিত-উচ্চারিত। সমাজ-

ধর্ম-সংস্কৃতি চিন্তা ও মনোভাব হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। এবং হঠাৎ করে বদলেও যায় না ; কালের প্রবাহে নতুন নতুন উপাদানের সংস্পর্শে-সংযোজনে পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটা চিরন্তন বা শাশ্বত রূপ থাকা অস্বাভাবিক নয় ; আধুনিক ধারায় ঐতিহ্যিক স্রোতের অবস্থিতি বাংলার মতো ঐতিহ্যবদ্ধ, ঐতিহ্যসন্ধান পিয়াসী, ঐতিহ্য অনুরাগী-অনুগামী সমাজে খুবই স্বাভাবিক।

বাঙালি জাতি যে সামাজিক উত্তরাধিকারকে ধারণ করে চলেছে কালনিরবধি, বিগত এক হাজার বছরে বাংলার জীবনযাত্রার ধারায় তেমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসেনি, আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিটি অতি প্রসারিত বলে মনে হতে পারে, তবে মানব সভাতার অগ্রগতির প্রধান প্রধান পর্যায় গুলোর কথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলে উক্তিটি অনেকাংশে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনযাত্রার কিছু কিছু মৌলিক দিকে তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি ; মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলের ব্যবহারসহ কৃষির ওপর সামগ্রিক নির্ভরশীলতা,- গ্রামীণ জীবনের গতানুগতিকতা ও সুখ-দুঃখের কথা গ্রাম-বাংলার যাতায়াত ব্যবস্থা, এমনকি প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যেরও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, গ্রাম-বাংলার বাঙালির সমাজজীবনের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবেই একটা চিরন্তন-শাশ্বত রূপ দৃষ্ট হয়। আজও কোকিলের সমধুর আওয়াজে ধ্বনিত কুহুরব, আমের বোলের সৌরভ, মৌমাছির গুঞ্জন, বিলে ও ঝিলে শ্যাওলার মেলা প্রভৃতিসহ ঋতুচক্র ও প্রকৃতির বিভিন্নরূপ যেমন চিরন্তন তেমনি বৃষ্টির দিনে কাদামাখা শিশুদের খেলা বা শ্রাবণের বর্ষার রাতে গ্রাম্য যুবকের সুখনিদ্রা বা ঘরের চালে কুমড়ো গাছকে ঘিরে স্বপ্ন ও অগ্রহায়ণে ভরা ক্ষেতে মধুর হাসি বা নবান্নের উৎসব ও নতুন ধানের ঘ্রাণে চারিদিক সুগন্ধে ভরপুর-সবকিছুই যেন শাশ্বত, চিরন্তন, বাঙালি জাতির নিজস্ব, সমাজ পরিবেশ।

সামাজিক ক্ষেত্রে সেকালে যেমন একালেও তেমনি বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, প্রথা-পদ্ধতি বাঙালির মাঝে বিরাজমান। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা, বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করেন জীবনরস। কিন্তু তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ, এ কারণেই দেশজ মুসলমান বাঙালির মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্ব-চেতনা ও মনন-ধারা থেকে গিয়েছিল, তাই বাঙালি মুসলিম রচিত সাহিত্যের ভাষায়

ভঙ্গিতে, উপমাদি-অলঙ্কারে, বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে মুখ্যত দেশি উপাদান-উপকরণ, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতিই বক্তব্য প্রকাশের বাহন হয়ে রয়েছে আজও।

সেকালের বাঙালিরা নিজেদের জীবন-জীবিকার, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার জন্য যাদু-বিশ্বাসে নির্ভরশীল ছিল। যাদু ঐন্দ্রজালিক শক্তির জনক, মন্ত্রেই তার আবাহন। আনুষঙ্গিক কিছু মুদ্রাভঙ্গি ও উপাচারও থাকে। বাঙালি জাতির এই আদিম বিশ্বাস সংস্কার আজও উন্নত নগরে-গ্রামে-গঞ্জে ও উঁচু সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক-বাহকদের মধ্যেও অবিরল রয়ে গেছে। ভূত-প্রেত-দেও-দানব-জ্বীন-পরী প্রভৃতি মন্দশক্তির প্রতীক আজো শঙ্কা-ত্রাসের কারণ হয়ে বাঙালি সাধারণের মনোলোকে বেঁচে-বর্তে রয়েছে। তাই তুক-তাক-মন্ত্রের জগৎ একটি দুর্ভেদ্য রহস্যলোক। মানুষকে মারা বাঁচানো ছাড়াও মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আধি-ব্যাধি, রূপান্তর-দেহান্তর, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে বিচরণ অবধি সার্বিক জীবন নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে ঐ যোগসিদ্ধি বা কায়াসিদ্ধি। আজও বাঙালিরা অনেক দুরন্ত দুশ্চিকিৎস্য-অনির্ণীত-অনির্দেশ্য রোগমুক্তির জন্যে ঐসব মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুক, পানিপড়া, তাবিজ-কবজ, পূজা-সিন্নি, মানত-ধর্ণা, বলি-সদ্‌কা, কাঙাল-অনাথ-এতিম-মিস্‌কিন ভোজনেই ভরসা, —এ বাঙালির অস্থি-মজ্জার মর্মমূলে চিরকালের স্থান করে নিয়েছে।

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি চিরকাল বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি শাসকদের দ্বারা শাসিত-চালিত। বারংবার শাসক পরিবর্তনের হাত ধরে বাঙালি জাতির ধর্মীয় চেতনায় রদবদল ঘটেছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানান বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-রীতি, আচার-আচারণ, মূলতঃ সাঙ্গীকরণ, সমন্বয়ধর্মীচেতনা সক্রিয় হয়েছে বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে। এই সমন্বয়ধর্মীমানসিকতা বাংলার ধর্মীয়জীবনে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। তাই আজও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি লক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদ আধুনিক রাজনীতির হাতিয়ার, নিঃসন্দেহে নগরে উঁচু শ্রেণির বাস। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার অত্যাধুনিক তো বটেই, ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সেকালের গ্রামীণ জীবনে খুব একটা স্থান করে নিতে পেরেছিল বলে জানা যায় না, আজও বাঙালি গ্রামীণ জীবনে তা লক্ষণীয়। বৈষয়িক কারণে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতিতে আঘাত সময়ে সময়ে লক্ষ করা গেলেও তা যে কখনো সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করতে পারেনি, তা স্বীকার

করতেই হবে। বিশেষ করে গ্রামীণজীবনে যথার্থই ধর্মীয় চিন্তায়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ও জীবনযাত্রায়, মোটকথায় ধর্মীয়-সামাজিক-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় বাঙালির মধ্যে খুব কমই প্রভেদ লক্ষ করা যায়। গ্রাম-বাংলায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে অদ্যবধি মুসলমান বাঙালিরা তাদের অমুসলমান প্রতিবেশীর অনেক কাছাকাছি এবং উপমহাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে তেমন একটা মিল নেই বললেই চলে।

বাঙালি সমাজ চিরকাল নানাধর্মে ও বর্ণে বিভক্ত। ধর্মের দিক থেকে এই বিভাগ ছিল মূলত চারটি ; যথা-হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। তবে এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ই ছিল বাঙালি সমাজের নিয়ন্ত্রক। সংখ্যাল্পতা ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে শেষোক্ত দুটি সম্প্রদায়ের গুরুত্ব সমাজে আজও তেমন নেই। বর্ণের দিক থেকে বাঙালিহিন্দু সমাজ নানা শ্রেণি-উপশ্রেণিতে বিভক্ত। হিন্দু বাঙালির এই বর্ণবাদের ঐতিহ্য সুদীর্ঘ কালের। কারণ বর্ণবিন্যাস হচ্ছে ভারতীয় সমাজবিন্যাসের ভিত্তি।[১১] বাংলায় যখন আর্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন আর্য সমাজ ছিল এ রূপ বহুবর্ণ বা জাতিবিভক্ত।[১২] আর্য সমাজের আদর্শেই হিন্দু বাঙালির ধর্মজীবন গড়ে ওঠে। যে কারণে আর্যদের কাছে এদেশীয় অনার্য জাতির সামান্য কিছু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করলেও আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই শূদ্র জাতিভুক্ত হয়। এ থেকে ধারণা করা হয়, প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ বিদ্যমান ছিল।[১৩] তবে বাংলাদেশে কখনো ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে গঠিত ও স্বীকৃত হয়েছিল কিনা এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।[১৪] মুসলিমবাঙালির ক্ষেত্রেও হিন্দুবাঙালির চতুর্বর্ণের ন্যায় সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান এবং দেশজ এই পঞ্চ গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, আজও আছে।[১৫] প্রথমোক্ত চারটি শ্রেণি 'বহিরাগত বঙ্গে তাঁদের আগমন বিভিন্ন কর্মসূত্রে : শাসক, সৈনিক ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে। কৌলীন্যচেতনা মুসলিম সমাজে অদ্যবধি অব্যাহত।

বাঙালি সমাজে কৌলীন্যচেতনা ক্ষেত্র-পাত্র বিশেষে প্রগাঢ় রূপ ধারণ করলেও নানা বর্ণের মাঝেও মিলনের সমন্বয়ে এক আত্মিক প্রচেষ্টা সর্বকালে লক্ষণীয়। যদিও বাঙালিহিন্দু ও বাঙালিমুসলমানের ধর্মীয়জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি একথা সত্য। তবে সকল ধর্মের মূল বিষয় যে এক ও অভিন্ন, এই সূক্ষ্মপ্রেরণা অনেকের হৃদয়েই জাগ্রত হয়েছিল; যার ফলে পরস্পরের ধর্মের প্রতি পরস্পরে শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। আর এর ফলশ্রুতি স্বরূপ

উভয়ধর্মের বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দুটি ধর্মাবলম্বী বাঙালিরা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মধ্যে সহ-অবস্থান বিরাজমান, যা চিরন্তন, শাশ্বত।

বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা একটু কঠিন, কারণ, সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয় – উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। অষ্ট্রিক ও মোঙ্গলদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি ছিল, সেটাই চিরকাল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা। তার প্রভাব থেকে বাঙালি কখনো মুক্ত হতে পারবে না। সে পরিচয় মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেও মুছে দেওয়া যাবে না। বাঙালির চেতনায়, স্মৃতিতে, স্নায়ুতে, রক্তধারায় তা মিশে আছে , যুগ যুগ ধরে চলেছে। সংখ্যা, যোগ, তন্ত্র, দেহতত্ত্ব- এগুলো হচ্ছে বাংলার আদি মোঙ্গলদের দান, আর নারী দেবতা, পশু-পাখি ও বৃক্ষদেবতা, জন্মান্তর হচ্ছে অষ্ট্রিকদের দান। এগুলোর মধ্যে মন-মানসিকতা ও মননের যে বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত আছে, তার প্রভাব থেকে বাঙালিহিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কখনও মুক্ত ছিল না, আজ ও মুক্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। এ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বাঙালির চরিত্রে ও জীবনে অন্তর্নিহিত। বাঙালি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ের রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু কখনও সে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব ছাড়তে পারেনি। ফলে বহিরাগত প্রতিটি মতবাদ এখানে এসে নতুন রূপ লাভ করেছে। বাঙালিয়ানায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ধর্ম এখানে মহাযানী দেহতত্ত্বে ও দেব-ভাবনায় অবসিত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম গীতি-স্মৃতি-সংহিতা বিরুদ্ধ লৌকিক দেবপূজায় রূপায়িত, ইসলাম ও লোকায়ত রূপ পেয়ে পরিবর্তিত। এদেশের সমন্বয়ধর্মী আবহাওয়ায় লালিত-পালিত সব শাস্ত্রই বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবন-জীবিকার অরি-মিত্র-দেবদেবী-মনসা, শীলতা, ওলাদেবী, সত্যনারায়ণ- হিন্দুর জীবন করছে নিয়ন্ত্রিত। তেমনি কেরামত আলীর ও ওহাবী-ফারায়েজী মতবাদের প্রভাবও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্ম ছিল তাবিজে-কবজে-পীরে-দরগায় এবং সত্যপীর- ওলাবিবি-খাজাখিজির সেবায় সীমিত।

বাঙালির জীবনে যে সকল বিষয় বিশেষভাবে প্রণোদনা যুগিয়ে চলেছে তার মনঃসমীক্ষার মধ্যদিয়ে বঙ্গ-সংস্কৃতির আদি-চিরন্তন পরিচয় পূর্ণাংশে পাওয়া না গেলেও আংশিকভাবে যে পাওয়া যাবে, তা অস্বীকার করা যায় না। এবং সে প্রণোদনা বঙ্গ-সংস্কৃতির মৌলভূমিতে বিশেষ রেখা অঙ্কন করে চলেছে চন্দ্রলেখার যাদু বিস্তারের মতো করে। মূলত বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাথমিক যে

সোপান, এটি গড়ে দিয়ে যায় বহুকাল আগে, ভারতবর্ষের 'অষ্ট্রিক' ভাষাভাষির মানুষ: এ-হলো ইতিহাসের কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা তারপর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পদার্পণ ঘটেছে এই বাংলায়, যুগে যুগে তাদের সংস্কৃতিও বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে বক্ষলগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক যে চেতনা অর্থাৎ, কিনা তার মূল যে ধারা এবং বৈশিষ্ট্য তা প্রায় একই থেকেছে। চলছে মানুষ, সেই সঙ্গে চলেছে তার সংস্কৃতি। চলমান এ ধারার মধ্যথেকে বঙ্গ-সংস্কৃতিকে আলাদা ভাবে চেনা যায়, বঙ্গজনদের রচে যাওয়া সংস্কৃতির পরতে পরতে যে যে বিষয় বিশেষ ধারাক্রম রচনা করে চলেছে একাল অবধি, যা চিরন্তন-শাশ্বত।

এ প্রসঙ্গে যে কথা বলা যায়, তা হলো মানুষ তার জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কিছুর সঙ্গে সন্ধি রচনা করে চলেছে। সেই সন্ধি যে যুগসন্ধিক্ষণে সম্পাদিত হয়েছিল সেকাল বহু আগে গত হলেও মানব-মন তার সেই যুগসন্ধিক্ষণের সন্ধি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় না এ কারণে যে, সমাজের অর্ন্তগত অধিকাংশ মানুষ একদিকে যেমন- পুরাতনের প্রতি বিশ্বাসী, অপরদিকে নতুনের পিয়াসী। প্রপিতামহ-যুগের আসন-বসন ছিন্ন করতে ইচ্ছে জাগে না বলে পুরাতন এবং নতুন অঙ্গাঙ্গি হয়ে তা বহতা রয়েছে কালনিরবধি। স্তরীভূত অসংখ্য বিশ্বাস ও ভাবধারা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে সমাজে এবং এর মধ্যদিয়েই সমাজের সকল চঞ্চলতা ধীরে ধীরে একটি সুস্থির দর্শনে রূপ নিয়েছে, বহুবর্ণের এবং গোত্রের মিলন-মিশ্রণের মধ্যদিয়ে বাঙালির এক চিরন্তন-শাশ্বত সাংস্কৃতিক অবয়ব গড়ে উঠেছে। সদর্থে সেকাল ও একালে বাঙালির সামাজিক-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক চিরন্তন ও শাশ্বতরূপের পরিচয় মেলে।

।। তথ্যসূত্র ।।

১. ডঃ আহমদ শরীফ : বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব, ১ম খণ্ড , পুর্ণমুদ্রণ : জুলাই ২০০৪, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ: ১ ।

২. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ: ৭২ ।

৩.ক. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সং, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স , কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ১ ।

খ. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ: ১ ।

গ. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ: ১ ।
৪. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃ: ৭২ ।
৫. ক. ঐ, পৃ: ৭২ ।
খ. ডঃ এনামুক হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ: ১ ।
৬. আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), পৃ: ৩-৪ ।
৭. Abul fazl Allami : The Air-i- Akbari, vol- II translated by colonel H.S jarret , second edition, corrected and further annoted by sir jadu nath sarkas, munshiram mono harlal publishers prirate L+d new delhi, 1978, p- 132 .
৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ: ২ ।
৯. Abul fazl Allami : The Ain-I- Akbari, vol- II p- 129
১০. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ১ ।
১১. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃ: ১২২
১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ: ১৮৯ ।
১৩. ঐ, পৃ: ১৮৮।
১৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃ: ১৩৪ ।
১৫. মুহম্মদ আবদুল জলিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, বাংলা একাডেমী, ১ম পূর্ণ মুদ্রণ জানুয়ারী, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ: ৩৬।

....

মধ্যযুগের বাঙালি : আহার বিহার বৈচিত্র্যে; বিশিষ্টতায়

সোনা মণ্ডল

বাঙালি একটি সুপ্রাচীন জাতি। স্বভাবতই এই জাতির উৎপত্তির ইতিহাসও প্রাচীন। প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নরতত্ত্বের দিক থেকে , বিচার করলে বাঙালি একটি মিশ্রজাতি। কারণ দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাসিকা, আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠী; দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্য-উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট মিশর-এশীয় এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট অ্যাল্পাইন-দীনারীয় জনগোষ্ঠী– এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাঙালি জনগোষ্ঠী। এছাড়া নিগ্রোবটু ও মোঙ্গোলীয় রক্তেরও কিছুটা প্রভাব আছে বাঙালির মধ্যে, এমনকি উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের আদি নর্ডিক জনগোষ্ঠীর প্রভাবও অনস্বীকার্য। তবে অ্যাল্পাইন-দীনারীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব মুক্ত বাঙালিরা ছিল অনার্য। এদের প্রভাবেই বাঙালি জীবনে যুক্ত হল আর্য প্রভাব। ফলে আদি অস্ট্রেলীয় বাঙালি মন-মানসিকতার সঙ্গে এই মিশ্র নর্ডিক ও অ্যাল্পাইন-দীনারীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠল সুস্পষ্ট বাঙালি জাতির চরিত্র, যা এক দিনে সম্ভব হয়নি।

হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে এই বিবর্তন-পরিবর্তন। শুধু নৃতাত্ত্বিক নয়, বাঙালির বসবাসের সীমার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রাচীন বাংলার সীমা ছিল মোটামুটি উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম ও ভোটান (ভূটান) রাজ্য; উত্তর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর – পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ (দ্বারভাঙা), পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া(জয়ন্তিয়া)-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণিসহ দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম- ধলভূম –কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যযুক্ত মালভূমি আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সুবিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডই ছিল প্রাচীন বাঙালির ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।

কিন্তু আজ বাংলা এবং বাঙালির সেই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ও বাসভূমির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। তবুও একটি জাতি-গোষ্ঠী

যতই বিবর্তনের পথে হাঁটুক না কেন, মূলগত কিছু বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, তা একান্তভাবেই তার নিজের। যে স্বাতন্ত্র্য তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনতে শেখায়, তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। আর জাতির এই বিশিষ্টতা প্রকাশের ক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত – তার ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ-পরিচয়, ভূমিবিন্যাস, জাতীয় ঐতিহ্য, বর্ণবিন্যাস, শ্রেণিবিন্যাস, গ্রাম-নগর-বন্দর, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা, আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক দিকগুলি, যা দান করে তার আত্মপরিচয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বাঙালি এক বিশিষ্ট জাতি। আর পাঁচটা জাতির মতো বাঙালিদেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে একটা গোটা জাতির আত্মপরিচয়ের প্রেক্ষাপট বহুধা বিস্তৃত। তাই কোনো বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য বা জীবন -ঘটনা নয়, জীবনের সামগ্রিকতার মধ্যেই প্রকাশিত হয় তার স্বরূপ। শুধু সমকালীন জাতিসত্তা নয়, জাতির সুদীর্ঘকালীন পথ চলার কাহিনিই সম্পূর্ণ করে বলতে পারে তার সামগ্রিকতাকে। আর সাহিত্যই হল সেই সুস্পষ্ট দর্পণ যাতে প্রতিফলিত হয় জাতির আপন মুখ, আপন স্বরূপ তথা সামগ্রিকতা। বাঙালি জাতির বাংলা সাহিত্যেও তার অন্যথা হয়নি। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস ধারণ করে রেখেছে তার সামগ্রিক জীবনকে। বাঙালির ইতিহাস স্বরূপ এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মধ্যযুগ হল এক বিস্তৃত পর্যায়, যেখানে প্রতিকায়িত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যা । আর এই দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হল আহার-বিহার। মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাংলা সাহিত্যে বাঙালির আহার্য-পানীয়, আমোদ-প্রমোদের যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়, তার মধ্যদিয়ে বাঙালির রুচি ও রসনায় সূক্ষ্মবোধ, রন্ধনকলার নৈপুণ্য বিদ্যমান। যার মধ্যদিয়ে অখণ্ড বাঙালিকে চেনা সম্ভব না হলেও আংশিক পরিচয়ের প্রয়াস পাওয়া যায়।

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলেছেন – ' ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল'। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাছ-ভাত প্রিয় খাবার। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এদেশে ধানের আমদানি হয়েছিল। আর কখন থেকে মাছ খাওয়া চালু হয়, তার কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে খাল, বিল, নদী, ,নালার দেশ বাংলাদেশে মাছ আগাগোড়াই খাওয়া হতো। সেজন্যই বাঙালির সঙ্গে ভাত ও মাছ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মাছের প্রতি এ অঞ্চলের লোকেদের ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় ঐতিহাসিক নিদর্শন সূত্রে। প্রাচীন বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে মাছের ছবি সহ একটি ফলক পাওয়া গেছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে মাছের ছবি সহ পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। এমনকি কোটা ও ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার ছবিও পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের লোকেরা বাঙালির এই মৎস্যপ্রীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। এমনকি তারা অনেকেই এখনও মাছ খায় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে বাঙালিরা কি খাবার দাবার খেতেন তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে মাছের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা বিস্তারিত। যেমন – আড়, ইচা, ইলিশ, উলকা, এলেঙ্গা, কাতলা, কালবসু, কুড়িশা, কৈ, খয়রা, খরশোলা, খলিশা, গড়ুই, গাগর, গাঙ্গদাঁড়া, চাঁদা, চিংড়ি, চিতল, চেঙ্গ, চেলা, টেংরা, তপসে, তেচক্ষু, পাঁকাল, পাঙ্গাস, পাবদা, পার্শে, পুঁটি, ফলুই, বাঁশপাতা, বোয়াল, বাটা, বান, বেলে, ভোলা, মাগুর, মৃগাল, মৌরলা, রিঠা, রুই, লাটা, শংকর, শিঙি, শোল ইত্যাদি। সেকালের সাহিত্য থেকে কেবল বিচিত্র ধরনের মাছের নামই পাওয়া যায় না, খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য কত বিচিত্রভাবে মাছ রান্না করা হত, তার পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে মাছ রান্নার রকমারি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। খুল্লনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর যে সব মাছের রান্না হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন কবি –

কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিআ ঝোল।

....

কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ
মুঠ্যে নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস।
বদরি শকুল মীন রসাল মুসরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল – শফরী।

অর্থাৎ সরষের তেলে চিতল মাছের কোল ভাজা, কুমড়া বড়ি আর আলু সহযোগে রুই মাছের ঝোল, আদারস দিয়ে সরষে তেলে কই মাছ ভাজা, কাতলা মাছের ঝোল, পুঁটি মাছ ভাজা ইত্যাদি।

বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' মাছের বিভিন্ন ধরনের রান্নার বিবরণ পাওয়া যায় –

মৎস মাংস কাটিয়া করিল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস দিয়া রান্ধে কোলটের আগ।।
খান খান করিয়া কাটিয়া লইল চই।
সাজ কটু তৈলে রান্ধে রুহিত মৎসের খই।।
চেঙ্গ মৎস দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বৌল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পিপিলিয়া শৌল।।
কৈ মৎস দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।
জিরা মরিচে রান্ধে চিতলের কোল।।
উপল মৎস আনিয়া তাহার কাঁটা করে দূর।
গোল মরিচে রান্ধে উপলের পূর।।
আনিয়া ইলিশ মৎস করিল ফালা ফালা।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন দক্ষিণ সাগর কলা।।
শৌল মৎস কাটিয়া করিল খান খান।
তাহা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আলু আর মান।।
মাগুর মৎস আনিয়া কাটিয়া ফেলে বুড়ি
আদা দিয়া রান্ধে ব্যঞ্জন আদা – মাগুরী।।

অর্থাৎ রুই মাছ দিয়ে কলতার আগা, চই ও সরষে তেল দিয়ে রুই মাছের খই, চেঙ্গমাছ দিয়ে মিষ্টি আমের বোল, কলার মূল দিয়ে শোল মাছের পিপিলিয়া, কই মাছ দিয়ে মরিচের ঝোল ইত্যাদি।

মাংস খাওয়া মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সমাজের নিচের তলার মানুষের মধ্যে শামুক, মোরগ, হাঁস, শুয়োর, সজারু, গধিকা, শশক, ও নানা রকমের পাখির মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল, মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালকেতুর অন্নপ্রাশন সম্পর্কে কবি বলেছেন –

চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।'

কিংবা অন্যত্র কবি বলেছেন –

লোন দিবে কিছু বাড়া / নেউল গধিকা পোড়া।
কিছু ভাজ বালি কড়া / সসারু করহ শিক পোড়া

এছাড়া মাংসের পসরা নিয়ে হাটে যাওয়া ও পশুশিকারের প্রমাণ পাওয়া যায় 'চণ্ডীমঙ্গলে'। শবর, পুলিন্দ, ব্যাধ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি নিচু সম্প্রদায়ের মানুষেরা এর সাথে যুক্ত ছিল। যেমন –

প্রভাতে সঘন তৃরা   বধে খড়্গা মৃগ বরা
প্রতিদিন করএ মৃগয়া।

কিংবা,

নিদয়া বসিল খাটে   মাংস লইয়া যায় হাটে
অনুদিন বেচয়া ফুল্লরা ।
সাষুড়ি যেমন ভনে   তেন মত বেচে কিনে
শিয়রে বাঁধে মাংসের পসরা।

এছাড়া ভদ্র সমাজে হরিণ, ছাগল, মেষ, এবং কচ্ছপ খাওয়ার প্রচলন ছিল। মুসলমানরা খেত মোরগের মাংস, এমনকি মোরগ জবাই করে মোল্লা পয়সা পেত। মুসলমানদের গরু খাওয়ার কথাও জানা যায়। তবে নিরবধি কাল ধরে হিন্দুরা গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে , তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের গরু বধ ও গরুর মাংস খাওয়াকে যে তারা সুনজরে দেখেননি, তা সহজেই স্পষ্ট কবি কঙ্কণের কথায়। মুকুন্দ চক্রবর্তী বলেছেন যে গরুর মাংস বিক্রি করে যে কসাইরা তাদের নরকেও জায়গা হয় না, স্বর্গ তো দূর অস্ত। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' ছাগের মাংস রান্নার চিত্র বিদ্যমান –

মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল।।
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম।।

মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্যতালিকায় শুধু মাছ বা মাংস নয় বিভিন্ন প্রকার তরি-তরকারির উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। যেমন – বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরোল, কচু (কন্দ), আলু ইত্যাদি। নানা প্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায় যে, সার্বভৌমের বাড়িতে মহাপ্রভুর জন্য দশ রকমের শাক রান্না হয়েছিল। শুধু তাই নয় , চৈতন্যদেবের মাও মহাপ্রভুর জন্য কুড়ি রকমের শাক রান্না করেছিলেন। সেগুলি হল – অচ্যুতা, কলমী, নটে , নালিতা, নিম, পাট, পালং, পুঁই, বেতাগ, বেনাতি, লাউয়ের ডগা, হেলেঞ্চা, ইত্যাদি। 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবি মুকুন্দ শাকের যে বিবরণ দিয়েছেন তা হল –

নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা
তিত পলতার ডগা তুলিল পলতা।
সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা
হিনচা কলমী শাক তোলে ডানি কলা।

মাছ, মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বিধবাসহ কারো কারো বাছ-বিচার থাকায় সেকালের গৃহিণীরা মাছের চেয়েও বেশি বৈচিত্র্য এনেছিলেন নিরামিষ রান্নায়। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একদিন শিব গণেশের মা পার্বতীকে রান্নার ফরমাস করেন। শিবের ফরমাস ছিল –

আজি গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত
নিমে শিমে বাগ্যনে রান্ধিআ দিবে তিত।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর
কুমড়া বাগ্যন দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।
নটিআ কাঁটাল বিচি সারি গোটা দশ
ফুলবড়ি দিহ তায় আর আদা রস।
কড়াই করিয়া রান্ধ সরিসার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিবে দৃঢ় পাক।
রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবা জল
খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।
ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খণ্ডেতে ফুলবড়ি
চোঙা চোঙা করিয়া ভাজ্যা পেল বড়ি।
রান্ধিবে ছোলার ডালি দিবে তথি খণ্ড
আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড।
মানের বেসারি দিআ তায় কুমড়ার বড়ি
ভাজিয়া কাঁটাল বিচি দিবে দুই কুড়ি।
ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ
ঝটি স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব।
গোটা কাসুন্দি তায় জামিরের রস
এবেলা আমার মত রান্ধ বেঞ্জন দশ।

এছাড়া কালকেতুর মা গর্ভাবস্থায় স্বাদভক্ষণ উপলক্ষে যে সব খাবার খেতে চেয়েছিলেন তা হল – পাকা চালতের ঝোল, হেলেঞ্চা, কলমী, গিমা, পলতা

শাক, পুঁইডগা, মুখী কচু, আর ফুলবড়ি দিয়ে মরিচের ঝাল, শিম, বেগুন আর ডুমুরের ফল দিয়ে রান্না।

মিষ্টি বাঙালির চিরদিনের পছন্দের খাবার। প্রাচীন কাল থেকে পায়েস, পিঠে খাওয়ার প্রচলনও ছিল। তারপর যতদিন গেছে তারা মিষ্টান্ন রান্নায় ততই বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবারের বিস্তারিত খবর জানতে পারি। যেমন – অমৃতপুটিকা, আমের খণ্ড, কাঞ্জিবড়া, খিরিসা, ক্ষীরখণ্ড, ক্ষীরপুলি, ঘোল, চন্দ্রপুলি, চন্দ্রকান্তি, ছানা, ছানাবড়া, দই, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ তুম্বি, দুগ্ধ কলকি, নারিকেল পুরি, তালবড়া, পাতপিঠা, পানা, পায়স, পিঠা, পেঁড়া, মনোহরা, রসালা, ইত্যাদি। সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথকে দিয়ে চৈতন্যদেবের মধ্যাহ্নভোজনের নিমিত্ত যে প্রসাদ প্রেরণ করেছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন –

> মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
> অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।।
> অমৃত মণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূরকুলি।
> রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী।।
> হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী।
> ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি।।"

এছাড়া বাঙালির প্রিয় খাবার রসগোল্লা ও সন্দেশের কথা জানা যায়। এমনকি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নানা রকমের কাসুন্দি ও আচারের উল্লেখ রয়েছে। কাসুন্দিরও নানান প্রকারভেদ ছিল। যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা আদার কাসুন্দি, আমের কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি প্রভৃতির উল্লেখ পাই। বিভিন্ন রকমের আচার যেমন –

> কোলিশুণ্ঠি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর।
> কত নাম লব আর শত প্রকার আচার।। – এর কথাও আমরা

জানতে পারি।

মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের তালিকায় ছিল ভিন্ন প্রকারের শুকনো খাবার। যেমন – বিভিন্ন রকমের ধান থেকে প্রস্তুত চিড়া, তণ্ডুল ভাজা, কর্পূর দিয়ে প্রস্তুত নাড়ু, খই, উখরা, ফুটকলাই, হুড়ুম, মুড়কি ইত্যাদি। নাড়ুর আবার বিভিন্ন ভাগ – চালের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু, নারকোলের নাড়ু, তিলের নাড়ু,

চিড়ার নাড়ু, শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু ইত্যাদি। এসবের বিস্তৃত বিবরণ পাই আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' –

নারিকেল খণ্ড নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার
অমৃত –কর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালি কাচটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি।।
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত সুক্তা চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।।
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।"

এমনকি খেজুরের রস খাওয়া এবং খেজুর রস থেকে গুড় ও পাটালি তৈরি করার রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য।

বিভিন্ন ধরনের ফলের কথাও মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন – আঙুর, নারঙ্গ, আম, আমলকি, কমলা, কলা, কাঁঠাল, কুল, কেসুর, খেজুর, ছোলঙ্গ, ছোহরা, জাম, জামির, ডালিম, তাল, পানিফল, নারকেল, বাদাম, বীজপুর, এবং বেল। 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবি মুকুন্দ ধনপতি সওদাগর কর্তৃক সিংহলরাজকে ভেট প্রদান উপলক্ষে বলেছেন –

কলা নিল মর্তমান মজা গুয়া পাকাপান
আম্র পনস নারিকেল ।
শালি তণ্ডুল গাছ বান্ধি নানা ফল খাসা দধি
চিনী ফেনী নাড়ু গঙ্গাজল।
বারমাস্যা পাকাতাল করুণা কমলা ভাল
পিণ্ড খাজুর বড়ই রসাল।"

মধ্যযুগীয় সমাজে নানারকম মশলা ব্যবহার হত, কবিরা সাহিত্যকর্মে তার উল্লেখ করেছেন। যেমন – আদা, এলাচি, কর্পূর, কাবাব চিনি, জিরা, ধনে,

গোলমরিচ, মৌরী, লবঙ্গ ইত্যাদি। বিজয়গুপ্ত "মনসামঙ্গলে' বলেছেন – 'গোলমরিচে রান্ধে উপলের পুর', কিংবা 'জিরা মরিচে রান্ধে চিতলের কোল'। কবি মুকুন্দ বলেছেন – 'মুঠো নিঙ্গাড়িআ তাহে দিল আদার রস' কিংবা ' রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ'।

এমনকি বিভিন্ন প্রকার অম্বল রান্নাতেও মধ্যযুগের বাঙালি ছিল সুপটু। অম্বল রান্নায় আম, আমচুর, (আমসী), আমড়া, টককুল ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। এছাড়াও আমলকি, করমচা, গোঁড়ালেবু, টাবা (পাতিলেবু), জামির, তেঁতুল টক ফল হিসেবে ব্যবহৃত হত। এমনকি পোর্তুগীজদের আনা লঙ্কা (ঝাল), মরিচ – এর ব্যবহার বাঙালির রান্নায় ভিন্ন মাত্রা এনেছিল একথা বলা বাহুল্য। খাওয়ার শেষে মুখশুদ্ধি হিসেবে কর্পূর , পান, সুপারি, মৌরী খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট যে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের খাবারে বৈচিত্র্য ছিল প্রচুর। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ গরীবদের খাবার ছিল পান্তা ভাত, নুন আর শাক দিয়ে ভাত, আমানি ইত্যাদি। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুর খাবারের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তা থেকে নিম্নবিত্তের খাদ্যতালিকার নমুনা পাওয়া যায়। কালকেতুর খাবারের তালিকায় ছিল খুদের জাউ, লাউ দিয়ে রান্না করা মুসুর ডাল, ওল, কচু, করঞ্জা, আমড়া, কখনও কখনও দই, ঘোল ইত্যাদি।

শুধু আহার তথা খাদ্যাভ্যাসেই নয়, বিহার-বৈচিত্র্যেও মধ্যযুগের বাঙালি ছিল বিশিষ্ট। বিহার কথার অর্থ হল প্রমোদ, ভ্রমণ, ক্রীড়া, আমোদ ইত্যাদি। সেকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির আমোদ-প্রমোদের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য, গীত, নাটক, অভিনয়, শিকার, কুস্তী, মল্লযুদ্ধ, নৌযাত্রা, ইত্যাদি। নবাব, রাজা, ভুস্বামীদের সভায় পেশাদারী নটনটী দিয়ে অভিনয় তো হতই – এমনকি আসরে সাধারণ মানুষের রসতৃষ্ণা মেটাতো রয়ানি, ভাসান, অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি গান। এজন্যই নৃত্য – গীত পটিয়সী সুন্দরী রমণী সমাজের একটি বিশিষ্ট স্থানজুড়ে অবস্থান করত। বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ ছিল পাশা খেলা, পায়রা ওড়ানো, মেয়েদের কড়ি খেলা, ডাংগুলি খেলা ইত্যাদি। এছাড়া নৌকা বাইচ ও ষাঁড়ের লড়াইয়ের কথাও জানা যায়। যন্ত্রসঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে যে বাঙালির আসক্তি ছিল তার প্রমাণও মিলেছে। ভ্রমণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত হাতি, ঘোড়া, গোযান, উট, পালকি, ইত্যাদি। তবে নদীমাতৃক বাংলাদেশে রণে, বাণিজ্যে, বিবাহে, তীর্থে এবং সাধারণ যাতায়াতে নৌকাই

ছিল অন্যতম মাধ্যম। কখনও কখনও কলার মান্দাস বা ভেলার ব্যবহার হত। বজরা, কোসা, পানসী, ডিঙ্গি, সাম্পান, প্রভৃতি বিশ-পঁচিশ ধরনের নৌকা বাংলার নদী-নালা, খাল-বিল-সমুদ্রে বিচরণ করত। এমনকি নৌশিল্পে বাঙালি সূত্রধরেরা অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিল। 'পদ্মাবতী' কাব্যের 'রোসাঙ্গ বর্ণনা' অংশে বিচিত্র ধরনের নৌকার যে বিবরণ রয়েছে তা নিম্নরূপ –

নানাবর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে
গালিয়া ও ঘাসি ডিঙ্গা রঙ্গ।
সলুপা নানান ভাঁতি মাছুয়া গোরাপ পাঁতি
জালিয়া ভাউরি নানা রঙ্গ।।
কোসা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধরে হাল
সহস্রে সহস্রে নৌকা ঝারা।

উপরোক্ত অংশে আলাওল নৌকার যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আরাকানের তথা সেকালের বাংলাদেশের বাঙালির নৌসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশি পর্যটকগণ এই সমস্ত নৌকা দেখে এগুলিকে আরাকানের ভাসমান নগরী বলে বর্ণনা করেছেন।

মধ্যযুগের বাঙালি ছিল বাণিজ্য-বিহারে যথেষ্ট পটু। প্রাচীন বঙ্গদেশের আরাকান রাজসভায় সমাগম হত নানা দেশ থেকে আগত বহু জাতির মানুষের। রাজসভায় আগত জনমণ্ডলী সম্পর্কে আলাওল যাদের পরিচয় দিয়েছেন তারা হল আরব, মিশরী, তুর্কী, রুমী, খোরসানী, উজবেকি, লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধি, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, কামরূপী, মোগল, পাঠান, রাজপুত, বর্মী, সামদেশী, ত্রিপুরী, কুকী, ইত্যাদি। ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিল আর্মানী, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ ইত্যাদি। এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল বাণিজ্যের সাথে, অনেকে আবার বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই পাড়ি দিয়েছিল বঙ্গদেশে। তারা বিভিন্ন রকমের পণ্যসামগ্রী যেমন বঙ্গদেশে নিয়ে আসত, তেমনি অন্যত্র নিয়েও যেত। মধ্যযুগে আরাকান হয়ে উঠেছিল নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। বাঙালির বহু পরিচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগরও তাঁর সুসজ্জিত বাণিজ্যতরী মধুকর-ডিঙ্গা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন দূরদেশে –

একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা চালাইল সত্বর।
ডিঙ্গা চালান করে সাধু গঙ্গাসাগর।।
গঙ্গার পূর্ব্বকূলে আছে শিবের আগার।

তথায় চালাইল ডিঙ্গা চান্দ সদাগর।।

এছাড়া আদি মধ্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গোপ রমণীরা মথুরা নগরে যাত্রা করেছে দধি-দুগ্ধের পসরা সাজিয়ে, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় জীবিকা নির্বাহের উপায় স্বরূপ বাণিজ্য বৃত্তিকে স্মরণ করায়। এমনকি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কথা –

প্রভাতে সঘন তৃরা বসে খড়্গা মৃগ বরা
প্রতিদিন করএ মৃগয়া
পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্দ সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া।
নিদয়া বসিল খাটে মাংস লইয়া জায় হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
সাযুড়ি যেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা।
মাংস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালু বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি।

মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রার এক অন্যতম অঙ্গ ছিল যুদ্ধবিহার। রাজা যুদ্ধবিহারে বের হতেন সেনাপতি, পাত্রমিত্র, পদাতিক বাহিনী সহযোগে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের 'আদ্যঢেকুর' পালায় রাজা কর্ণসেন দক্ষিণময়নার ইছাই ঘোষের উপর যে আক্রমণ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ –

সাজ সাজ শবদে সঘনে পড়ে সাড়া।
আশি হাজার শিঙ্গা পড়ে নৈ হাজার কাড়া।।
দামামা দগড় বাজে, বাজে রণ তূণ।
হাতি পৃষ্ঠে দামামা নিশান দূর দূর।।
শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান একাকার।
রাউত মাহুত সাজে বলে মার মার।।
গগন উপরে গোলা পড়ে দাম দুম।
ছমাসের মড়ার ভাঙিল কালঘুম।।
হাতির নিনাদ শুনি ঘোড়ার হিসনি।
চলিতে চরণে চলে চপল তরণি।।

বাঙালিরা যুদ্ধবিহার গমনকালে হস্তী, অশ্ব, উট, খচ্চর, গাধা ইত্যাদি ব্যবহার করত। তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পদ্মাবতী' কাব্যের 'গোরা-বাদল যুদ্ধ' খণ্ডে।

সেখানে দিল্লীর সকল সৈন্য ওমরাহ্ ও সুলতানসহ চিতোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে এবং গোরার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে –

হয় হস্তী উষ্ট্র গাধা বহুল খচ্চর।
সজ্জা করি আইল্লেন্ত দিল্লীর ঈশ্বর।।

বাঙালি সমাজে বিবাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠান।এ প্রসঙ্গে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের 'রঞ্জাবিভা পালা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদাতিক বাহিনী নিয়ে রাজা কর্ণসেনের বিবাহযাত্রা সম্পর্কে কবি বলেছেন –

দলে দলে বিবাহ করিতে রাজা যান।
চারিদিগে হৈল বারভূঞার পয়ান।।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ পালকি উপর।
দড়বড়ি চলে সভে সিমুলের গড়।।

শুধু তাই নয় , নানাধরনের বৈবাহিক আচার-অনুষ্ঠান, বাদ্যযন্ত্রের কলরোল, পুরোহিত ও কুটুম্বের সমাগমে বিবাহবাসর হয়ে উঠত জমজমাট –

শুনিঞা মহাশয় হইলা রসময়
বান্ধবা করে আমন্ত্রণ।
কুটুম্ব দ্বিজগণ আইলা নিকেতন
আজি সে সকল জীবন।।
মৃদঙ্গ করতাল ফুকরে করনাল
দগড় সানি জয়ঢোল।
খমক বীণা বাঁশি বাজয়ে শঙ্খ কাঁসি
চৌদিগে শুনি জয়রোল।।
তুলিল দিব্য চান্দা মালিক হেম বান্ধা
বসিলা যত দ্বিজগণ।
নৃপতি অভিলাষ কন্যার অধিবাস
আসিয়া কৈল আরম্ভন।।
কনক শুভবাস তিমির করে নাশ
বরণ জিনি কাঁচা সোনা।
মোতিম গঙ্গা আদি বরণে যথাবিধি
অঙ্গেতে দিল গোরচনা।।
আনিল গন্ধ শিঁলা স্বস্তিক পুষ্পমালা
কঙ্কণ শঙ্খ ফলদধি।

যাবক গোরোচনা ধান্য রূপ সোনা
হরিদ্রা দিল যথাবিধি।।

এছাড়াও এই কাব্যের 'কলিঙ্গা বিভাপালা', 'কানাড়া বিভাপালা', এবং 'পদ্মাবতী' কাব্যের 'রত্নসেন-পদ্মাবতী' বিবাহখণ্ডে বিবাহের কালে মধুচন্দ্রিমা, বরপণ-কন্যাপণ, পুররমণীদের নৃত্য-গীত-নাট্যে বিবাহ বাসরে হুলুস্থুল করার দৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে পাল্কির ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলে রাজা মহামদ কানাড়াকে বিবাহ কালে পাল্কি নিয়ে সদলবলে যাত্রা করেছিলেন –

দলবলে বিবাহ করিতে রাজা যান
....
কেহ অশ্বে কেহগজে পালকি উপর।
দড়বড়ি চলে সভে সিমুলের গড়।।

তবে যানবাহন হিসেবেও পালকির ব্যবহার ছিল। ধর্মমঙ্গলে মহাসমারোহে পালকিবিহারের প্রসঙ্গ রয়েছে –

সমুখে বেহারা আস্যা যোগায় পালকি।।
শীঘ্রগতি আরোহিল পালকি উপর।
বাজারে বাজারে যায় শহরে শহর।।
শিঙ্গা কাড়া সদাই সত্বর ধাত্তাধালি।
শতেক পদাতিক সঙ্গে আগুপাছু ঢালী।।

সেকালের বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল বিচিত্র রকমের খেলাধূলা। মূলত কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যেমন – বিবাহ, পূজা, ইত্যাদি উপলক্ষে বাঙালিরা ক্রীড়াবিহারে মেতে উঠত। বাঙালি রমণীরা নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে জলক্রীড়ায় লিপ্ত হত, এমন দৃশ্য মিলেছে 'ধর্মমঙ্গলের' 'আখড়া পালা'য় –

বস্ত্র অলঙ্কার যত ঘাটেতে রাখিয়া।
জলেতে নাম্বিল যত গুয়ালার মেয়্যা।।
জলখেলা করে সুখে যতেক গোপিনী।
বসন ভূষণ চুরি কৈল যদুমণি।।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার গোপিনী সহযোগে জলকেলির কথা। এছাড়াও কড়ি খেলা, পাশা খেলা, আখড়া খেলা, গেড়ুয়া খেলা, আরং বা বাইচ খেলা, ডাংগুলি ও চৌগান খেলার প্রচলন ছিল। মেয়েদের মধ্যে মেঘুরী খেলারও প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের বাঙালিরা নানাবিধ

যুদ্ধখেলায় লিপ্ত হত। যেমন – মল্লযুদ্ধ, হস্তীযুদ্ধ, নাপান, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন কড়ি ও পাশাখেলায় মত্ত হলে মা তাকে সতর্ক করে বলেছেন –

শুন বাপু লাউসেন আমার বচন।
কড়িখেলা দূর কর শুন বাপধন।।
পাশাখেলা হেতু দুঃখ পাইল যুধিষ্ঠির।
বনে বনে বঞ্চিল অর্জুন মহাবীর।।

এছাড়া এই কাব্যের 'আখড়া পালায়' কর্পূর ও লাউসেন আখড়া খেলা ও মল্লযুদ্ধ অনুশীলন করেছে –

দুই ভাই আখড়া খেলে ঘুরে পায় পায়।
....
দিবস রজনী যুদ্ধ বাড়ে বিপরীত।
মল্লযুদ্ধ করে নিত্য মল্লের সহিত।।

বাঙালি তীর্থভ্রমণ পিপাসু। মধ্যযুগের কাব্যে বিভিন্ন তীর্থের উল্লেখ রয়েছে যা আজও বর্তমান। সাধারণ বাঙালি তো বটেই, এমনকি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা পার্ষদ সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলেছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দ রায় মহানন্দে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন-

হেনমতে গৃহছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভবানন্দে তীর্থ ভ্রমিঞা বেড়ায় ।।
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি।।
....
গোমতী, গণ্ডকী, গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকবন, বুলেন বিহারি।।
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশ্বর স্থান গেলা কন্যাকানগরী।।
রেবা, মাহিষ্মতী, মল্ল তীর্থ হরিদ্বার।
যহি পূর্বে অবতার হইল গঙ্গার।।
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ রায়।
সব দেখি পুনঃ আইলেন মথুরায়।।

মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে বাংলার জনমানসে যে প্রেমভাবের জোয়ার এসেছিল আজও বাঙালির কাছে তা উপজীব্য। ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মসমর্পণ তথা তিল-তুলসী দিয়ে আত্মনিবেদন বাঙালির সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচিন্তার অপরিহার্য অঙ্গ। তুলসীতলায় হরিনাম গান কিংবা নবদ্বীপ নীলাচলে ভক্তবৃন্দ সাথে সংকীর্তনবিহার ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে। নীলাচলে সার্বভৌমের গৃহে পদার্পণের পর মহাপ্রভুর কীর্তন বিহার –

হেনমতে কবি সার্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্তন বিহার।।
নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে।।
নীলাচল বাসী যত অপূর্ব দেখিয়া।
সর্বলোক হরি বোলে ডাকয়ে ডাকিয়া।।

তীর্থভ্রমণ ছাড়াও পর্যটনে বাঙালির উৎসাহ চিরকালীন। আসমুদ্র হিমাচল সর্বত্র বাঙালির অবাধ যাতায়াত। মহাপ্রভুর লীলাপার্ষদ নিত্যানন্দ রায় পর্যটন কেলি করেছিলেন –

তবে প্রভু সকল পার্ষদগণ মেলি।
ভক্ত – গৃহে গৃহে করে পর্যটন কেলি।।
জাহ্নবীর দুই কুলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম।।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও যে পর্যটনে বের হতেন, তারও পরিচয় পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবতের' শেষখণ্ডে। মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে গদাধরের সঙ্গে নাম সংকীর্তন করছেন এবং গদাধরও মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে সর্বদা তাঁর সেবা করছেন –

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।।

এমনকি মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে স্মৃতিসংহিতা, শাস্ত্র, কাব্য, জ্যোতিষ ইত্যাদি পাঠের প্রচলন ছিল যা শাস্ত্রবিহারের অন্যতম অঙ্গ।

মধ্যযুগের বাঙালির বিহারের অঙ্গ ছিল পশুশিকার। তীর-ধনুক, বর্শা সহযোগে শিকার করা হত সজারু, হরিণ, বরা, মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক, চামর, সরভ, হাতি, ইত্যাদি পশু। 'চণ্ডীমঙ্গল' **কাব্যে** কালকেতু প্রতিদিন শিকারে যেত –

সজারু হরিণ বরা লতা পাশে বান্ধে
ঘর আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে গৌড়ের রাজা সুধর্মপাল রায় পাত্র, মিত্র, সেনাপতি সহযোগে মৃগয়া বিহারে বেরিয়েছিলেন –

রাজা বলে শুন পাত্র আমার বচন।
সেনাপতি সাজ্যা চল মৃগয়া কারণ।।
সুনিশ্চিত সাজিব মৃগয়া অনুসার।
নবলক্ষ লয়্যা চল মৃগয়া শিকার।।
....
মৃগয়া শিকার লাগি পড়িল ঘোষণা।
সত্বরে সাজন করে নবলক্ষ সেনা।।
রাজা পাত্র আরোহণ হস্তীর উপর।
পৃষ্ঠে তার দিল আর শোভা মনোহর।।
মাথায় নফর ধরে নব দন্ত ছাতি।
তৈলাত হইল তায় গৌড় সেনাপতি।।
শুভক্ষণে মৃগয়া শিকারে চলে রায়।
ঢালি পাকি বন্দুকী ধানুকী পায় পায়।।

মধ্যযুগের বাঙালি জীবনে সঙ্গীতচর্চা ছিল অন্যতম অঙ্গ। নবাব, রাজা, ভূস্বামীদের সভায় কিংবা অন্যত্র বিভিন্ন ধরনের গান, রসতৃষ্ণা মেটাত আপামর বাঙালির। কখনো কখনো এই গান আবার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের বাহন হয়ে উঠত। গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রয়ানীগান, অষ্টমঙ্গলা গান, ভাটিয়ালী গান, খেউর, ফেরুসাই, বারোমাসী গান , মনসার ভাসান গান প্রভৃতি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র 'দস্যু কেনারামের পালা'য় 'খাণ্ডার এক কোপে' দস্যু কেনারাম যখন ঠাকুর দ্বিজ বংশীর প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন ঠাকুর তাঁর জীবনের শেষ গান গাওয়ার জন্য দস্যুর কাছে আবেদন জানিয়েছিল; যে গান আসলে মনসার ভাসান গান; যাঁ দস্যুর জীবনেও আমূল পরিবর্তন এনেছিল –

মনসা ভাসান গায় অঞ্জনার সুতে।।
বিস্তার প্রান্তরে কেনা দুর্ব্বার বিছানে।
গাহান শুনিতে বসল দলবল সনে।।
প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা।

কথায় কথায় চক্ষে বহে অশ্রু ধারা।।
গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে।
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে।।

মনসার এই ভাসান গান আজও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে বহুল প্রচলিত।

'কঙ্ক ও লীলা' পালায় কঙ্ক গর্গপুরে গুরুর নিকটে থেকে নানা রকম সঙ্গীত শিক্ষা করেছে –

ফেরুষাই বারমাসী সঙ্গীত যে কত।
শিখিয়াছে কঙ্কধর তাহা শত শত।।

বাঙালির সঙ্গীতচর্চা আজ বহুধা বিস্তৃত। কিন্তু বাঙালির গুরুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষার ইতিহাস সুপ্রাচীন, একথা সহজেই বোঝা যায়। এমনকি লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত ভাটিয়ালী গানের প্রসঙ্গও আছে এই পালায়, যেখানে কঙ্কের 'ভাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা'। সঙ্গীতের পাশাপাশি বাঁশীর মধুর সুর যে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়, তার উল্লেখও আমরা পাই মধ্যযুগের কাব্যে। আর কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গৃহবধূ রাধার মন উতলা হওয়ার কথা তো সকলের জানা –

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।

[বংশী খণ্ড / শ্রীকৃষ্ণকীর্তন]

সর্বোপরি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অধিকাংশই ছিল গেয়। বিভিন্ন তাল, রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে, তা গাওয়া হত। রাগের মধ্যে মালব রাগ, রামগিরী রাগ, কোড়া রাগ, বরাড়ী রাগ, ধানুষী রাগ, গুর্জ্জরী রাগ, পাহাড়িআ রাগ, কোড়াদেশ রাগ, ভৈরবী রাগ, কেদার রাগ, পাহিড়া রাগ, দেশাগ রাগ, আহের রাগ, কুহূরাগ, বেলাবলী রাগ, বসন্ত রাগ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অন্যতম ছিল ভেউর, কর্ণাল, সানাই, বিউগল, শিঙ্গা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মাদল, করতাল, মুরজ, দুন্দুভি, কাড়া, রবাব, দোতারা, বীণা, কপিনাস, তম্বুরা, কিঙ্গরি, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি। বর্তমানে বাঙালির সঙ্গীতচর্চার অঙ্গ হিসেবে এইসকল রাগরাগিণী ও বাদ্যযন্ত্র সবই ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাদের নামকরণে এবং বাজানোর পদ্ধতিতে নানান বৈচিত্র্য

এসেছে। এমনকি নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মধুর শব্দনিনাদক নানা বাদ্যেরও উদ্ভাবন ঘটেছে একথা বলাবাহুল্য।

মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রায় নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আমরা পাই এই সময়কার সাহিত্যে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখেছি ধর্মকেতুপত্নী নিদয়ার রসবাস ও সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান, যেখানে কবি বলেছেন-

সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু
জ্ঞাতি বন্ধু সভে সাধ দেই শুভ হেতু।

নিদয়ার পুত্র জন্মানোর পরে নাভিচ্ছেদ,কর্ণভেদ,ষষ্ঠীপূজা, আটকড়াইয়া,নর্তা, ষ্যাটারা, একর্তিসা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কবি বলেছেন –

চাল কুড়ি আতুড়ি জ্বালিল ততক্ষণে
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমুণ্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বারা ডানি ভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তারে বর মাগে।
তিনদিনে করে রামা সুপথ্য পাচন
ছয়দিনে ষ্যাঠার করিল জাগরণ।
আটদিনে আটকড়াইয়া করিল ধর্মকেতু
নয় দিনে নর্তা কৈল সুত শুভ হেতু।
আন রূপ ব্যাধ সুত দিবসে দিবসে
ষষ্ঠীপূজা একর্তিসা কৈল একমাসে।

এমনকি দেবদেবীর পূজা হত বিচিত্র উপচার ও পশুবলি সহযোগে। ধর্মমঙ্গলে আঁটকুড়া সোম ঘোষ পুত্রলাভের আশায় দেবীচণ্ডীর পূজা করেছে। 'ধর্মমঙ্গলে' কবি রূপরাম চক্রবর্তী বলেছেন –

নানা বর্ণে বাদ্য বাজে অজয়ার ঘটে।
দায়ন জুড়িয়া কত ছাগ মেষ কাটে।।

'চণ্ডীমঙ্গলে' শিবের পূজা উপলক্ষে চড়ক, জিভ কাটা, জিভ ফোঁড়ানো, ইত্যাদি ধর্মীয় আচারের প্রসঙ্গ রয়েছে –

চৈত্র মাসে পূজে হর নানা উপহারে
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।
জিভ কাটে জিভ ফোড়ে করএ চড়ক
অভিমত স্বর্গ যায় না যায় নরক।

উপরিউক্ত আলোচনায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বাঙালির রসনা নিবৃত্তির জন্য যে সকল খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ আমরা পেয়েছি তার মধ্যদিয়ে ধারাবাহিক বাঙালির পরিচয়টুকু সহজেই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে বাঙালির সমাজজীবনে আবর্তিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, শখ-আহ্লাদ, ভালোলাগা-মন্দলাগা বিষয়, যার অনেকাংশই আজও বাঙালি জাতি বহন করে চলেছে ঐতিহ্যের সূত্রে বংশপরম্পরায়। আর এই ঐতিহ্যের সূত্রই সব থেকে আগে চিনিয়ে দেয় ভিন্ন জাতির মানুষের সহাবস্থানে থেকেও তাদের বিশেষত্বকে, বাঙালিয়ানাকে।

।। সহায়ক গ্রন্থ ।।

১। বাঙালীর ইতিহাস – নীহাররঞ্জন রায়
২। হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি – গোলাম মুরশিদ
৩। বাঙালীর বিবর্তন – অতুল সুর
৪। বৃহৎ বঙ্গ – দীনেশ চন্দ্র সেন
৫। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা)
৬। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল – পণ্ডিত কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ (সম্পা)
৭। কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল – সুকুমার সেন (সম্পা)
৮। বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত – বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা)
৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত - সুকুমার সেন (সম্পা)
১০। রামায়ণ (কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত) – সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা)
১১। ধর্মমঙ্গল (রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত) – অক্ষয় কুমার কয়াল (সম্পা)
১২। ময়মনসিংহ গীতিকা - সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা)
১৩। পদ্মাবতী (সৈয়দ আলাওল) – দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)
১৪। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল – সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পা)।

বাঙালিসংস্কৃতির অভিমুখ

অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' এই পরিক্রমা যেন আনন্দে বাঙালির আবিশ্ব পর্যটনের দিশা দান করে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রতিটি পর্যায়ে এই জাতিসত্তাকে বরণ করে নিতে হয়েছে- 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিয়ে যাবে না ফিরে'- রবীন্দ্র-উপলব্ধ এই আপ্তবাক্যটিকে বারেবারে। যে কোন জাতির জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাকে পর্যালোচনার চেষ্টা করলে দেখা যায়, তার ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই বিকাশের পথরেখাটি নির্মাণ করে চলে। বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দুঃখ-সুখের নিত্যধারায় স্নাত হয়ে আজকের দিনের আদল বা অবয়ব লাভ করেছে।

এ কথাটি অনস্বীকার্য যে, বাংলার প্রারম্ভিক-উত্থানের যুগে বিজাতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলই তাকে যথার্থভাবে প্রতিপালনের সহায়তা দান করেছে। সংস্কৃত তার আভিজাত্যপূর্ণ বলয়কে রাজসভা ও রাজন্যবর্গের মাধ্যমে নিজস্ব শক্তিপ্রকাশের চেষ্টা করেছে এই ভাষা ও সাংস্কৃতিকবৃত্তকে লালন করতে গিয়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণাট থেকে সেনবংশীয় রাজারা এসেছেন ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতকে উত্তরাধিকার হিসাবে সঙ্গে নিয়ে। চর্যাপদকেই যদি আদি সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়, তবু তার থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গেয় এই দুই সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে ব্যবহৃত গানের রাগ-রাগিণীগুলির যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবু মেনে নিতে হয়, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের দিক থেকে দুটি গ্রন্থের প্রকাশ মাধ্যমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এমনকি চর্যাপদের টীকাকার মুনিদত্ত তাঁর টীকাও লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়। মধ্যযুগের থেকেই স্মৃতি, ন্যায়, তর্কশাস্ত্রের প্রচলন বেশ কয়েকটি জায়গায় ছড়িয়ে যায়। যেমন নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), শান্তিপুর কাটোয়াসহ বর্ধমানের কিছু এলাকা এই সংস্কৃতনির্ভর চর্চায় গা ভাসিয়েছিল বেশ কয়েকটি শতাব্দী ধরে।

জাতিসত্তার নিরিখে বাঙালি 'একের অনলে বহুর আহুতি'কেই বরণ করতে চেয়েছে। আদিচিহ্নকে বিচার করলে দেখা চলে, নেগ্রিটো, প্রোটো-

অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় বা ভোটচীনীয় অংশের যোগসূত্র এই বাঙালির জাতিগত স্বরূপে মিশে আছে। বাণিজ্যিক দিক থেকে মোঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে পর্তুগীজরা পাকাপাকিভাবে এখানে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে বসবাস শুরু করে। অতুল সুর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে এদের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, "কাঠামো, গাত্রবর্ণ, ভাষা, কথাবার্তা, দৈনন্দিন জীবনচর্যা, এমনকি আচারবিচারেও বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনছন্দের থেকে এরা দূরবর্তী হয়ে যায়নি । প্রায়-আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে নগর কোলকাতার মনোরঞ্জনের জন্য যে কবিগান সমাদৃত হয়েছে, তার একজন প্রথমসারির শিল্পী অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি এই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন।

আদি প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভাষার মধ্যে দিয়েও বাংলার ধমনীতে এসে প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য, নিষাদ বা কিরাত জাতিভুক্ত লোকের মুণ্ডাভাষা, দ্রাবিড় গোত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। নৃতাত্ত্বিক বিরজাশংকর গুহ ও রমাপ্রসাদ চন্দ উভয়ই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বাংলার রাঢ়ী এলাকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় সম্প্রদায়ের দৈহিক গঠন অনেকাংশেই সাদৃশ্যযুক্ত। । যেমন এদের মাথা গোলাকার, নাসিকা দীর্ঘ, উন্নত, ললাট প্রশস্ত। গায়ের রঙ বাদামি বা সাদা। চুলের রঙ কালো। এসবের ভিত্তিতে বাঙালি জাতির উৎপত্তিকে মঙ্গোলীয় পর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দান করা চলে। রিজলীর এই মনোভাবটিকে সবাই স্বীকৃতি দেননি। পুরাণ কাহিনি থেকে জানা সম্ভব, পুরু বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। যার পাঁচটি সন্তান ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড। বলিরাজের এই পঞ্চপুত্র 'বালেয় ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত হয়েছেন। যজুর্বেদ অনুসারে বলা যায়, এই বঙ্গবাসী কিচিরমিচির করার জাত। এককথায় অধৈর্য ও অসহিষ্ণু মনোভাবাপন্ন হল এই বাঙালি জাতের লোক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে 'বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলে এর বিদ্রুপ করা হয়েছে। বৈদিক যুগের আর্যরা একে বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে দেখেছে। কোথাও কোথাও প্রাচীন গ্রন্থে বাঙালিকে 'দাস' বা দস্যুও বলা হচ্ছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙালির মিশ্রজাতিসত্তার পরিচয় বহুদিন সংস্কৃতির নানাছন্দে ও সুরে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একদা এই সভ্যতার সাথে সুদূর গ্রিক ও রোমান সভ্যতার আদানপ্রদান ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে চলত, সে সম্পর্কে অবহিত করেন ইতিহাসবিদ অতুল সুর।[১] গৌড় অঞ্চলটি ছিল সুজলা ও সুফলা শস্যশ্যামলা, এই এলাকায় স্থাপত্য ও শিল্পকলার খ্যাতি ছড়িয়েছে দূরপ্রাচ্য

পর্যন্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারে বাঙালির প্রভাবই যে সর্বাধিক ছিল, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাষাবিদদের চোখে যবদ্বীপে বেশ কিছু লিপিতে ভাষার অক্ষর বাংলার সাথে মিলযুক্ত বলে মনে হয়। এমনকি দৃশ্যাবলি যা উৎকীর্ণ রয়েছে, তার ভাস্কর্য শিল্প রামায়ণ থেকে নেওয়া।

মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃতিচর্চা বারেবারে পরিবর্তিত হয়েছে। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্য অনুসারে – "রাজা গণেশ বাঙলার ইতিহাসের একজন অরিস্মরণীয় পুরুষ। তিনিই একমাত্র হিন্দু যিনি বাঙলার ইতিহাসে পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্যে ব্যতিক্রমী হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" দ্বাদশ শতাব্দি থেকে লক্ষণ সেন প্রবর্তিত কৌলিন্যপ্রথার কবলে পড়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা করা বিশেষ সংকটজনক হয়ে পড়ে। ফলে মধ্যযুগে সাধারণ মুসলিম জনগণের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণ করে, সবাই বহিরাগত মুসলিম ছিলেন না। বরং আমরা জানতে পারি যে, বাংলাদেশে যেসকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা সম্রাট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িশায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মুঘলযুগে পূর্ববাংলাকে অস্বাস্থ্যকর মনে করা হয়। রাজকর্মচারীগণ সেখানে আসতেন। দীর্ঘদিন সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতেন না তারা। একমাত্র বহিরাগত মুসলমান প্রশাসক ও বাণিজ্য উপলক্ষে আসা মানুষের কাছে নিরাপদ ছিল চট্টগ্রামের বসতি। যার প্রমাণ রোসাঙ্গ রাজসভার বাংলা সংস্কৃতিচর্চার শিল্পী সৈয়দ আলাওল ও দৌলত কাজির লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, মুসলমান বেশ কিছু কবি একালে রচনা করেন বৈষ্ণব কবিতা, মানব-মানবীর প্রণয়রসাত্মক কাহিনি। ধর্মীয় প্রচলিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে মুক্তমনের অধিকার নিয়ে তাদের কেউ-বা বাউলের সুর ও স্বরে উদ্ভাসিত হয়েছেন। আবার একই সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর সাথে নিজেদের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে এদের জুড়ি ছিল না। সুন্দরবন এলাকার বনবিবি ও দক্ষিণরায় এই ধরনের মিশ্র সংস্কৃতির ফসল। এমনকি 'সত্যনারায়ণ' উভয় সংস্কৃতির থেকে বাহিত দেবতা হয়ে উঠেছেন। এই পুজোকে ঘিরে যে শিরনি দেওয়া হয়, তাও যৌথ সংস্কৃতির সমবায় থেকে বিকাশপ্রাপ্ত।

মধ্যযুগের সাধারণ রায়তের জীবন যে আদৌ সুখকর ছিল না, তা প্রতিষ্ঠিত হয় নিম্নকোটির মানুষের দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করে। চণ্ডীমঙ্গলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর দামুন্যা গ্রাম থেকে ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচারে ভিটা মাটি

থেকে বের হয়ে আসেন এক অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের মাঝে। একই দুর্দশাগ্রস্ত কবি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের লেখায়।

বিত্তশালী মধ্যযুগের বাংলার বাসিন্দাদের কাছে দামি অলংকার রাখার সমপর্যায় ছিল দাসদাসীকে বেশ কিছু সংখ্যায় প্রতিপালন করা। প্রথমদিকে গৃহকর্তার অধীনস্ত ভূমিকর্ষণ ও ঘরোয়া কাজকর্মের দায়ভার বর্তাত এদের উপর। পরে গৃহকর্তার সৌজন্যে এই দাসীগণের কেউ কেউ উপপত্নীর পদ অলঙ্কৃত করতো। নবাব, বাদশাহের মতো ক্রমশ এই ব্যবস্থা সাধারণ ধনী ব্যক্তিদের জীবনেও ঢুকে পড়ে। এই দাসদাসীর ক্রয়-বিক্রয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত জাতীয় জীবনে কোন বিপর্যয়ের সময় বা দুর্ভিক্ষের সময়। মধ্যযুগীয় নানান সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়, সামাজিকভাবে এই দাসদাসীদের মূল্যমান কেমন ছিল সে প্রসঙ্গে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতির একটি বিশেষ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ৪০ বৎসরের এক দাস যুবকের মূল্য ছিল ৬ টাকা, গৌরবর্ণা ৩০ বৎসর বয়স্কা দাসীর দাম ছিল ৪ টাকা, ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকের দাম ছিল ৩ টাকা, পাশাপাশি ৫ বৎসর বয়স্কা এক শ্যামাঙ্গী মেয়ের বাজার দর ছিল মাত্র একটাকা। আফ্রিকা থেকে আসা পর্যটক ইবন বতুতা নিজের বিবরণে উল্লেখ করেন, এই সময়ে ভারত থেকে তিনি মাত্র ২৫ টাকার বিনিময়ে এক পরমাসুন্দরী তরুণীকে নিজের দেশে নিয়ে যান, এই বাংলাদেশ থেকেই তাকে সংগ্রহ করেন তিনি। এর থেকে ক্ষেত্র বিশেষে একটি বিশেষ সমাচার আমরা পাচ্ছি যে, সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ব্যাপারটি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যৌন অত্যাচারের মতো ঘটনাও অবিরল হয়ে ওঠেনি।

ষোড়শ শতব্দির পরবর্তীতে পর্তুগীজ দস্যুরাও দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রচুর পরিমাণে ছেলেমেয়েদের চুরি করে, মোটা দামে বিক্রি করত। এই সমস্ত মেয়েদের 'ভারার মেয়ে' বলত। অনেক সময় অজানা মুসলমানী ভারার মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর কোন ছেলের বিয়েও জুটে যেত। উনিশ শতকে লেখা 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের একটি প্রহসনধর্মী নাটকে এই জাতীয় মেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে উল্লাস ব্যক্ত করেছেন একজন ঘটক, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বাস্তবিক আঠারো শতকের শেষভাগে ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সংবাদ পত্রের পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই দাসদাসীর ক্রয়ের ব্যাপারটি চলত। উনিশ শতকের গোড়ায় এলিজা ব্রম্পে যে বিবরণ দান করেন, তাতে দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থা ছিল বড়ই সঙ্গীন। চুরি ও ডাকাতি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। এতে ইংরেজ রাজকর্মচারীর

কঠোর হাতে দমন করতে চাইত। একটি বাচ্চা ছেলের গয়না চুরি করার অপরাধে দোষীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হবে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফাঁসি হওয়ার আগের মুহূর্তে তাকে তার শেষ ইচ্ছা কি জানতে বলা হলে, সে পেটপুরে ভাত খাওয়ার কথা জানায়। স্বয়ং লেখক এলিজা এতে বিস্মিত হন। যে কোন সাধারণ মানুষও এতে চমকে উঠবেন- এত প্রকট দারিদ্র্যের কথা শুনে।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের অনিবার্য রূপান্তর ঘটতে শুরু করে, রেনাসাঁর হাত ধরে। উল্লেখ্য, ১৮১৩ তে চার্টার অ্যাক্টের ফলে ভারতীয় সাধারণ জীবনের নৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত অবস্থার উন্নতির জন্যে প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করে প্রতি বছর। এর কারণেই ১৮৩৩-এ তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মেকলে সাহেব জোরের সঙ্গে বলেন তার মিনিটে পশ্চিমী শিক্ষার অগ্রসর করার কথা। প্রকৃত পক্ষে, এই টাকা কিভাবে ব্যয়িত হবে তাকে ঘিরেই সমস্যার জটিলতা তৈরি হয়। অবশেষে সেই জটিলতার জট কাটে উডের দলিলনামাতে (১৮৫৩) এসে। Down word Filtration পদ্ধতিতে যেভাবে জলের গতি সর্বদাই নিচের দিকে চলে যায়। ঠিক একই ভাবে এই সময়ের ইংরেজ শাসকেরাও চাইলেন শিক্ষাকে উপরের তলা থেকে নিচের দিকে চারিয়ে দিতে। স্মরণীয় যে বিদ্যাসাগর মশাই এই সময় সারা বাংলা জুড়ে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে এগিয়ে আসেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যেই এই বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে ওঠে । আবার সমকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের নানা প্রান্তে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের সুযোগ করে দেয়। যদিও এই সময় থেকেই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মূল ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাধারার যোগসূত্র ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, যার দরুণ প্রায় ৫০ বছর পেরোনো অবস্থায় অরবিন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাতে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক নানান পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের হৃতগৌরব পুনরুজ্জীবিত করে তোলার একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে এই পর্বে। বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার আগ্রাসন থেকে মুক্তির প্রয়াস শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি একথাও মনে রাখবার যে, শিক্ষাকে উডের দলিলনামার মতো করে কারিগরি শিক্ষাকেও যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তীকালের হান্টার, স্যাডলার থেকে কার্জন কমিশন পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাচিন্তার মধ্যে এই কারিগরি

বিভাগটি অপরিহার্য হয়ে ধরা দিয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পরাধীন বাঙালি জাতি ক্রমাগত ভেবে এসেছে জ্ঞানচর্চাই তার শিক্ষিত মানসের একমাত্র অবলম্বন। পরিহার করেছে এই জাতি কারিগরি বিদ্যার চর্চাকে। দোষারোপ করা হয়েছে ইংরেজ প্রশাসনিক নগ্ন উদ্দেশ্যকে, যারা বাঙালিকে শুধু কেরাণীতে পরিণত করে. অন্যদিক থেকে জাতীয় স্তরেও এই বাঙালি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বৌদ্ধিক ও সৃজনশীল মানসিকতার জন্যে। সম্ভবত সেখান থেকেই গোখেল্ সাহেব উল্লেখ করেন, 'What Bengal thinks to day, India will think to morrow' একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মার আদর্শগত বিরোধ বেধেঁছে এই অবস্থানবিন্দুর কারণে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের কাছে বিশশতকের সিকিভাগ পর্যন্ত পঙ্গু সামন্তবাদী ব্যবস্থাই সর্বেসর্বা ছিল। এই বাংলায় অন্তত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার রমরমা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আর মানুষের আস্থা অর্জনেও এই ব্যাঙ্ক তেমন ভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বলিদান' নাটকে ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়। শেয়ারবাজার বা বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। বাস্তবিক এক স্থিতিশীল গ্রামীণ জীবননির্ভর অর্থসামাজিক ব্যবস্থাই সে-সময় বাংলাদেশের একমাত্র পরিচয় ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সরাসরি কোন আক্রমণ করেনি ভারতীয় জনজীবনে। দেশীয় নেতারা মত ও পথের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন হতে শুরু করেছেন। এযুগে আন্তর্জাতিক স্তরে এসেছে প্রচুর রদবদল। যার প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিচিত্রমুখীন এক গতি দান করেছে। যার ফলে সমাজবাস্তবতার কাছাকাছি আসতে পেরেছে এই ভাষা ও সাহিত্য। কল্লোল-কালিকলম-উত্তরা, পরে পূর্বাশা অভিনবত্ব এসেছে কথাসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গিমায় ও বিষয়ের উপস্থাপন ও বর্ণনারীতির আশ্রয়ে। এই সময়ে তাই দেখা যায় আধুনিকতা পশ্চিমি সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে সরাসরি হাজির হয়েছে স্যানডে ভেনিয়ান ধাঁচের কথাবস্তুকে অবলম্বন করে। কাব্যকবিতায় আধুনিকতা এসেছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টির বিচিত্র বৈভবকে অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গ স্বীকার করে নিতে হয়, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পদেহের পরিবর্তনের নানানমাত্রা ও স্বরূপ পশ্চিমি সাহিত্য থেকে উঠে এসেছে। তাই সর্বার্থে বলা চলে রবীন্দ্র-বলয়কে অতিক্রমের জন্যে বাঙালি লেখককুলের কাছে বহির্বিশ্বের প্রভাবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছে। একারণে এলিয়ট, বোদলেয়ার, চর্যাকারদের হাত থেকেই গড়ে উঠেছে কাব্যের আঙ্গিক, ভাষা ও তার নান্দনিক প্রতীকগুলি। পণ্ডিতদের সুরে আমাদের জানাতে হয়, এই দেশে, বিশেষত বাংলা ভাবচর্চার ক্ষেত্রে উনিশ শতকে আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজদের হাত ধরে; একই ভাবে বিংশশতকে প্রগতিশীলতার চিহ্নগুলিও জন্ম নিয়েছে ইউরোপীয় ভাবনাচিন্তার জগৎ থেকে। তাই নতুন চিন্তার খোরাক পরানুকরণ ছাড়া বাঙালির কাছে ধরা দেয়নি। এ ক্ষেত্রে রেনেসাঁ হিসেবে যথার্থই উনিশ শতকের সাহিত্যকে আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি-কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে। সে তুলনায় ষোল শতকের চৈতন্যনির্ভর বাংলা রেনেসাঁকে প্রকৃত অর্থেই নবজাগরণ বলা চলে। কারণ উনিশ শতকের মতো এটি খণ্ডিত ও নাগরিক সমাজমুখী হয়ে থাকেনি। বৈষ্ণবসমাজের সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণকে পরবর্তীতে ছাপিয়ে যায়। আধুনিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলতে পারেন, 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' চৈতন্যসংস্কৃতির দৌলতে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রবেশ করেছে পদাবলি, নাটক, জীবনী গ্রন্থ, তৎসম শব্দ সমন্বিত বাংলা গদ্যের প্রসার। সেই সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সমগ্র মধ্যযুগের ভক্তিভাবনাকে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যায় মণ্ডিত করে তুলেছিল। নিতান্ত মর্ত মানব-মানবীর প্রেমকথা থেকে রাধাকৃষ্ণের কল্পনানির্ভর পর্যায়গুলির মনস্তত্ত্বসম্মত বিশ্লেষণের অবতারণা করলেন। তার সেই রাসলীলাকে অবলম্বন করে সমগ্র বাঙালি রসিকচিত্তকে নন্দিত করে তুলেছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, আর চৈতন্য-পরবর্তী গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা আধুনিক যুগে এসে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই গভীর সংলগ্নতায় যুক্ত হয়েছেন দেশীয় বৈষ্ণব রসধারায়।

ভৌগোলিক দিক থেকেই বাঙালি মননভূমিতে গীতিকবিতার উপযুক্ত পরিচয় নিহিত রয়েছে। স্বভাবকবির মতো আবেগ বাঙালিচেতনার আদিলগ্ন থেকে বহমান। বাইরের প্রকৃতি ও তার দৃশ্যকে ছন্দিত কাব্যে রূপ দিতে অধ্যাত্মসাধক চর্যার কবিরা যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি বহুযুগের ওপার থেকে আসা এই কবির কণ্ঠস্বরকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যে ঠাঁই দিলেন। চর্যাপদের কাহ্নুপাদের লেখা পদে পাই –

শোনে ভরতি করুণা নাবী।
রুপা থোই নাহিক ঠাবী

'সোনার তরী'র নামকবিতাটিতে পাওয়া যায় তারই একটি উজ্জ্বল প্রকাশ।

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই: ছোটো সে তরী।
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।।

এভাবেই রসিক বাঙালি শুধু কাব্য সুধারসকেই পান করেন না, রন্ধনশিল্পে ও তার বহুব্যঞ্জনের সমাবেশকে নিয়ে এসেছেন, যার প্রমাণ দেখা যায় প্রাকৃত পৈঙ্গলের কাব্য কল্পনাতে –

ওগগর ভত্তা। মউলি মচ্ছা।
রম্ভর পত্তা। নালিচ গচ্ছা।।
গাইক ঘিত্তা। দিচ্ছই কন্তা।
দুগ্ধ সযুত্তা। খাঅ পুনবন্তা।।

এই দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালির সাথে একুশ শতকের 'সাধারণ বাঙালির খাদ্যভ্যাস ও রুচিবোধ বহুলাংশেই পালটে গেছে'। কেক-প্যাটিসে নিত্যকার রসনালোলুপ হয়ে পড়েছে বাঙালি। সেই সঙ্গে দেশিক-পটভূমির বৃত্তকে ছাপিয়ে সে যেতে চাইছে আন্তর্জাতিক বাজারের কাছাকাছি। তাই দেখি তার খাদ্যের তালিকায় চিনা খাবারের সঙ্গে অনায়াসে স্থান করে নেয় কন্টিনেন্টাল ফুড। একালের লেখক নবনীতা লেখেন দেশীয় ও বিদেশি খাবার নিয়ে একটি মনোজ্ঞ রচনা 'পাকশালার পাকে পাকে।' হাস্যরসিক কবি সুকুমার রায় এর লেখা 'খাই-খাই' কবিতাটিও দেশ-বিদেশের বিচিত্র রান্নার নমুনা দেয় আমাদের কাছে। অনেকে আবার খাবারকে ঘিরে বিলাসিতাকে পছন্দ করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে রসনাকে সবচেয়ে কম মূল্য দেন। যার মধ্যে বহু বর্ণের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন। সবচেয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত বোধহয় সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় মেলে, যখন স্বয়ং এই লেখক বেহেস্তে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগও প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এই বেহেস্তের বর্ণনায় কোনো ইলিশমাছের উপস্থিতি নেই বলে। আর তাঁর বর্ণনাতে কোন মদ্য পানীয়ই অচ্ছ্যুৎ অবস্থায় থাকে না। সাঁওতালি হাড়িয়ার সঙ্গে উঠে আসে দুর্লভ ফরাসি ক্ল্যারিনেটারের কাহিনিও।

মধ্যযুগের বাঙালির পাত্রে দেখা যায় বহু ধরনের ভোজ্য উপাদানগুলি। অবশ্য তার পরিচয়টি পাওয়া যায় রাজা বা সামন্ত শাসকের ভোজনকে ঘিরে। সেখানে পুরোপুরিভাবে সাধারণ মানুষেরা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরের বাসিন্দা। কারণ নিত্যদিনের অভাব-অভিযোগের মাধ্যমেই তাদের খাবার সংগ্রহ করেছে। নিজের জন্মের ভিটে-মাটি ছেড়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে ভাগ্যের অন্বেষণে। আবার চর্যার যুগে সামান্য ভাত জোগাড় করতে

গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান সেকালে হতদরিদ্র মানুষ। তাই বেদনায় সূচিভেদ্য অনুভূতিকে প্রকাশ করেন এই সময়ের এক কবি –'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী' কিংবা, 'দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়ে'। খাদ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কবির চিন্তাকর্মের নানান রসগ্রাহী মনের ছাপ। একালের কবিতায় এক্সপ্রেশনিজম এর সঙ্গে রয়েছে সুরিয়ালিজম, ডাডাইজম প্রভৃতির উজ্জ্বল ভাব ও কল্পনার সমবায়ে নির্মিত ঐশ্বর্য। যদিও সাহিত্যের উৎকর্ষ বহুল মাত্রায় নির্ভর করেছে কাব্য কথাটি কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং কতটা জীবন নির্ভর তার স্বরূপই আধুনিক কালের বড় পরিচিতি এনে দিয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে সাহিত্য একালে জীবন বিচ্ছিন্ন কোন উপকরণের রূপ নেয় নি। বরং ক্রমশ কলাকৈবল্যবাদের মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মন ও চেতনাকে নানান সংঘাতে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এই সময়ের আর্থসামাজিক উৎকেন্দ্রিক অবস্থা গ্রাম ও শহরের চালচিত্রকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। একালের নাটক ও ছোটগল্প বিশেষভাবে রূপান্তরের মধ্যদিয়ে এগিয়ে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, পরবর্তীকালের সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান গল্পের কাঠামোর উপর। একাঙ্ক নাটকের ধারায় বনফুলের হাতে 'শিককাবাব', প্রমথনাথ বিশী রচিত কবি মধুসূদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এই পর্বে। যে নাট্যধারার গতিপথ উন্মোচিত হয়েছিল গত শতকের চার ও পাঁচের দশকে, তা আজ একটি বিশেষ শিল্পশাখায় পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি বেতারনাটক বা শ্রুতিনাটকের ধারাতেও পরিবর্তন এসেছে স্পষ্টভাবে।

স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুফল সর্বদাই গ্রামজীবনকে স্পর্শ করেনি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বেশি জোর পড়েছে কৃষিতে, মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শ হয়তো এই সময় পরিকল্পনা-নির্মাতাদের মনজুড়ে বসে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পতে গুরুত্ব বেড়েছে। প্রধানত ভারিশিল্প নির্মাণের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। যা অর্থনীতির ভাষায় 'নেহেরুভিয়ান মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু উত্তরপর্বে অমর্ত্য সেন তাঁর দেশীয় বিকাশের মডেলে দেখান, গ্রামীণ ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী না করে বৃহদায়তন শিল্প নির্মাণের দিকে ঝোঁকা রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। অমর্ত্য তাঁর গবেষণায় একে পরিকল্পনার ব্যর্থতা বলে

বাঙালির আত্মপরিচয় : আমার ভাবনায়

ড. রাহুল চট্টোপাধ্যায়

'আত্মপরিচয়' — শব্দটার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথমত, এই পরিচয় কার? ব্যক্তি, জাতি না দুটিরই? দ্বিতীয়ত, এই পরিচয়ের পরিধি কতটুকু এবং তৃতীয়ত, কোন কালসীমার মধ্যে এই আত্মপরিচয়ের সূত্রটি অনুসন্ধান করা যাবে? বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান করতে গেলে অথবা এ সম্পর্কে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এই মীমাংসার ক্ষেত্রে সভ্যতার ইতিহাসের ধারাটিকে উপলব্ধি করতে হয় এবং এই ধারায় ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তির ভূমিকা এবং জাতির ভূমিকার পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রকাশ করতে হয়। এই প্রকাশ একটি অনন্তবিস্তারী ধারাকেই প্রতিপাদিত করে।

বাঙালির জীবনবোধ গড়ে উঠেছিল একটি সুবিস্তৃত পটভূমিতে। এই পট চিত্রের একটি সূত্র হয়তো সিন্ধুসভ্যতার নির্মাণ ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যটি একেবারে আধুনিককালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটির মধ্যে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী এক পরিবর্তনশীলতা কাজ করে গিয়েছে। যুদ্ধ-আক্রমণ-লুণ্ঠন, ধর্মীয় বিরোধ, আঘাত-অত্যাচারের মধ্যদিয়ে খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে চেতনার। বাঙালির দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই ভাবনার রূপান্তর ঘটেছে , সংশ্লেষ ঘটেছে। এই ভাবনার রূপান্তরের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়। এই রূপান্তরের মধ্যে বিভিন্ন ধারার মিলন ঘটেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি; মূল্যবোধের সংঘাতে গড়ে উঠেছে সামাজিক বোধসমূহ। যেমন, আমরা সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি তুর্কি আক্রমণের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন ধারা। এই ধারার মধ্যে মানুষ খুঁজে নিচ্ছে দেব-দেবীর নতুন রূপ, নতুন তাৎপর্য। জীবনাচরণে, সৃষ্টিতে, বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছে সমাজ। মানুষের হাতে আসছে সৃষ্টির নব নব উপাদান। রচিত হচ্ছে মঙ্গলকাব্যসমূহ— সে সকল কাব্যে প্রকাশ পাচ্ছে চিরন্তন সামাজিক ইতিহাসের ধারা। একে একে আমরা পাচ্ছি চাঁদ সদাগর, বেহুলা, কালকেতু, ফুল্লরার মত চরিত্র। এই সকল

চরিত্রগুলি ধর্মীয় মাত্রার বাইরে জীবনের নানা দিককে খুঁজে ফিরেছে, খুঁজে ফিরেছে নিজেদের সামাজিক পরিচয়। চাঁদের ব্যক্তিত্ব, তার দেববিশ্বাস, অটল পৌরুষ এবং তাকে রক্ষা করার প্রয়াসের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সন্ধানের প্রয়াস সুস্পষ্ট। বেহুলার সাধনা তো এই আত্মপরিচয়েরই সাধনা। ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে বেহুলার অভিযান, স্বামীর জীবনকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টায় নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে সুস্পষ্টতর করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেকে খুঁজে নেওয়ার আগ্রহটিও নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেবদেবীর আত্মপরিচয় সন্ধানের প্রয়াসটিও মঙ্গলকাব্যে স্পষ্ট – এদিক থেকে মনসা, চণ্ডী, সকলেই যথেষ্ট সচেষ্ট। আবার শিবায়ন কাব্যে আমরা নতুন অথচ চিরপুরাতন শিবকে খুঁজে পেলাম। প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারায় আগত এক নতুন ধরনের চরিত্র, যিনি কৃষকের জীবিকার মধ্যে খুঁজে চলেছেন সভ্যতার নতুন মন্ত্র। এই কৃষক শিবের মধ্যে সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির ইতিহাস খুঁজে নেওয়া যায়। কৃষক শিব আমাদেরই চেনাজানা জগতের মানুষ। এই মানুষের সঙ্গে আমাদের সংযোগ সুদীর্ঘকালের। এই সংযোগেই রূপ পায় মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত সম্পর্কটিও।

এই সম্পর্ক ভিন্নভাবে ভিন্নরূপে আমরা ছুঁয়ে যাই কখনও শ্রীরাধায়, কখনও কৃষ্ণে। কখনও সজল কৃষ্ণমেঘের মধ্যে প্রকৃতির কথা ব্যক্ত হয়, কখনও বংশীধ্বনিতে অনন্ত বিরহিণী রাধার বেদনা মাটি-আকাশ-বাতাস বা এককথায় সমগ্র প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে। কখনও শাক্তসাহিত্যের মা, জগজ্জননী হয়েও অক্ষম দরিদ্র ছেলেটির ঘরে স্নেহাঞ্চল বিছিয়ে দেন। কখনও আবার ঈশ্বরী পাটনীর স্বপ্ন হয়ে, কামনা হয়ে সকল শুভচেতনায় তিনি প্রেরণা হয়ে ওঠেন। আবার ঠিক একইভাবে বনের দেবতা, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের পরিচিতির সঙ্গে মিলে যায় অজস্র লড়াকু মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, তাদের মানসিক আশ্রয়।

সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে এমনভাবেই মানুষকে খুঁজতে হয়েছে নিজের জগতটাকে। আপন সৃষ্টির মধ্যে ভেঙেচুরে মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজের পরিবারকে, সমাজকে, সময়কে। দেবদেবীর কল্পনায়, তাঁদের মানবিক বিনির্মাণে মূর্ত হয়েছে এই সমাজ আর সময়কে ভেঙেচুরে দেখার ইচ্ছাটি। কবিদের নিজেদের কথায় , কাব্য নির্মাণের কারণ নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক ভাঙাগড়াকে ছোঁয়ার আগ্রহ। দেব-মানবের মিলিত আখ্যান, তাই কল্পিত কাব্যের বাইরে হয়ে উঠেছে সামাজিক দলিল। সাহিত্য যদি সমাজের

দর্পণ হয়, তাহলে এই দলিলেই স্পষ্ট হয়েছে মানুষের অপরিমেয় আত্মানুসন্ধিৎসা, অসীম কৌতূহল, অকপট আত্মস্বীকৃতি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্মাণে এই সাহিত্যসেতুই যেন কাজ করেছে অনাদিঅতীত থেকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, উৎসবে আমরা এই সেতুতেই খুঁজেছি আমাদের আত্মাকে। তাই বাঙালির সাহিত্য, বাঙালির সময়, বাঙালির সমাজকে স্পর্শ করার প্রয়াসমাত্র। এই প্রয়াসেই তার আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম লিখিত হয়েছে।

সাহিত্যের পাতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার যে প্রয়াস তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে গভীর মৃত্তিকাস্পর্শ। মাটির সঙ্গে মানুষের চিরকালীন সম্পর্কের প্রতীকেই প্রকাশিত হয়েছে জন্ম-ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর করে বলেছেন এই কথাগুলি –

> ' আমি বেশ মনে করতে পারি; বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম। নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম।'(ছিন্নপত্র / পত্র সংখ্যা – ৬৭)

এই তরঙ্গিত পৃথিবীর বুকে গাছ হয়ে উঠে সমস্ত শিকড় দিয়ে মাটি থেকে স্তন্যরস পান করার কথায় ধরা পড়েছে এক বিস্ময়কর শিকড়চেতনা। রবীন্দ্রনাথের এই 'আমি'-র উপলব্ধি, এই প্রাথমিক ক্রিয়াশীলতা বিস্তৃত হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। মহাবিশ্বের তরঙ্গেতে নাচতে নাচতে এই বোধ এক গভীর সত্যচেতনা নিয়ে এগিয়েছিল অনন্তের দিকে। এই 'আমি'-র পটেই উপলব্ধি হয়েছিল পান্না, চুনীর বহুবিচিত্র রঙ – বহু মানুষ, বহু মতবাদ, বহু জীবন। একদিকে শিকড়চেতনা, অন্যদিকে বিশ্বচেতনা- এই দুই চেতনা রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়ের, অনুসন্ধানের দুটি বিন্দু, যা একই স্থলে, একই ভাবে বিকশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ঐ গাছ হয়ে ওঠার কল্পনায় বা অনুভূতিতে প্রকাশিত শিকড়চেতনাই ব্যক্তির স্বাভাবিক আত্মপরিচয় লাভের প্রাথমিক রূপ। ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পৌঁছাতে হবে তার প্রথম আবির্ভাবের স্থলে, নিজের একক / সামাজিক পরিচয় খুঁজতে খুঁজতে তাকে ছুঁয়ে দেখতেই হবে তার জন্ম-ইতিহাস, এই ইতিহাস কোন কোষ্ঠীবিচারের কথা নয়, তা একান্তই তার চিরন্তনত্বকে নিয়ে নাড়াচাড়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্রজীবন সাধনায় যেমন ভাবে 'আমি' – শব্দটিকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছেন, তেমনি কবি নজরুলও 'আমি'কে ভেঙেচুরে খুঁজেছেন। যার প্রমাণ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। বিশ্বের সকল স্রষ্টাকেই এই আমির মধ্যে সংহত হতে হয়, আমিকেই ভেঙেচুরে অগ্রসর হতে হয়। এ সত্য কেবল সাহিত্যস্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয় – প্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। যে পারিবারিক মানুষটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে তার সৃষ্টির মধ্যেও সে খুঁজে চলেছে নিজের পরিচয়কে, রেখে যেতে চাইছে আপনারই' পরিচয়ের উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকার ব্যক্তি হিসাবে তার , বংশধর হিসাবে তার সমগ্রবংশের , সামাজিক মানুষ হিসাবে সমগ্র সমাজের। এইভাবেই একজন ব্যক্তি তার সন্তানের মধ্যে দিয়ে খুঁজে নেয় তার শিকড়কে , প্রতিষ্ঠা করে তার সমাজকে, একজন শিল্পী সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে নেয় তার অতীতকে , প্রতিষ্ঠা দেয় তার সমকালকে এবং উত্তরকালকে, তেমনি একটি জনগোষ্ঠী বা জনসমাজ একটি সার্বিক চলমানতার মধ্যে খুঁজতে থাকে তার ইতিহাসকে , আর ইতিহাসকে অবলম্বন করেই সে জনগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা দেয় তার আগামী অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাকে।

সুতরাং ব্যক্তি থেকে জাতি / জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় একটি শিকড়চেতনা, একটি অস্তিত্বচেতনাকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়, বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে সেই আবর্তনকেই আমরা লক্ষ করার চেষ্টা করেছি। অতিপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে থেকে বাঙালির সংস্কৃতি বা বিশ্বাস ছড়িয়ে গিয়েছে একটি বিস্তৃত কালখণ্ড জুড়ে, একটি সুবিস্তৃত পরিসীমার মধ্যে। বাঙালি যেন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই মাটির পৃথিবীর রসগ্রহণ করতে করতে নিজের জাতিগত পরিচয়কে ভেঙেচুরে খুঁজেছে তার অস্তিত্বের মূল্য। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি সর্বত্রই এই মূল্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছে তার সত্তা। এই অনুসন্ধানের মূলে রয়েছে আস্তিক্যবোধ। আস্তিক্যবোধ কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। সকল বিপর্যয়ের মাঝখানে যে শক্তি মানুষকে এগিয়ে

যাওয়ার প্রেরণা দেয় তাই তার আস্তিক্যবোধ, তার ইতিবাচক মনোভাব। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় , পরজাতির লুণ্ঠন, আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমরা মধ্যযুগ থেকে মানুষের মধ্যে দেখি নিজের শিকড় খুঁজে নেওয়ার অপরিসীম আগ্রহ তার। গভীর অসহায়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে জীবনের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে। কখনও দেবতার প্রেরণায়, কখনও আত্মজয়ের সুগভীর লক্ষ্যে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়েছে বাধাবিপত্তির পাহাড় ডিঙিয়ে। এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই তার রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। রাষ্ট্রব্যবস্থার আধুনিক রূপটি গড়ে ওঠার আগেই সে মানুষ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মানুষ হয়ে উঠেছে। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজশক্তিকে নিজের অনুকূলে কাজ করানোর চেষ্টা করছে, এক গভীর প্রতিবাদচেতনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান অথবা রাজশক্তির বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ ধীরে ধীরে সংহত হয়েছে– তার শিকড়কে , তার পরিচয়কে নতুন মাত্রা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই সংহত চেতনারই কেন্দ্রীভূত রূপ।

এই পথেই যেন মানুষ তার পরিচয়কে মেলে ধরেছে বাংলার পথে পথে – বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে, আইনঅমান্য আন্দোলনে, ভারতছাড়োয়, নেতাজীর আজাদ হিন্দ–এর আন্দোলনে। এসকল আন্দোলনে ভারতবর্ষের সার্বিক পটভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ নতুন করে চিনেছিল নিজেকে, নিজের শক্তিকে। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের কালো দিনগুলোর থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ সামিল হয়েছিল মিছিলে মিটিঙ-এ। এর মাঝেই দু-দুখানা বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত মানুষের সামগ্রিক সত্তাটিকে ধরে নাড়া দিয়েছিল। বেকারী, অভাব, নারীর অমর্যাদা, বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষ নিজেকে সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে , নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিবাদী রূপটিতেই প্রস্ফুটিত হয়েছে তার আত্মপরিচয়। বাঙালির এই প্রতিবাদী রূপটিকেই সেদিন বরণ করে নিয়েছিল সারা ভারতবর্ষ। চিন্তায়, চেতনায়, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে, জ্ঞান-গরিমায় অগ্রসর বাঙালি যে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তা সবচেয়ে বেশি শাণিত হয়েছিল তার প্রতিবাদী সত্তাটির মধ্যে। কিন্তু এই সত্তার ওপর একটা বড় আঘাত এল পরবর্তীকালে। একসময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সমাপ্ত হল ভারতভাগের মধ্যদিয়ে। প্রিয় বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ। এই কঠিন আঘাত সেদিন বাঙালির চিন্তা চেতনা তার

সংহতিকে, এককথায় তার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করল। দেশবিভাগ এবং তাকে ঘিরে উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত বাঙালির জীবনবোধের সবটুকু ইতিবাচকতাকে ধরে টান দিল। বাঙালির সামগ্রিক পরিচয়কে উন্মিলিত করতে চাইল। এক সার্বিক বিনষ্টিচেতনা, অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, গ্রাস করল বাঙালিকে। প্রিয় মানুষ, প্রিয় প্রকৃতি, চেনাজানা দেশ-গাঁ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ আক্রান্ত হল সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধে। বাঙালিত্বের কাছে এত বড়ো সংকট মনে হয় অতীতে কখনও আসেনি।

কিন্তু বাংলার মানুষ এই খণ্ডবিখণ্ড অস্তিত্বচেতনাকে নিয়েই আবার একদিন সংহত হতে চাইল। আবার সেই রাজনৈতিক আন্দোলন, সেই উদ্বাস্তুর অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবি, সেই খাদ্যের দাবিতে সে ঐক্যবদ্ধ হল, গড়ে তুলতে চাইল নিজের ভবিষ্যৎ। কেবল দৈনন্দিন বেঁচে থাকার দাবিতে নয়, সে সংহত হল ভিন্নধারার রাজনৈতিক চেতনায় – যে চেতনা বাঙালিকে শেখাল প্রতিবাদের নতুন ধরন, দাবি আদায়ের নতুন পথ। তার রাজনৈতিক চরিত্রকে আরও শাণিত করল, স্পষ্টতর করল তার অতিগভীর মূল্যবোধকে। এই পথেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালির পরিচয়ের নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে লাগল। যদিও এই পরিচয় মূলত তার সামাজিক ইতিহাসকে প্রতিপাদিত করল, তবু একথা স্পষ্টই যে, এই সামাজিক ইতিহাসই তার সত্তার অন্যদিকগুলিকে যথেষ্ঠ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করল। বাঙালির ভাষায়, তার সাহিত্যে এই সামাজিক ইতিহাস, এই পরিবর্তনের অভিমুখ প্রকাশিত হল জোরালোভাবে। এরই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশের বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন অথবা একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম বাঙালির চিন্তাচেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল । দুই বাংলার মানুষই এক মানবিক সংহতিবোধে একাত্ম হয়েছিল। দেশভাগ দুই বাংলার মানুষের মনে যে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, এই ভাষা আন্দোলন তথা মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সে ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ লেগেছিল। আজও বাংলাদেশের ঘটনার ঢেউ এসে পৌঁছায় আমাদের গ্রামের প্রান্তে – আমাদের ভেজায় কখনও চোখের জলে, কখনও নির্মল বৃষ্টিধারায়। ধর্ম, জাতি, দেশ , কালের গণ্ডীটুকু পেরিয়ে এক বিস্ময়কর একতাবোধ আমাদের সকলকে নিয়ে চলে সাধারণ এক সত্যের দিকে – এই সত্য বাঙালি চেতনার, গভীরে প্রোথিত বিশ্বাত্মবোধ। এই বিশ্বাত্মবোধ একটি সচল প্রকাশ, যা নিয়ত দুই বাংলার মানুষকে গভীর মানবিক সম্পর্কে একাত্ম করে তুলেছে, হয়তো চিরদিনই তুলবে।

নব্বইয়ের দশকে সারা বিশ্বজুড়ে একটি নামকে ঘিরে আলোড়িত হয়েছিল জনসম্পদ। সেই নামটি হল – 'ভুবনায়ন'। এই ভুবনায়নের মধ্যদিয়ে যে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হল, তা মূলত আর্থিক ও বাণিজ্যিক। অবশ্য এই বাণিজ্যিক যোগাযোগের মধ্যদিয়েই প্রভাবিত হতে থাকল নানান দেশের সামাজিক স্তরগুলি। আর্থিক স্থিতির ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক নিস্তব্ধতার ক্ষেত্রে একটা ধাক্কা এল। ভুবনায়নের মধ্যদিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এল। জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণও পরিবর্তিত হল গভীরভাবে। মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হল, তেমনি কর্মসংকোচনও ঘটল সারা বিশ্বজুড়ে। ভুবনায়নের ব্যাপক অভিঘাতে মানুষের সামাজিক ও মানবিক মূল্যচেতনাও পরিবর্তিত হল। বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে এই অভিঘাতের প্রভাব প্রবল না হলেও যথেষ্টই। ভাষার ব্যবহারে, আচরণে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলার পরিচিত পরিমণ্ডলে এক মিশ্রসংস্কৃতি ও ভাষাচেতনার বিকাশ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল , যা কিশোর-কিশোরী , যুবক-যুবতীকে আকৃষ্ট করল অনেকখানিই। বাঙালিসত্তার যে চিরাচরিত প্রকাশ তাও খণ্ডিত হল কিছুটা পরিমাণে। আবার এই প্রকাশের মধ্যে বাঙালি নিজের পরিচয়কে যাচাই করতে চাইল। ভাবে-ভাষায় এক ভিন্ন প্রসারণ পরিলক্ষিত হল, যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি দিকই বিদ্যমান। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতার সংঘাত – সমন্বয়ের পথ দিয়ে আজও বাঙালি প্রতিনিয়তই তার পরিচয়কে নতুন নতুন ভাবে উপলব্ধি করে চলেছে। বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি-রাজনীতি তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালিকে আরও অনেকখানি সৃজনশীল হয়ে উঠতে হচ্ছে নিজের পরিচয়কে ব্যাপ্ত করার জন্য। এই সৃজনশীলতা কালগত পরিসীমার মধ্যে তার পূর্বসূত্রকে অবলম্বন করে উত্তরকালের কাছে কোন মূল্য রেখে যেতে পারবে সে বিচার সম্পূর্ণভাবেই সময়ের হাতে।

আবার এই ভাঙন-পরিবর্তন, নতুন নতুন জীবনবোধের সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্যে আমরা এক নিরবচ্ছিন্ন গভীরতা ও স্থিতির সন্ধান পাই লোকসংস্কৃতির ধারায়। বাংলার লোকজীবনের গূঢ় গভীর সৃজনশীল ধারাটির মধ্যে দিয়েই যেন অনাদি অতীত থেকে আগামীর দিকে অগ্রসরমান মানবজীবনপ্রবাহকে উপলব্ধি করা যায়। গ্রাম্যজীবনের প্রতিটি অংশেই মিশে রয়েছে তার চিরকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নাচে, গানে, মেলায়, উৎসবে, প্রথানুসরণে, পুজোয়, যাদুবিশ্বাসে, কাল্পনিকতায়, জন্মানো ছোট-বড় ঐতিহ্যের মধ্যেও যে

ভাঙাগড়া চলে না তা নয়; তবু কোথাও একটা সূত্র থেকে যায়, যাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে সর্বকিছু। গ্রামজীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ওপর আঘাত , তার স্থিতিশীল চরিত্রটির ওপর আঘাত বহুযুগ থেকেই সেখানকার গণজীবনকে আন্দোলিত করেছে। আজও কর্মজগতের প্রসারণে , বৈজ্ঞানিক বিনোদনের অবদানে এই আন্দোলন ক্রমবর্ধমান। গ্রাম্য পরিমণ্ডলের বাইরে শহরের কর্মজগতে মিশে যাওয়া মানুষের সংখ্যাও প্রতিনিয়তই উর্ধ্বমুখী। শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগও প্রতিদিনই ঘটে চলেছে। তবু গ্রামসংস্কৃতির মূল উৎপাটিত হয়নি। চিরাচরিত বাঙালিয়ানার গ্রামীণ রূপটিকে পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই অখণ্ডতার ভাবখানিকে ঘিরেই বৃহত্তর বহুসমাজ এক আদি অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক জগৎ নির্মাণ করতে পেরেছে। হয়তো সকল ভেদবুদ্ধি আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যেই নিজেকে রক্ষা করবে বাঙালি সমাজ।

বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার নিরবচ্ছিন্ন ধারাটির সঙ্গে সংযুক্ত। বাংলার অর্থনীতি – রাজনীতির নানা উত্থানপতন, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে বহুমুখী নির্মাণ-বিনির্মাণের মধ্যদিয়েই বাঙালি খুঁজে চলেছে তার অস্তিত্বকে। এই অনুসন্ধানও চিরন্তন, ধারাবাহিক। ব্যক্তির অস্তিত্বের সংগ্রামে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের বা প্রতিষ্ঠার অথবা ইচ্ছাপূরণের কথা যেভাবে মধ্যযুগের মানুষ ভেবেছে তেমনভাবে একালের মানুষও ভেবে চলেছে। এই ব্যক্তিগত পরিচয় বৃহত্তরভাবে তার সামাজিক পরিচয়কেও নিয়ন্ত্রণ করছে, জাতিগত পরিচয়কেও এক নতুনতর মাত্রায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই আমরা লক্ষ করি ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট তার সামাজিক পরিচয়কেও সংকটাপন্ন করে, তার ভাষাবোধকেও সংকটাপন্ন করে। এই সংকট আধুনিক ভুবনায়ন পরবর্তী বাঙালির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও এই সংকটের জন্যই একটা দায়সারা মনোভাবও পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক বা সামাজিক ভাবে দায়হীন মনোবৃত্তি অথবা ঠিক বিপরীত অবস্থান থেকে চরম আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে মানুষ কিছুটা দিশাহারাও হয়েছে। তবে এই বোধের সংকট সার্বিক নয়। সংকট থেকে মানুষের উত্তরণের প্রয়াসটিও লক্ষ করার মত। এই প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার পরিচয়। বাঙালি জাতি হিসেবে তার সামগ্রিক পরিচয়কে নিশ্চিতভাবে খুঁজে নেবে এই সংগ্রামী , এই উত্তরণকামী মানুষগুলির মধ্যেই। সংকট সর্বকালেই থাকে, সংকট আছে বলে সবকিছু বিপন্ন এমন বোধটা

বোধহয় সঠিক নয়। সবকিছুর মধ্যে থেকেও যে ক্ষীণ আলোর আভাস লক্ষ করা যায়, সেই আলোকশিখাই যুগে যুগে দেশে দেশে কল্যাণকামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বর্তমান সময়ে নানাদিক থেকে বিপন্নতাবোধ গ্রাস করতে চাইলেও গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলা যায়, নিশ্চিতভাবেই জাতি হিসেবে বাঙালি মাটিতে পা রেখেই স্পর্শ করবে আকাশ।

তবু আমরা বৃষ্টির গান গাইব
ভিজব আষাঢ়ে, শ্রাবণে।
ধারা বেয়ে পড়বে সারা গা বেয়ে
ধুয়ে দিতে চাইবে যত কালো,
প্রাণিত করবে নিষ্প্রাণকে
আমরা চেষ্টা করব জাগতে
    নিশ্চিতভাবে জাগতে
    সারা দিন, সারাটি রাত।

।। সহায়ক গ্রন্থ ।।

১। হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য : ড. অতুল সুর – সাহিত্যলোক / প্রথম প্রকাশ – ১৯৮১।
২। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) : ড. নীহাররঞ্জন রায় – দে'জ পাবলিশিং / প্রথম প্রকাশ – ১৩৫৬।
৩। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য – এ.মুখার্জী / একাদশ সং/ ২০০৬।
৪। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / বিভিন্ন পর্ব / মডার্ন
৫। ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। বাঙালীর মানবধর্ম : ড. ভবতোষ দত্ত / মিত্র – ঘোষ পাবলিশার্স / প্রথম প্রকাশ – ১৪০৬।

....

সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনার বঙ্গীয় পথিকৃৎ : বিদ্যাসাগর

সবিতা মণ্ডল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে সমধিক খ্যাতিমান হলেও তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের কৃতী ছাত্র ও একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্য ছাড়াও তিনি বেদান্ত , স্মৃতি, অলংকার, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে কলেজের পুনর্গঠন প্রয়াসে সংস্কৃত পঠনপাঠনের বাধাসকল দূরীভূত করতে সচেষ্ট হন এবং নীরস ও স্মৃতিনির্ভর অনুশীলনকে শিক্ষার্থীদের কাছে রসগ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (নভেম্বর,১৮৫১) রচনা করেন এবং তা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করে কষ্টসাধ্য বিষয় আয়ত্তীকরণের ভার অনেকখানি লাঘব করেন। সেই সূত্র ধরে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' রচনার নেপথ্যে বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা বিদ্যার্থীদের কাছে তুলে ধরাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের পরিকল্পনা করে বিদ্যাসাগর আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধটি 'বেথুন সোসাইটি'তে বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেছিলেন। এই সোসাইটির উদ্যোগে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার আবির্ভাব ঘটলো, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর রচিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধ পাঠের মধ্যদিয়ে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ এ প্রসঙ্গে লিখেছিল, "বীটনসভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতবিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে। তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃতবিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"[১]

বিদ্যাসাগর রচিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধটি নিছক সংস্কৃতসাহিত্যের সমালোচনা নয়; এতে কালানুক্রমিক তথ্য বিন্যাসে সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা ফুটে ওঠে। যদিও তা সংক্ষিপ্ত, ক্রমবিকাশ নিরপেক্ষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় গ্রন্থের সামান্য পরিচয় মাত্র। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে এই অসম্পূর্ণতার কৈফিয়ৎ দিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এ রূপ গুরুতর প্রস্তাব যে রূপ সংকলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক কোনক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে, তদ্ গ্রন্থেরও প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষগুণ, বিচার করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন, কত শত গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হয় নাই। বীটন সোসাইটিতে এক ঘণ্টা মাত্র সময় প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, তদ্‌বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, এ রূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।" এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে, প্রস্তাবটি বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যাসাগর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে জেনেও এবং আত্মীয়মহলের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও প্রস্তাবটিকে বিস্তৃতরূপে পুনঃনির্মাণের প্রয়াস পাননি। সদিচ্ছার কথা সেই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করলেও উপযুক্ত অবকাশের অভাবে তা সম্পন্ন করতে না পেরে বক্তৃতাটিকেই অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে এটা দুর্ভাগ্য যে, বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক প্রয়াস সত্ত্বেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ ইতিহাস তাঁর হাতে রচিত হল না। তবে সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার উৎসমুখ খুলে গেল।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এর শিরোনামে স্পষ্টই দুটি ভাগ ধরা পড়ে। ১. সংস্কৃত ভাষা, এবং ২. সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র। প্রথমেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব এবং ঐশ্বর্য তথা সারল্য-মাধুর্য-লালিত্য প্রভৃতি গুণাবলি দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন; দেবভাষা হিসাবে তার আভিজাত্য এবং গ্রিক, ল্যাটিন, প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির সমগোত্রীয় ও সম্বন্ধযুক্ত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক-ল্যাটিনের যোগসূত্র নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সেই গুরুতর বিষয় ব্যক্ত করা অসম্ভব বলে তা এড়িয়ে গেছেন-

" বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এ রূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে

সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।" তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বাংলা ভাষার অক্ষমতা স্বীকার করে নিলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রসসাহিত্যের আলোচনায় বাংলা ভাষার পারঙ্গমতায় আস্থা রেখেছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা সাহিত্য সমালোচনায় হস্তক্ষেপ না করলেও সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে তৎপর ছিলেন। আচার্য ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে নাটক ছাড়াও অভিনয়শিল্প, নৃত্য, সঙ্গীত ও অলংকারশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতেই কাব্যের দুটি স্পষ্ট বিভাজনের কথা বলেছেন – 'দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্'। অর্থাৎ দৃশ্যত্ব ও কাব্যত্বভেদে কাব্য দুই প্রকার – ১. দৃশ্যকাব্য ও ২. শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য যা পাঠ ও শ্রুতিনির্ভর, আর দৃশ্যকাব্য যা অভিনেয় অর্থাৎ নাটক। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পতাত্ত্বিক অ্যারিষ্টটলের শিল্পের শ্রেণিকরণ পদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্যও স্মরণীয়। অ্যারিষ্টটল তাঁর 'কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থে অনুকরণের 'মাধ্যম', 'বিষয়', ও 'পদ্ধতি' – এই ত্রিসূত্রে শিল্পের শ্রেণিকরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সাহিত্যের শ্রেণিবিন্যাসটি অ্যারিষ্টটলীয় পদ্ধতিতে একটি ছকের সাহায্যে দেখা যেতে পারে –

সাহিত্য	মাধ্যম	বিষয়	পদ্ধতি
	ভাষা নির্ভর	আখ্যান ও আবেগ নির্ভর	নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি।

অ্যারিষ্টটলীয় পদ্ধতির সঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের আংশিক সাদৃশ্য মেলে। দৃশ্য ও শ্রব্যত্বভেদ আসলে পদ্ধতিগত শ্রেণিবিন্যাসেরই মাপকাঠি। বিদ্যাসাগর অবশ্য সাহিত্যের শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টটলীয় পদ্ধতির ত্রিসূত্রের পরিবর্তে সাহিত্যদর্পণকারের সূত্র মেনেই সংস্কৃত রসসাহিত্যের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র' প্রসঙ্গে প্রথমেই বিদ্যাসাগর রসসাহিত্যের বর্গীকরণের প্রয়াস পান। শিরোনামে 'সাহিত্য' শব্দের সঙ্গে 'শাস্ত্র' যোগ করে তিনি শাস্ত্রের মতো সাহিত্যকে নিয়মশৃঙ্খলে তথা বৈশিষ্ট্য-বৈগুণ্যে বাঁধতে চেয়েছেন। সংস্কৃত আলংকারিকদের পদাঙ্ক

অনুসরণ করে সাহিত্যকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন — শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। সাধারণভাবে আমরা জানি, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য হল কাব্যের দুটি মৌলবিভাগ। সুতরাং কাব্যের বিভাগ দুটিকে সাহিত্যশাস্ত্রের ভাগ বলে চিহ্নিত করায় 'কাব্য' সাহিত্যের শাখা না হয়ে সমার্থক হয়ে ওঠে। সংস্কৃতে সাহিত্য ও কাব্য সমার্থক বলেই বিবেচিত। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাচীন আলংকারিকদের মতো সচেতনভাবেই সাহিত্যশাস্ত্রকে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

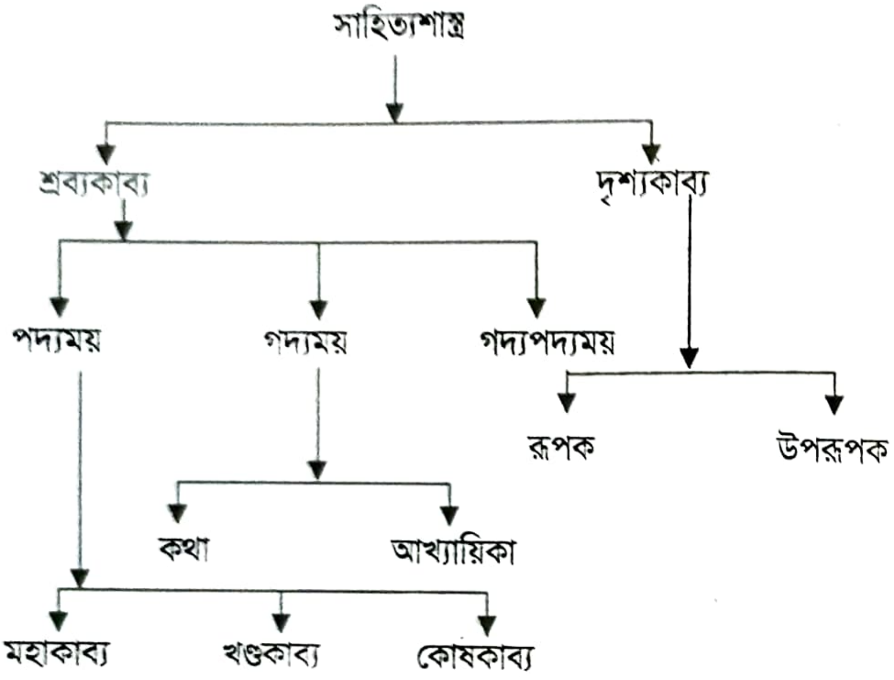

প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের অনুসরণে বিদ্যাসাগর শ্রব্যকাব্যকে পদ্যময়, গদ্যময় ও গদ্যপদ্যময় — এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এ প্রসঙ্গেও আমরা সচেতনভাবে অ্যারিস্টটলীয় শ্রেণিকরণের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। অ্যারিস্টটলের ত্রিসূত্রের প্রথম সূত্র 'অনুকরণের মাধ্যম' অর্থাৎ ভাষামাধ্যম এই বিভাজনের মূলভিত্তি। অতঃপর পদ্যময় কাব্যকে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় অ্যারিস্টটলীয় 'অনুকরণের পদ্ধতি'র সাদৃশ্য রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা গদ্যময়কাব্যকে 'কথা', ও 'আখ্যায়িকা' দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই বিভাজনরীতির সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় শ্রেণিকরণরীতির সাদৃশ্য মেলে না।

বিদ্যাসাগর যদিও এই বিভাজনকে মান্যতা দিতে চাননি। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে স্পষ্টতই বলেছেন – "গদ্যময় কাব্যকে আলংকারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যিক ও অকিঞ্চিৎকর।" গদ্যময় কাব্যের আলোচনায় তিনি সচেতনভাবেই এই বিভাজন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রাচীন আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্যের যে শ্রেণিকরণ করেছেন তা একান্তই বহিরাঙ্গিক, অ্যারিষ্টটলীয় শ্রেণিকরণের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক' ও 'উপরূপক' – এ বিভাজন করেন কিন্তু অ্যারিষ্টটল দৃশ্যকাব্য বা নাটকের অন্তরঙ্গ সংঘটনের ও আবেদনের ভিত্তিতে ট্রাজেডি ও কমেডিতে বিভক্ত করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যারিষ্টটলীয় শ্রেণিকরণ গ্রহণ করে ট্রাজেডি বা কমেডি হিসাবে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মূল্যায়ন করেননি। তবে তিনি প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের দৃশ্যকাব্যকে রূপক ও উপরূপক বিভাজন পদ্ধতিকে মান্যতা দেননি। আটপ্রকার রূপক ও অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের বৈলক্ষণ্য এমন অকিঞ্চিৎকর যে তাদের স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করাও কষ্টকর। বিদ্যাসাগর এই বিভাজনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি লিখেছেন, " আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যের এই যে অষ্টবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত। আলংকারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এমন সামান্য যে সেই অনুরোধে, দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দেশ করিলেই ন্যায়সঙ্গত হইত।"

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের অনুসরণ করলেও তাঁদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে দ্বিধা করেননি। সাহিত্য আলোচনার প্রতিকূল ও অসঙ্গত সিদ্ধান্ত সকলকে বর্জন করে সমালোচনাকে তিনি একালের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হন। আলংকারিকদের অনুসরণ করলেও তাঁদের প্রতি অন্ধ-আনুগত্য না দেখিয়ে যুক্তিবাদী মন ও মননের সাক্ষর রেখেছেন। উপরি-উক্ত যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় নাটকের কোন রূপ শ্রেণিকরণের প্রয়াস পাননি।

তবে স্বল্প পরিসরে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সমালোচনা করেছেন তা সারগর্ভ ও পরিণত সাহিত্যবোধের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের অনুসরণে প্রথমে মহাকাব্যের আলোচনায় পদার্পণ করা যেতে পারে।

১. মহাকাব্য : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "কোন দেবতা, অথবা সদ্বংশজাত অশেষ সদ্গুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিংবা এক বংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে।" অতঃপর মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেন, তা সূত্রাকারে নিম্নরূপ-

ক. মহাকাব্য নানা সর্গে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হবে।
খ. সর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক হবে।
গ. সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি বিস্তৃত হবে না।
ঘ. সর্গান্তে পরবর্তী সর্গের কাহিনির আভাস থাকবে।
ঙ. কোন এক ছন্দে রচিত সর্গের অন্তিমাংশ এক বা একাধিক ভিন্ন ছন্দে রচিত হবে।
চ. মহাকাব্যের অঙ্গীরস হবে বীররস কিংবা আদিরস। তবে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকবে।
ছ. কবি, বর্ণনীয় বিষয় কিংবা নায়কের নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে।

বিদ্যাসাগর 'সাহিত্যদর্পণ'কে মানদণ্ড করেই মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচ্য প্রবন্ধে নির্দেশ করেছেন। নির্দেশিত সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ কবিরাজ কথিত 'ক্ষত্রিয়োঽপি' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরাও যে মহাকাব্যের নায়ক হতে পারেন সেকথা বলেননি। রসপ্রসঙ্গে মূল বা অঙ্গীরস হিসাবে বিদ্যাসাগর আদি বা শৃঙ্গার এবং বীররসের উল্লেখ করলেও 'শান্ত' রসের কথা বলেননি। সাহিত্যদর্পণকার 'শান্তানাম্' – এই বহুবচনাত্মক শব্দের মধ্যে শান্তরস ছাড়াও অন্যরস বিশেষত করুণরসকে মহাকাব্যের অঙ্গীরসের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। কেননা, রামায়ণ-মহাভারত দুই ভারতীয় মহাকাব্য মূলত করুণরসাত্মক। তাই করুণরসের স্বীকৃতি ব্যতীত রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যোচিত গুণের অব্যাপ্তিদোষ প্রকট হয়ে পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্য তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে মহাকাব্যের আলোচনায় রামায়ণ-মহাভারতকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। এর কোন কৈফিয়ৎও তিনি আলোচ্য

প্রবন্ধে দেননি। সেদিক থেকে তাঁর প্রবন্ধটি অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট সন্দেহ নেই।

তবে বিদ্যাসাগর স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতকে বর্জন করে কেবল সাহিত্যিক মহাকাব্যসকল আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্যদর্পণকার কথিত নায়ক ও রস প্রসঙ্গ ছাড়াও মহাকাব্যের নাটকোচিত পঞ্চসন্ধি, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এই চতুর্বর্গের যে কোনটির প্রাধান্য, মহাকাব্যের শুরুতেই নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তুনির্দেশ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর বাহুল্যজ্ঞানে বর্জন করেছেন। অত্যাবশ্যক কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনি স্বনির্বাচিত কয়েকটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর নির্বাচনের তালিকায় স্থান পেয়েছে মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', মাঘের 'শিশুপালবধ', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', 'ভট্টিকাব্য', কবিরাজ পণ্ডিত রচিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। মোট আটটি মহাকাব্যকে তিনি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কালিদাসের 'রঘুবংশ'কেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলে উল্লেখ করেছেন। কালিদাসের কবিপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে বিদ্যাসাগর 'সরস্বতীর বরপুত্র' এবং 'কবিকুলগুরু' অভিধায় অভিষিক্ত কালিদাসকে তাঁর যোগ্য সম্মানন বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনা চমৎকারিণী, মনোহারিণী, হৃদয়গ্রাহিণী, সরল, মধুর ও ললিত। সাহিত্যগুণের সমস্ত বিশেষণই বিদ্যাসাগর কালিদাসের কবিপ্রতিভায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। স্বভাবোক্তি অলংকার ও উপমা প্রয়োগে তিনি অদ্বিতীয়। এই অলৌকিক কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েও কালিদাস বৈষ্ণবীয় বিনয়সুলভ মানসিকতায় 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের শুরুতেই লিখেছিলেন 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।'- কবিযশপ্রার্থী হওয়ার জন্য পাঠকবর্গের কাছে যিনি উপহাসাস্পদ হবেন বলে আশঙ্কা করেন, তিনি কাব্যের প্রতি কতখানি দায়বদ্ধ তা সহজেই অনুমেয়। বিদ্বোৎসাহী গুণগ্রাহী রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠরত্নের পদ তিনি প্রতিভার দিব্যজ্যোতিতে অলংকৃত করেছিলেন।

রঘুবংশের আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর কালিদাসের কবিপ্রতিভার প্রশংসাতেই সিংহভাগ ব্যয় করেছেন। রঘুবংশের মূল্যায়নে বিদ্যাসাগরের বিশ্লেষণী প্রতিভার তেমন পরিচয় মেলেনি। রঘুবংশের বিষয়ভিত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, উনিশটি সর্গে বিভক্ত 'রঘুবংশ' কাব্যে সূর্য্যবংশীয় নরপতি দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশ প্রমুখ-এর বর্ণনা অভিব্যক্ত হয়েছে,

যা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে আদ্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু কোথায় তা কোনগুণে সুন্দর তার সূক্ষ্মবিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস বিদ্যাসাগর পাননি। তবে পরিশেষে যারা কালিদাসের 'রঘুবংশ'কে শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলতে নারাজ পণ্ডিতদের 'সংস্কৃতব্যবসায়ী' অভিধায় চিহ্নিত করে কটাক্ষ করতেও পিছপা হননি। যথার্থ সমালোচনায় যা কাঙ্ক্ষিত নয়।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যকে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা না দিলেও অনেকাংশেই রঘুবংশের সমতুল বলে মন্তব্য করেছেন। সতেরটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যের কাহিনিতে আছে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান দুর্জয় তারকাসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, পার্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মাবেন, তিনি কার্তিকেয় দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুরকে বধ করবেন। কার্তিকের জন্মবৃত্তান্তই, কুমারসম্ভব কাব্যের মূলভিত্তি। সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ হলেও প্রথম সাতটি সর্গই প্রচলিত ও সর্বত্র অনুশীলিত। বাকি দশটি সর্গ কেন অপ্রচলিত ও বর্জিত তা নিয়ে বিদ্যাসাগর সমালোচকের সুচিন্তিত মতামত দান করেছেন।

ভারতবর্ষীয়রা পার্বতী ও শিবকে 'জগন্মাতা' ও 'জগৎপিতা' জ্ঞান করেন। সপ্তম সর্গে শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার বর্ণনা আছে। এখনকার ভাষায় যা 'মধুচন্দ্রিমা'। নবম সর্গে হরগৌরীর কৈলাসগমন এবং দশম সর্গে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত – এই তিনটি সর্গ প্রাকৃত নরনারীর মতোই কামকলা কৌতুহলে পূর্ণ, অশ্লীলতায় ভরপুর। জগন্মাতা ও জগৎপিতার প্রাকৃতপ্রণয় তথা বিহার বর্ণনা পাঠ করা অনুচিত ও দূষ্যজ্ঞানে সাধারণ মানুষ তা বর্জন করেছেন বলেই বিদ্যাসাগর মনে করেন। এমনকি, সংস্কৃত আলংকারিকেরাও পঠনের উপর অনৌচিত্য তকমা সেঁটে দিয়েছেন। এই মন্তব্যের অনেকখানি যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয়। একদা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় প্রাকৃত নরনারীর মতো অশ্লীলরূপে পরিবেশিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' পাঠক বর্জন করেছিল। অনাদরে আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা গোয়ালঘরের মাচা থেকে বসন্তরঞ্জন রায় উদ্ধার না করলে কালের কবলে কাব্যটি হারিয়ে যেতো। কেননা, তার আর কোন প্রতিলিপি আজও পাওয়া সম্ভব হয়নি। কালিদাসের কাল আরো সহস্রাধিক বৎসর আগে। পাঠকের চাহিদার কথা ভেবে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কুমারসম্ভব কাব্যের প্রতিলিপি করে থেমে গেলে বাকি অংশ স্বাভাবিক নিয়মেই অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা।

অনেক পাঠকের কাছেই কুমারসম্ভব তাই সাতসর্গের কাব্য হিসাবে পরিচিত।

কিন্তু কাব্যটির শেষ সাত সর্গ (একাদশ থেকে সপ্তদশ সর্গ) জুড়ে কার্তিকের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, যুদ্ধ ও তারকাসুর বধের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নেই। তবু তা বিলুপ্ত হয়েছে পূর্ববর্তী তিনসর্গের অনুসারী রূপেই। অশ্লীলতা দোষদুষ্ট তিনসর্গ বাদ দিয়ে কেন তা মূলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। বিদ্যাসাগরও দিতে পারেননি। তবে তিনি এ প্রসঙ্গে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। - কবিবন্ধু কুম্ভকার কবিপ্রদত্ত কুমারসম্ভবের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে কাঁচা সরার উপর রাখলে কবির প্রতীতি জন্মায় কাব্যটি কাঁচা হয়েছে। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি কাব্যটিকে ছিন্ন ছিন্ন করে ফেলেন। কুম্ভকার এতে মর্মাহত ও সঙ্কুচিত হয়ে অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাতটি সর্গ সংকলন করতে সক্ষম হন। বাকি ১০টি সর্গ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য কিংবদন্তী প্রমাণ নয়। এর উপর কিছুই নির্ভর করে না। যদিও অনেকেই এই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারেই লোপ পেয়েছে বলে মনে করেন। তবে বিদ্যাসাগর এই কিংবদন্তীকে 'অমূলক' বলে মনে করেছেন।

বঙ্গদেশে কুমারসম্ভব কাব্যের শেষভাগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা প্রক্ষিপ্ত। বিদ্যাসাগর এ প্রসঙ্গে লিখেছেন; "এই শেষভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া , এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারে না।" এই মন্তব্যে স্পষ্ট, বঙ্গদেশে প্রচলিত কুমারসম্ভবের শেষভাগ প্রক্ষিপ্ত তো বটেই, প্রক্ষিপ্তকরণের কারণ সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিত।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের উৎসমুখ নির্দেশ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ঘটনা বা বৃত্তান্তের ঐক্যসূত্রে শিবপুরাণের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি কোন কোন শ্লোকের অবিকল সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাসত্ত্বেও তিনি শিবপুরাণের অনুসরণে কালিদাস কুমারসম্ভবকাব্য রচনা করেছেন বলে স্বীকার করেননি। নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দুটি যুক্তি দিয়েছেন –

প্রথমত, আর সব পুরাণের মতো শিবপুরাণের রচয়িতা হিসাবে বেদব্যাসের নাম প্রচলিত হলেও পুরাণ সমুদায়ের রচনারীতি ও বিষয়ভিত্তি পরস্পরের থেকে এতটাই ভিন্ন যে, একই লেখকের বলে বিদ্যাসাগর সংশয় প্রকাশ করেন। শুধু রচয়িতার ক্ষেত্রেই নয়, একই কালে রচিত বলেও তিনি

মনে করেন না। অধিকাংশ পুরাণই তাঁর অর্বাচীন বলে মনে হয়। শিবপুরাণ সেই অর্বাচীন পুরাণদের একটি। কালিদাসের কবিত্ব সম্পর্কে তিনি এতটাই উচ্চমত পোষণ করেন যে, অন্য কোন গ্রন্থ থেকে কালিদাস কিছু গ্রহণ করতেই পারেন না। কালিদাসের কবিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি লেখেন, "শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন;"- এই অভিমতকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় যে যুক্তিটি দিয়েছিলেন, তা হল – শিবপুরাণের মতো যোগবাশিষ্ট গ্রন্থের সঙ্গেও কুমারসম্ভব কাব্যের শ্লোকের সাদৃশ্য মেলে। কিন্তু যোগবাশিষ্ট যে অর্বাচীন গ্রন্থ তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে কোন সংশয় নেই। সুতরাং শিবপুরাণও অর্বাচীন। শ্লোক-সাদৃশ্যের মূল কারণই হল কালিদাসের কুমারসম্ভবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপরিউক্ত গ্রন্থ দুটি লেখা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও হতে পারে, প্রাচীন যুগীয় সাহিত্যের কালচিহ্ন এতই অপ্রতুল যে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা শক্ত। বিশ্বাস ও অনুমানের উপর ভর করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। বিদ্যাসাগর সেই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে যুক্তির সহায়তা নিয়েছেন তা দুর্বল। কালিদাস মহাকবি, অনন্য প্রতিভার অধিকারী সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে পূর্বতন সাহিত্যের কিছুই তার গ্রহণীয় নয়, এমন হতে পারে না। একালের শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনিও কালিদাস থেকে অনেককিছু গ্রহণ করেছেন, তাকে আপন কবিত্বরসে জারিত করে নতুনতর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যিনি যতবড় কবি, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ততবেশি হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, যোগবশিষ্টের অর্বাচীনতা নিয়ে সংশয় না থাকলেও কুমারসম্ভবের সঙ্গে যোগবশিষ্টের মতো শিবপুরাণেরও সাদৃশ্য আছে বলে, শিবপুরাণও যোগবশিষ্টের মতো অর্বাচীন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। শিবপুরাণের অর্বাচীনতা প্রমাণ করতে হলে ঐ গ্রন্থের মধ্যেই তার সূত্র অন্বেষণ করতে হবে।

মহাকবি ভারবি কালের দিক থেকে কালিদাসের অনুজ এবং ভারবি রচিত সপ্তদশ সর্গ-সমন্বিত 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' কালিদাসের রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের তুলনায় কাব্যগুণে ন্যূন হলেও কবিত্বশক্তিতে ভাস্বর। কালিদাসের ন্যায় সরল

ও প্রাঞ্জল না হলেও প্রগাঢ় মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য এতে বিদ্যমান। কিন্তু স্বভাবোক্তি অলংকারে কালিদাস যেখানে সিদ্ধহস্ত, ভারবি তার অভাবহেতু কাব্যটিকে কোথাও কোথাও দুরূহ করে তুলেছেন। বিদ্যাসাগরের এই মূল্যায়ন যথার্থই। এই মূল্যায়নের পাশাপাশি তিনি 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যের বৃত্তান্তটিকে অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে 'কিরাতার্জ্জুনীয়'-এর বিষয়ভিত্তির আভাস দেওয়া ছাড়া এর কোনো ভূমিকা নেই।

মহাকবি মাঘ ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়'কে অনুসরণ করে বিংশতি সর্গ সমন্বিত মহাকাব্য 'শিশুপালবধ' রচনা করেন। কাব্যশেষে মাঘ কালিদাসের ন্যায় কবিকীর্তিলাভে অভিলাষী হয়ে 'হাস্যম্পদ' হওয়ার কথা না বললেও 'সুকবিকীর্ত্তিদুরাশায়াদঃ' বলে 'দুর্দশাগ্রস্ত' হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব মহাকাব্যদ্বয়ের পাশাপাশি মাঘের 'শিশুপালবধ'ও মহাকাব্যের সারিতে ঠাঁই পেয়েছে। তবে তিনি কালিদাসকে নয়, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কেই আদর্শ হিসাবে বরণ করেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধের বিষয়ভিত্তি স্বতন্ত্র হলেও প্রকরণগত সাদৃশ্য প্রচুর। বিদ্যাসাগর উল্লিখিত সাদৃশ্যসূত্রগুলি হল :

১. কিরাতার্জ্জুনীয়ে মহর্ষি ব্যাস অরণ্যচারী পাণ্ডবদের কর্তব্যের উপদেশ দিয়েছিলেন, শিশুপালবধেও তেমনি দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে কর্তব্য-কর্মের উপদেশ দেন।
২. কিরাতার্জ্জুনীয়ে যেমন যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ রয়েছে, শিশুপালবধেও তেমনি কৃষ্ণ-বলরাম-উদ্ধবের রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ ভাষা পেয়েছে।
৩. কিরাতার্জুনীয়ে তপস্যার্থে অর্জুনের হিমালয় পর্বতে অবস্থান, তেমনি শিশুপালবধে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থানকালে কৃষ্ণের রৈবতক পর্বতে অবস্থান।
৪. কিরাতার্জুনীয়ে হিমালয়ের যেমন বহুবিস্তৃত বর্ণনা ও বর্ণনাসংক্রান্ত শ্লোক অধিকাংশই যমকালঙ্কারকৃত তেমনি শিশুপালবধেও যমকালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে রৈবতক পর্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে।
৫. কিরাতার্জ্জুনীয়ে সুরাঙ্গনাদের বনবিহার, নায়ক সমাগম, বিরহ,

মান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে, শিশুপালবধেও তার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬ কিরাতার্জ্জুনীয়ে কিরাতরাজ অর্জুনের উত্তেজনার্থে তার নিকট দূত প্রেরণ করেন, শিশুপালবধেও তেমনি শিশুপাল কৃষ্ণের ভর্ৎসনার্থে তার নিকত দূত প্রেরণ করেছিলেন।

৭ কিরাতার্জুনীয়ের মতো শিশুপালবধ কাব্যেও সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রামের বর্ণনা আছে।

৮ কিরাতার্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোকের আশ্রয়ে যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি শিশুপালবধেও ঊনবিংশ সর্গে একইভাবে যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে।

৯. কিরাতার্জুনীয়ের ন্যায় শিশুপালবধেও প্রতিসর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে।

১০ কিরাতার্জুনীয়ে বর্ণিত কোন কোন ভাব অবিকল ভাবে ভিন্ন ছন্দে শিশুপালবধকাব্যে গৃহীত হয়েছে।

-এই সকল সাদৃশ্যের সূত্রে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, মাঘের 'শিশুপালবধ' ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকাব্যের পরবর্তীকালের রচনা।

ভারবির কিরাতার্জুনীয়ের সার্বিক অনুসৃতি সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'শিশুপালবধ' মহাকাব্যে মাঘের কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে বর্ণনা শুরুতে মনোহর হলেও অবসানে নিতান্ত নীরস হয়ে উঠেছে। পরিমিতিবোধের অভাবহেতু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনায় মহাকাব্যটি কুসুমিত হওয়ার পরিবর্তে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কখনো মনোহারী সুশ্রাব্য শব্দকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য অপ্রয়োজনীয় শ্লোক সংযোগেও দ্বিধা করেননি। তবে মহাকাব্যোচিত গুণ যথা প্রগাঢ়তা, ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য সমস্তই শিশুপালবধ কাব্যের মধ্যে আছে। তবে মাঘের কবি-প্রতিভার মধ্যে বিদ্যাসাগর 'সহৃদয়তা'র অভাব অনুভব করেছেন এবং সহৃদয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেন, "যদি তাঁহার (মাঘের), কালিদাস ও ভারবির ন্যায় সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত সন্দেহ নাই।" বিদ্যাসাগর শিশুপালবধ মহাকাব্যকে উল্লিখিত দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের অঙ্গীকার সত্ত্বেও তাকে 'সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য' বলে মানতে পারেননি। কেবল তার সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচন করে দেখিয়েছেন।

উৎকর্ষের বিচারে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয়ের পরই শিশুপালবধ মহাকাব্যের স্থান বলে স্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর দেবপ্রসাদে শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তি লাভের কিংবদন্তীর উল্লেখ করলেও তাঁর রচিত 'নৈষধচরিত'কে উৎকৃষ্ট মহাকাব্যের সারিতে উল্লিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের পাশাপাশি রাখতে পারেননি। সংশয়াতীত ভাবে শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তি অসাধারণ কিন্তু সেই শক্তি অনুপ্রাসবাহুল্যে ও অত্যুক্তিবচনে ব্যয়িত হয়েছে। অনুপ্রাসের প্রাচুর্য গীতিলালিত্য ও সুরমাধুর্যের পরিবর্তে কর্কশ ও অত্যুক্তি উৎকট রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় নৈয়ায়িক মহাশয়েরা 'উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।' বলে নৈষধচরিতের সর্বাধিক প্রশংসা ও কাব্যটিকে 'সর্বপ্রধান মহাকাব্য' বলে অভিহিত করলেও বিদ্যাসাগর তা খণ্ডন করেন। নৈষধচরিতের কোন কোন অংশ অত্যুৎকৃষ্ট হলেও সর্বত্র তা পরিব্যাপ্ত নয়। সার্বিকভাবে নৈষধচরিত মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য হওয়ায় কাব্যের 'উপাদেয়ত্ব' অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বাবিংশতি সর্গ সমন্বিত সুবৃহৎ এই মহাকাব্য পাঠকের চিত্তে অতিশয়োক্তি হেতু হেয়ত্ব, বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি জন্মে। যদিও বিদ্যুৎ-চমকের মতো কোন কোন অংশ পাঠে সহৃদয় পাঠক প্রীত ও চমৎকৃত হয়ে থাকে।

দ্বাবিংশতি সর্গ সমন্বিত 'ভট্টিকাব্য'-এর কবিনাম পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর প্রথমে কবিনাম বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রাচীন টীকাকার জয়নন্দন কাব্যের নামকরণের সূত্র ধরেই মন্তব্য করেন যে, ভট্টিকাব্যের কবির নাম ভট্ট। কিন্তু টীকাকার ভরতমল্লিক কাব্যটিকে ভর্তৃহরি প্রণীত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে বলিষ্ঠ কোন যুক্তি দেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর যুক্তি দিয়ে ভরতমল্লিকের অভিমত খণ্ডন করেছেন। ভট্টিকাব্যের শেষে লিখিত হয়েছে –

> কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
> শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
> কীর্ত্তিরতো ভবতান্ন পশ্য তস্য
> ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো হত প্রজানাম্।।

-অর্থাৎ বলভীপতি রাজা নরেন্দ্রের রাজধানীতে বসে কবি ভট্টিকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু কিংবদন্তী এই, যে ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। তিনি রাজা হলে অন্য কোন রাজার রাজধানীতে বসে কাব্যরচনার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারেনা। উদ্ধৃত শ্লোকটি টীকাকার ভরতমল্লিকের চোখে পড়েনি। তিনি

এই পংক্তি চতুষ্টয়ের টীকাও রচনা করেননি। যদি তিনি দেখতেন তবে ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলে এমন অযৌক্তিক মন্তব্য করতেন না বলেই বিদ্যাসাগরের অভিমত। সুতরাং ভট্টিকাব্য যে ভট্টি নামক কবির রচিত তা প্রাচীন আলংকারিক জয়নন্দনের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন।

ভট্টিকাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তির প্রমাণ মেলে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে হৃদয়গ্রাহী শরৎ-বর্ণনা আছে। সৌন্দর্যের স্ফুলিঙ্গ কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাব্যটি যে কবিত্বগুণে ভাস্বর হয়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ- কাব্যের অভিপ্রায়। কবি মহাকাব্যোচিত ঔৎকর্ষ সৃষ্টির পরিবর্তে ব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শনে সার্বিক প্রয়াস পেয়েছিলেন। ফলে তা অনেকাংশেই কাব্যগুণরহিত নীরস ও কর্কশ হয়ে উঠেছে। অথচ ভট্টিকাব্যের উৎকৃষ্ট মহাকাব্য হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল। কবি কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করলে তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারত বলেই বিদ্যাসাগর মনে করেন।

দ্ব্যর্থ ভাষায় রচিত ত্রয়োদশ সর্গ সমন্বিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' মহাকাব্যে কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব ও পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনি বর্ণনা করে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। একই শ্লোকে দ্বি-অর্থের দ্বারা দুটি স্বতন্ত্র কাহিনির বর্ণনা সংস্কৃত মহাকাব্য রচনার ধারায় অভিনব প্রয়াস সন্দেহ নেই। কবিরাজ পণ্ডিত জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেব ওরফে আদিসূরের নির্দেশে উৎসাহিত হয়ে 'রাঘবপাণ্ডবীয়' মহাকাব্য রচনা করেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য কবিরাজ পণ্ডিতকে নাম না বলে উপাধি বলতে চান। উপাধির দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় তিনি নামের পরিবর্তে 'রাঘবপাণ্ডবীয়' মহাকাব্যে উপাধি ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর কবিপ্রতিভার মূল্যায়নে কবি যে তাঁর উপাধির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্ব্যর্থ ভাষায় রচিত হলেও রাঘবপাণ্ডবীয় উপাদেয় হয়ে ওঠেনি। সেই কারণেই মহাকাব্যটি জনসমাজে বিশেষ প্রচারলাভ করেনি।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাঙালি রচিত সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য। পরম বৈষ্ণব জয়দেব প্রগাঢ় ভক্তিযোগে এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছেন। রাধার মানভঞ্জনার্থে কৃষ্ণের অনুনয় বর্ণনা করতে গিয়ে 'মম শিরসি মণ্ডনং' পর্যন্ত লিখে আর ভাবতে পারছেন না, তখন গোবিন্দ স্বয়ং জয়দেবের বেশ ধারণ করে এসে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবীয় এই কিংবদন্তীর গুরুত্ব বৈষ্ণবভক্তদের কাছে অনেকখানি, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে

বিদ্যাসাগর জয়দেবের রচনা বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করেও কবিত্বশক্তির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছেন। গীতগোবিন্দ সঙ্গীতময় গীতিলালিত্যে ভরপুর, মধুর, কোমল ও মনোহর। কিন্তু জয়দেবের কবিপ্রতিভা ভবভূতি প্রমুখের সমতুল নয়।

তবে বঙ্গদেশের কবি জয়দেব বৈষ্ণবীয় সমাজে বিপুল সমাদরে গৃহীত হয়েছেন। জয়দেবের বাসস্থান বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের স্মরণার্থে প্রতিবছর পৌষমাসে জয়দেবের মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যদিয়ে তা প্রমাণিত হয়।

২. খণ্ডকাব্য : বিদ্যাসাগর খণ্ডকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে আলংকারিকদের অভিমতের ভিত্তিতে বলেন-

ক. কোন একটি বিষয় অবলম্বনে রচিত নাতিদীর্ঘ কাব্য। অর্থাৎ খণ্ডকাব্যের সর্গসংখ্যা কখনোই মহাকাব্যের ন্যায় অষ্টাবিধ হবে না।

খ. খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত নাও হতে পারে।

গ. খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত খণ্ডকাব্যের ধারায় কালিদাসের 'মেঘদূত'কেই বিদ্যাসাগর 'সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলে মন্তব্য করেছেন। একশত আঠারোটি শ্লোকে সমাপ্ত ক্ষুদ্রকাব্য 'মেঘদূত' অলৌকিক কবিত্বগুণে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের পত্নীবিরহে ব্যাকুল হয়ে মেঘকে দূত রূপে প্রিয়ার কাছে প্রেরণ এক রোমান্টিক ভাবাবেগ, যার মধ্যে বন-উপবন-নদ-নদী-গ্রাম-শহর-দেবালয় প্রভৃতির বিস্তৃত ও মনোরম বর্ণনা ধরা পড়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে কালিদাসের কবিপ্রতিভার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ছয় সর্গে বিভক্ত 'ঋতুসংহার' খণ্ডকাব্যে কালিদাস ছ'টি খণ্ডে ছ'টি ঋতুর বর্ণনা করেছেন। কালিদাসের অন্যান্য রচনার তুলনায় 'ঋতুসংহার' কাব্যগুণে ম্লান। কোন কোন সমালোচক কাব্যগুণের ন্যূনতা হেতু ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচিত নয় বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মনে করেন, সহৃদয়সামাজিকের কাছে কালিদাসের কবিপ্রতিভা ও অন্যান্য রচনার সমুদায় গুণ ঋতুসংহারেও প্রতিভাত হয়। 'গ্রীষ্ম' ঋতুর বর্ণনায় বিদ্যাসাগর সমধিক মুগ্ধতাকে প্রকাশ করেছেন।

কালিদাস যমক অলংকারে 'নলোদয়' নামে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন। অলংকারের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়ায় কাব্যটি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির প্রকাশে সফল হয়নি। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ঘটকর্পর-এর গর্ব খর্ব করবার জন্য তিনি 'নলোদয়' কাব্যটি রচনা করেন। কিংবদন্তীর সত্য-মিথ্যা যাই হোক, এই কাব্যের দ্বারা যমক অলংকারে কাব্যরচনার যে গৌরব ঘটকর্পরের ছিল , তা তিনি খর্ব করতে সক্ষম হয়েছেন।

একশত শ্লোকে রচিত ময়ূরভট্টের 'সূর্যশতক' খণ্ডকাব্যে সূর্যমণ্ডল, তার কিরণ, অশ্ব ও সারথির স্তব বর্ণনা করেছেন। বিদ্যাসাগর মনে করেন এই খণ্ডকাব্যে ময়ূরভট্টের কবি-প্রতিভার যে স্ফূরণ ঘটেছে, তা 'বিষয়ান্তরে' প্রযুক্ত হলে আরো উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হতে পারতো। 'বিষয়ান্তর' বলতে কী জাতীয় বিষয় তা বিদ্যাসাগর স্পষ্টরূপে কিছু বলেননি। তবে তাঁর বক্তব্যের অভিমুখ হল তাঁর প্রতিভার চরমতম বিকাশের উপযুক্ত বিষয় তিনি নির্বাচন করতে পারেননি।

৩. কোষকাব্য : একটি বাক্যে বিদ্যাসাগর কোষকাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে লিখেছেন, 'পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।' অমরুশতককে বিদ্যাসাগর সর্বোৎকৃষ্ট কোষকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। অমরুর রচনাগুণকে তিনি কালিদাসের কাব্যরসের সমতুল বলে উল্লেখ করেছেন। অতিপ্রাচীন এই কাব্যটি আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু টীকাকার আদিরসাত্মক হলেও কাব্যটিকে শান্তরসাত্মক বলে ব্যাখ্যা করেন, যা বিদ্যাসাগরের মতে অযৌক্তিক।

শিহ্লণ প্রণীত শান্তরসাত্মক কোষকাব্য হল 'শান্তিশতক'। বিদ্যাসাগর শিহ্লণের কবিত্বকে উত্তম ও কাব্যটিকে উৎকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেন। ভর্তৃহরি রচিত কোষকাব্য 'নীতিশতক', 'শৃঙ্গারশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক'। এই ত্রয়ী কোষকাব্যের মধ্যে নীতিশতককে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই তিন শতক কবি ভর্তৃহরির জীবনচর্যা তথা অভিজ্ঞতার ফসল বলেই অনেকে মনে করেন।

গোবর্ধন রচিত সপ্তশত শ্লোক সমন্বিত 'আর্যাসপ্তশতী' উৎকৃষ্ট কাব্য বলে বিবেচিত । গ্রন্থটির সারল্য ও মধুরতার প্রশংসা করেছেন বিদ্যাসাগর। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গেই গোবর্ধন আচার্যের প্রশংসা করে লিখেছেন,

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্ধন
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।।

'আর্যাসপ্তশতী' কবির নামানুসারে 'গোবর্ধনসপ্তশতী' নামেও আখ্যাত হয়ে থাকে।

৪. গদ্যকাব্য : ইতোপূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পদ্যময় কাব্য হিসাবে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের আলোচনার শুরুতে তাদের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু গদ্যকাব্য আলোচনায় তিনি সরাসরি কাব্যমধ্যে প্রবেশ করেন। গদ্যকাব্যের ভাষামাধ্যম গদ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বিষয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্টরূপে কিছু উল্লেখ করেননি। কাদম্বরী বাণভট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বিদ্যাসাগর বাণভট্টকে 'মহাকবি' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কাদম্বরী'কে গদ্যে লেখা মহাকাব্য আখ্যায় ভূষিত করেননি। বাণভট্ট কারুণ্য, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য সৃজনে উপযুক্ত শব্দচয়নে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহাশ্বেতার উপাখ্যান কাদম্বরীর সর্বোৎকৃষ্ট অংশ বলে বিদ্যাসাগরের কাছে বিবেচিত হয়েছে। তবে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘসমাসঘটিত অতিদীর্ঘ বাক্য কাব্যটিকে অনেকাংশে নীরস ও দুরূহ করে তুলেছে। বাণভট্টের কবিত্বশক্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী না হওয়ায় কবিপুত্র অসমাপ্ত কাদম্বরী সম্পূর্ণ করেন কিন্তু তা শিল্পগুণান্বিত হয়ে ওঠেনি।

আচার্য দণ্ডী প্রণীত 'দশকুমারচরিত' কাব্যগুণে 'কাদম্বরী'র মতো উৎকৃষ্ট না হলেও ভাষামাধ্যম রূপে গদ্য প্রশংসার দাবি রাখে। 'দশকুমারচরিত' কাব্যশিরোনাম দশকুমারের জীবনালেখ্যর প্রতি নির্দেশ করলেও কাব্যটিতে আসলে আটকুমারের জীবনালেখ্য বর্ণিত হয়েছে। আদি ও অন্ত অসংলগ্ন। ফলে কাব্যটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। তবে কাব্যটির পূর্বপঠিকা নামে যে উপক্রমণিকা রচিত হয়েছে তাতে পূর্ণতার নিমিত্ত দুই কুমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তা দণ্ডীর স্বরচিত বলে প্রচলিত হলেও 'পূর্বপঠিকা' অংশটি যে প্রক্ষিপ্ত তাতে সন্দেহ নেই। উপক্রমণিকার মতো দশকুমারচরিতের সঙ্গে একটি পরিশিষ্টও সংযোজিত ছিল, যা চক্রপাণি দীক্ষিত রচিত বলে জানা যায়। কিন্তু তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। 'দণ্ডী' গ্রন্থকারের নাম না হয়ে 'উপাধি' হওয়ায় যুক্তিযুক্ত বলে অনেকের মতো বিদ্যাসাগরও মনে করেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যারা পর্যটনেই কালাতিপাত করেন; বর্ষাকালে তা ক্লেশকর বলে কোন ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থান করেন। সেই অবস্থানকালেই আচার্য দণ্ডী 'দশকুমারচরিত'

রচনা করেছিলেন। রচনা কালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বররুচির ভাগ্নে সুবন্ধু 'বাসবদত্তা' নামে একটি গদ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। কালের দিক থেকে তিনি বাণভট্টের পূর্বসূরি এবং গদ্যকাব্যের তিনিই পথিকৃৎ। বাণভট্ট তাঁর উদ্ভাবিত এই কাব্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন। সুবন্ধু রাজকুমার কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার যে বৃত্তান্ত রচনা করেছেন, তাতে নৈপুণ্যের ছাপ থাকলেও কবিত্বশক্তির অভাবে 'বাসবদত্তা' উৎকৃষ্ট কাব্য হয়ে উঠতে পারেনি।

৫. গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য : চম্পূকাব্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কোন মন্তব্য করেননি। তবে উল্লেখযোগ্য কোন মহৎ কবি চম্পূকাব্য রচনা করেননি বলেই জানিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যসাগরে তিনি মাত্র সাতটি চম্পূকাব্য কুড়িয়ে পেয়েছেন এবং সেগুলির মধ্যে দেবরাজ রচিত 'অনিরুদ্ধ চরিত' কেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। তিনি দেবরাজের কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির প্রশংসা করলেও কাব্যবিচারে অবতীর্ণ হননি। অতঃপর তিনি ভোজদেবের 'চম্পূরামায়ণ', চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী', অনন্তভট্টের 'চম্পূভারত', রামনাথের 'চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ' এবং রূপ গোস্বামীর 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' ও ভানুদত্তের 'কুমারভার্গবীয়' মোট সাতটি চম্পূর নামোল্লেখ করেছেন।

৬. দৃশ্যকাব্য : দৃশ্যকাব্য শ্রাব্যও বটে, দৃশ্যও বটে। তবে দর্শনই এ কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্কৃত আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি ভাগ নির্দেশ করলেও বিদ্যাসাগর তাদের বিভেদ লক্ষণ সামান্য জ্ঞান করে সমুদায় দৃশ্যকাব্যকে নাটক নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সর্বাধিক দশ অঙ্ক পর্যন্ত নাটক প্রসারিত হয়ে থাকে। নাটক মূলত গদ্যভাষা নির্ভর শিল্প। তবে শ্লোকের অন্তর্ভুক্তি থাকতে পারে। নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার প্রমুখের মাধ্যমে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়ে থাকে। নাট্যসংলাপে দ্বিমাত্রিকতা থাকতে পারে। দেবতা, রাজন্যবর্গ ও উচ্চবংশীয় রাজপুরুষেরা সংস্কৃতভাষী এবং নারী, শিশু, অন্ত্যজ মানুষেরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে। বীর, করুণ অথবা আদিরস নাটকের অঙ্গীরস হয়ে থাকে।

আচার্য ভরত সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা। তিনি নাকি দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্সরাদের দ্বারা অভিনীত নাট্যের উপদেষ্টাও বটেন। বিদ্যাসাগর এই জনশ্রুতির প্রবণতাকে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, সমস্তই স্বয়ং দেবতা কিংবা মুনিদের দ্বারা রচিত। আচার্য ভরতও মুনি বলে আখ্যাত। বিদ্যাসাগর নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতা বোঝাতেই সার্বিক প্রবণতার নির্দেশ করেছেন।

বিদ্যাসাগর কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটককেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেছেন। কালিদাসের অলৌকিক কবিপ্রতিভার চরম প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'ই প্রথম ভারতীয় সাহিত্য যা বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। স্যার উইলিয়াম জোন্স এই নাটকের দ্বারা অভিভূত হয়ে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের অনুবাদ পড়ে গ্যেটে শকুন্তলার যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, বিদ্যাসাগর তা স্মরণ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে গ্যেটের সমালোচনার তাৎপর্য ধরা পড়েনি।

কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' শকুন্তলার মতো সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও উর্বশীর বিরহে কাতর পুরুরবার বনে বনে ভ্রমণের যে ছবি কালিদাস অঙ্কন করেছেন, তা খুবই মনোহর বলে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কালিদাসের রচিত প্রথম নাটক বলে বিবেচিত। নাটকটি সুন্দর হলেও শিল্পগুণে শকুন্তলা কিংবা বিক্রমোর্বশীয়র সমকক্ষ নয়।

ভবভূতি 'মহাবীরচরিত', 'উত্তরচরিত', 'মালতীমাধব' তিনটি নাটক রচনা করেন। ভবভূতির নাটক মাধুর্যময় ও কোমলতার জন্য যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি সংযমী হওয়ায় অর্থের গাম্ভীর্য কাব্যকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। তরলতা ভবভূতির নাটককে গ্রাস করতে পারেনি। তবে সমাসবহুল শব্দের ব্যবহারে গাম্ভীর্য যেমন এনে দিয়েছে, তেমনি কোথাও কোথাও নাটককে দুরূহ করে তুলেছে।

'মহাবীরচরিত' বীররসাত্মক নাটক। কিন্তু নাটকীয় গুণের অভাব নাটকটির সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। 'মহাবীরচরিত'-এর মতো 'উত্তরচরিত' নাটকটিও ভবভূতি রামচন্দ্রকে নিয়ে রচনা করেছেন। এই নাটক রামচন্দ্রের কারুণ্য, রচনার মাধুর্য ও গাম্ভীর্যগুণে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর মনে করেন, 'উত্তরচরিত' শ্রেষ্ঠ করুণরসাত্মক নাটক। ভবভূতির 'মালতীমাধব' আদিরসাত্মক নাটক। নাট্যকার স্বয়ং এই নাটকটির উৎকর্ষ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ও শ্লাঘা বোধ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে 'মালতীমাধব'কে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কালিদাসের 'শকুন্তলা' কিংবা শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়। আদিরসাত্মক নাটক হিসাবে বিদ্যাসাগর কালিদাসের শকুন্তলাকেই শ্রেষ্ঠ মনে

করেন। এমনকি, ভবভূতির আত্মশ্লাঘা সত্ত্বেও 'মালতীমাধব'কে ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক বলতে নারাজ। তাঁর মতে 'উত্তরচরিত'ই ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক।

শ্রীহর্ষ 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নামে দুটি নাটক রচনা করেন। চার অঙ্কে সমাপ্ত 'রত্নাবলী'র আখ্যানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের পর বিদ্যাসাগর ঔৎকর্ষের বিচারে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও ভবভূতির 'উত্তরচরিতে'র পর 'রত্নাবলী'র স্থান নির্দেশ করেছেন। ঔৎকর্ষের মূলে কৌশল ও কবিত্ব নিহিত রয়েছে বলে জানালেও তিনি তা বিশ্লেষণ করে দেখাননি। 'নাগানন্দ'ও তাঁর মতে উত্তম কিন্তু 'রত্নাবলী' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। অতঃপর তিনি রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা হিসাবে শ্রীহর্ষের নিঃসংশয়ত্ব প্রদানে তৎপর হন। জনশ্রুতি আছে কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ ধাবক নামক এক কবিকে অর্থপ্রদানে সন্তুষ্ট ও সম্মত করে তাঁর রচিত 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নিজনামে প্রচলন করেন। আলংকারিক মম্মটভট্ট এই জনশ্রুতিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কহ্লণ রচিত রাজতরঙ্গিণীর সাক্ষ্যে 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নাটক দুটি যে শ্রীহর্ষের রচনা, তা নির্দেশ করেছেন। তিনি একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নাটক দুটি রচনা করেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে ধাবকের নাম পাওয়া যায়, সুতরাং তা বিক্রমাদিত্যের সময়কাল বা তার পূর্ববর্তীকালকে নির্দেশ করে। সুতরাং রত্নাবলী ও নাগানন্দ কবি ধাবক রচিত বলে যে জনশ্রুতি এবং মম্মটভট্ট উল্লেখ করেছেন, তা অমূলক।

'মৃচ্ছকটিক' সংস্কৃত ভাষায় রচিত আদি নাটক বলে বিদ্যাসাগর মনে করেন। নাট্যকার শূদ্রক সৎ ও প্রবীণ। বিক্রমাদিত্যের সময়কালের পূর্বে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে অংশবিশেষের ঔৎকর্ষের প্রমাণ মিললেও তা সর্বাংশে দৃষ্ট হয়না। 'মৃচ্ছকটিক' 'শকুন্তলা', 'উত্তরচরিত' ও 'রত্নাবলী'র মতো শিল্পগুণান্বিত হয়ে ওঠেনি। প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার হিসাবে শূদ্রকের নাম উল্লিখিত হলেও সমুদায় বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত দোষদুষ্ট বলে মনে হয়। শূদ্রকের জীবন ও অগ্নিতে আত্মবিসর্জনের যে ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে, তা কখনোই সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে এটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। শূদ্রকের মৃত্যুর পর সংযোজিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রস্তাবনা ও নাট্যবিষয় দুই স্বতন্ত্র লেখকের বলে মানতে চাননি। কেননা, এ জাতীয় দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। ফলে সিদ্ধান্ত নেন নাটকটি হয়তো অন্য কোন ব্যক্তির রচিত।

বিশাখদত্ত প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস'কে বিদ্যাসাগর 'অত্যুত্তম' নাটক বলে অভিহিত করেন। তবে নাটকটি প্রাঞ্জল ও লালিত্যময় হয়ে ওঠেনি। নন্দবংশকে ধ্বংস করে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু নন্দের প্রভুভক্ত অমাত্য রাক্ষসকে চাণক্য অসাধারণ কৌশলে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই কাহিনি নিয়েই 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটি রচিত হয়েছে।

ভট্টনারায়ণ প্রণীত 'বেণীসংহার' নাটকটি বীররসাশ্রিত। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত। ভট্টনারায়ণ রাজা আদিশূরের আমলে কান্যকুব্জ থেকে গৌড়বঙ্গে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের একজন বলে কিংবদন্তী আছে। 'বেণীসংহার' কাব্যগুণে পূর্বোক্ত নাটকগুলির সমকক্ষ না হলেও নাট্যলক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নাট্যসংক্রান্ত আলোচনায় 'বেণীসংহার' নাটক থেকে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এই 'বেণীসংহার' বিদ্যাসাগর আলোচিত শেষ নাটক। বিরাশিখানা সংস্কৃত নাটকের নাম পাওয়া গেলেও মাত্র তেত্রিশটি নাটক বাস্তবে পাওয়া গেছে। দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত নাটকগুলি ছাড়াও 'কুন্দমালা', 'উদাত্তরাঘব', 'বালরামায়ণ' ইত্যাদি নাটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকেই বিদ্যাসাগর সেগুলিকে উৎকৃষ্ট নাটক বলেই মনে করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার অজুহাতে সেগুলির আলোচনায় পদার্পণ করেননি।

বিদ্যাসাগর কাব্যবৈলক্ষণের তুচ্ছতাহেতু গদ্যকাব্যকে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার প্রয়াস পাননি। তবে 'উপাখ্যান' শিরোনামে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের কাছে সেগুলি 'কাব্য' হিসাবে স্বীকৃত হলেও বিদ্যাসাগর সেগুলিকে কাব্যনামে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত। এগুলি গদ্য, পদ্য কিংবা গদ্যপদ্যময় নীতিশিক্ষামূলক শিশুপাঠ্যের নিমিত্ত রচিত। মনুষ্য ও পশুপক্ষীকে অবলম্বন করে রচিত লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত সকলকেই বিদ্যাসাগর 'উপাখ্যান' শিরোনামে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মতে উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর'।

'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে মনুষ্য ও পশুপক্ষীকে অবলম্বন করে যে নীতিশিক্ষামূলক কাল্পনিক কাহিনি বিবৃত হয়েছে, তার কথক বিষ্ণুশর্মা এবং শ্রোতা রাজপুত্রগণ। ইউরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে ইউরোপ ও আরব-পারস্যে

প্রচলিত উপাখ্যান জাতীয় গানগল্পের উৎসমূল বলে উল্লেখ করেছেন। মাধুর্যহীন, চাতুর্যহীন, সরল, রচনারীতিই এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। তবে কাব্যগুণবর্জিত ও লিপিপ্রমাদগ্রস্থ হওয়ায় পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তা তেমন প্রসারিত হয়নি।

'হিতোপদেশ' পঞ্চতন্ত্রের সারসংকলন মাত্র। পঞ্চতন্ত্রের দোষগুণ সবই হিতোপদেশে বর্তমান। তবে রচনারীতিতে নানাবিধ প্রমাণাদি দৃষ্টান্ত সহযোগে সংযোজিত হওয়ার প্রবণতা হিতোপদেশকে অনেকখানি গাম্ভীর্য দান করেছে। কোথাও কোথাও তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ায় উৎকটত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। বালকদিগের প্রতি নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্য গ্রন্থমধ্যে ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোথাও আদিরসাত্মক কাহিনি ঢুকে পড়েছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ কোন গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়নি। বিষ্ণুশর্মাকে অনেকে গ্রন্থকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মনে করেন বিষ্ণুশর্মা বক্তা বলেই তারা ভ্রমবশত বিষ্ণুশর্মাকে গ্রন্থকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে লল্লুলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিত প্রণীত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর প্রমাণের অভাবে সেই অভিমতকেও খারিজ করে দিয়েছেন।

'কথাসরিৎসাগর' সোমদেব ভট্ট প্রণীত বৃহৎ পুস্তক। কাশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য সোমদেব এই উপাখ্যান রচনা করেছিলেন বলে গ্রন্থশেষে উল্লেখ করেছেন। এই তথ্য থেকে বিদ্যাসাগর মনে করেন, গ্রন্থটি অষ্টম শতকে রচিত হয়েছিল। আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত কথাসরিৎসাগর 'বৃহৎকথা' নামক অতি বিপুল গ্রন্থের সার সংকলন মাত্র। তবে অলৌকিক ও অদ্ভুত বিষয় অবলম্বনে রচিত উপাখ্যানগুলি এক সময়ে মনোহর ছিল সন্দেহ নেই। তবে ঐশ্বর্য আজ আর পাঠককে চমৎকৃত করে না।

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধের উপসংহারে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষাচর্চার চারটি সুফলের উল্লেখ করেন।

ক. সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের ফলেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অন্যান্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপ পরিজ্ঞান ও মর্মোদ্ভেদে সমর্থ হয়েছেন। ভাষার পাঠের মধ্যদিয়েই কে কোন দেশের আদিম নিবাসী, কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশ থেকে তারা অন্যত্র গমন করে ইত্যাদি মানবজাতির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ভাষাচর্চার মাধ্যমে জানা যায়। ডাক্তার ম্যাক্সমুলার সেইজন্য সংস্কৃত ভাষাকে

'সকল ভাষার ভাষা' বলে অভিহিত করেন। তাই মানবজাতির ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার চর্চা খুবই প্রয়োজন।

খ. ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার শিক্ষার পূর্ণতা সংস্কৃত ভাষার পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা ছাড়া সম্ভব নয়। তবে পুরাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ইংরাজি ভাষা থেকে প্রাদেশিক ভাষায় সংকলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ. সংস্কৃত ভাষানির্ভর বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে অতীত ভারতের সমাজ সংস্কৃতি, পুরাকালিক ইতিহাস জানবার অন্য কোন পথ নেই।

ঘ. সাহিত্যের যে চরম উদ্দেশ্য আমোদ বা আনন্দলাভ ও উপদেশ দান, তা সংস্কৃতসাহিত্যেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে তা ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা পরিহার্য হওয়ায় বিদ্যাসাগর প্রবন্ধের শেষে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। বাঙালিও সংস্কৃত থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদেশি ভাষা-সাহিত্য চর্চায় আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছে। বাঙালির এই আত্মঘাতী প্রয়াসে বাঙালিত্বের সংকট ঘনীভূত হবে। খাঁটি বাঙালি বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সংকটমুক্তির পথ অন্বেষণ করতে হবে।

।। তথ্যসূত্র ।।

১. 'বেথুন সোসাইটি-২'- যোগেশচন্দ্র বাগল। পরিষদ্ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ৬৩ বর্ষ, পৃ.৯৩।

বি.দ্র. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' প্রবন্ধ থেকে বিদ্যাসাগরের সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

....

'আমি নারী আমি মহিয়সী' অনবদ্য বঙ্গরমণী

অমিত দে

জীবন নদীর মতো বয়ে চলে। সময়ের সাথে সাথে যুগ ও জীবন দুটোই বদলায়। প্রাচীন যুগ থেকে ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীর জীবন পাল্টেছে, নারীর প্রতি সমাজের মনোভাবও বদলেছে। অবগুণ্ঠানাবৃত নারী ধীরে ধীরে তার অধিকার আদায় করে নিয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম-বাংলায় পর্দাঘেরা নারী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ স্বাধীনচেতা নারীতে পরিণত হল। বিশ শতকে সেই নারী বেশ কিছুটা আধুনিক হল। একবিংশ শতকে তো নারী অনেক স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষায়, রাজনীতিতে নারী এখন পুরুষের প্রায় সমকক্ষ। তবে বঙ্গনারীর এই উত্থান এত সহজে আসেনি। সমাজ-আন্দোলনের ধারায় অনেক ঝড়-ঝাপ্টাকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বঙ্গনারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়া টপকে বিশ্বমাঝে নিজেকে তুলে ধরেছে। সে ইতিহাস মোটেই সহজ ছিল না, অনেক গঞ্জনা-বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ইতিহাস পেরিয়ে আজ নারী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এককথায় নিজের ভাগ্য জয় করেছে। এককালের অবগুণ্ঠানাবৃত বঙ্গনারী ভুবনমাঝে শ্রেষ্ঠ আসন পেতেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তো মহিলাই। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ-এই দুই বাংলার রাজনীতির শীর্ষে রয়েছে দুই নারী।

শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বঙ্গনারী: ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোতে নারী অবহেলিত ছিল। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এমনকি আধুনিকতার প্রথম যুগেও (অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে) স্ত্রীশিক্ষা প্রায় নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। তাছাড়া হিন্দুশাস্ত্রেও স্ত্রীশিক্ষার কোন বিধান নেই। মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে গোপনে বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। ১৮৪৯ সালের আগে পর্যন্ত ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উনিশ শতকের প্রথম পাদের শেষ দিকে মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রমুখ পণ্ডিতব্যক্তিরা স্ত্রী-শিক্ষার দিকটিকে বিশেষ অনুভব করেছিলেন।

পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী হন। হিন্দু ঐতিহ্যবাদী নেতা রাধাকান্ত দেব মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি রচনার পেছনে রাধাকান্ত দেব বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিওর নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলটি নতুন মূল্যবোধে ছিল সদাজাগ্রত। তাঁরা সোচ্চার কণ্ঠে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সমমর্যাদার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে মানসিকতাতেই স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীমুক্তির প্রতি বিশেষ সহানিভূতিশীল হয়েছিলেন। ১৮৩৮ সালে 'সমাচার দর্পণ'- এ প্রকাশিত একটি পত্রে শিক্ষানুরাগী চুঁচুড়ার এক ব্রাহ্মণের লেখা থেকে তার আভাস পাওয়া যায়-

> "এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ণ করিতেছে তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তমকার্যে বড় হইবেন..... পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মুর্খ স্ত্রীরদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের অবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকট পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন"।[১]

আসলে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় অন্তরে ও বাহিরে সুখ ও শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। অনেকটা নিজের তাগিদেই তাঁরা নারীশিক্ষার প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের রোমান্টিক কাব্য আস্বাদনে মজে যাওয়া মন অন্ত:পুরিকার নিরস ঘরোয়া কথাবার্তাকে গ্রহণ করতে পারত না। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে পুরুষরা মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক নমনীয় হয় এবং নিজেদের তাগিদেই তাঁরা মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রসর হন। মূলত: ১৮২০ সাল থেকেই এই নতুন সচেতনতার উন্মেষ হয় যে, পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদেরও শিক্ষা দিলে তবেই বঙ্গদেশ সভ্য হয়ে উঠবে।[২]

ব্রিটিশদের হাত ধরেই এদেশে মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৮১৮ সালে রবার্ট মে নামক একজন পাদ্রি হুগলির চুঁচুড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতার ব্যাপটিস্ট (১৮১৯) এবং চার্চ মিশনরি

সোসাইটি (১৮২৩) প্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিল। ১৮২৩ সাল থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে চার্চ মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণায় মিস মেরী অ্যান কুক প্রায় ৩০ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে এই সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজের বড়লোকদের সদিচ্ছার অভাব ছিল। তারা মুখে এক কথা বললেও তাদের মধ্যে একটা স্ব-বিরোধিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। নিজেরা মেয়েদের বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না। স্ত্রীশিক্ষার সূচনাপর্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায়নি, সমাজের অ-সম্ভ্রান্ত ও নিম্নস্তর পরিবারের তথা ব্যাধ, ধীবর, বাগ্দী, বৈরাগী ইত্যাদি শ্রেণির ও বেশ্যা কন্যারা বিদ্যালয়ে পড়তে যেত।[৩]

১৮৪৯ সালের মে মাসে বেথুন সাহেব কলকাতায় এসে ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল স্থাপন করলে কলকাতার বুকে নারী শিক্ষার জোয়ার সামান্য এলেও রক্ষণশীল গোঁড়া রক্ষণাত্মক পরিবারের মনের ধন্ধ তখনও কাটেনি। সে সময়কালে 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন-

"আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো,
ব্রত-ধর্ম কর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
.কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এ' 'বি' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।"[৪]

মোটামুটিভাবে ১৮৫০-এর দশকের গোড়ার থেকে নারী শিক্ষার বিকাশ হয়। সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে বাঙালি সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি বেরিয়ে আসে। অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য 'মাসিক' (১৮৫৪), বামাবোধিনী (১৮৬৩) এবং 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) পত্রিকার মূল লক্ষ্যই ছিল মহিলাদের মানসিক বিকাশ সাধন করা। তবে প্রথমদিকে সাধারণত স্বামীর তত্ত্বাবধানেই তাদের শিক্ষালাভ হতো। কৈলাসবাসিনী দেবী, বামাসুন্দরী, নিস্তারিণী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রমুখদের শিক্ষালাভ হয়েছিল স্বামীর তত্ত্বাবধানে। পরিবারগুলি ছিল মূলত ব্রাহ্ম, ও ব্রাহ্ম-প্রভাবিত পরিবার। ১৮৭০-এর দশকে নারীশিক্ষার আন্দোলন এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, অশিক্ষিত মেয়েদের জন্য শিক্ষিত চাকুরিজীবী পাত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল।[৫] সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষত দীনবন্ধু মিত্র,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকগুলিতে নারী থিয়েটার-অনুরাগী ও শিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গল্প-নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী বিদূষী নায়িকা। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে নারী থেমে থাকেনি। সে তার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে তার দৃঢ় সংকল্পে অটুট থেকে শিক্ষা থেকে রাজনীতি- সব ক্ষেত্রেই বঙ্গরমণী ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।

বহু আগে থেকেই বাঙালি নারী শিক্ষায়, সাহিত্যে, নৃত্যকলায় ও অভিনয়ে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তদশ শতকের হেমলতা দেবী ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তনগানে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তো খেতুরি ধর্মসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ষোল শতকের অসামান্যা নারী ভবশঙ্করীর কথা ইতিহাসখ্যাত। দেশশাসনে তাঁর কোন তুলনা হয় না। পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁকে 'রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আঠারো শতকে দেবী চৌধুরাণী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সহযোগী ছিলেন। এই শতকে চুয়াড় ও পাইক বিদ্রোহের সহযোগী ছিল নারীরা। এই শতকের রাণী ভবানী ছিলেন বিরাট বড় জমিদার। উনিশ শতকের রাণী রাসমণি দেবী ছিলেন জমিদার। উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষা বিকাশের আগেই বিদ্যাসুন্দর নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাধামণি দেবী। তবে ১৮২০- ১৮৩০ সাল নাগাদ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার হলে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙালি নারী শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে এগিয়ে আসে। কৈলাসবাসিনী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, কামিনীসুন্দরী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখরা কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প ও উপন্যাসে ব্যাপক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ শতকের প্রিয়ম্বদা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সরোজিনী নাইডু প্রমুখরা লেখালেখির জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তরু দত্ত ও অরু দত্ত বাংলায় না লিখলেও ইংরেজি সাহিত্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।' ৭০-এর দশক থেকে নারীরা পত্রিকা সম্পাদনা কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। মোক্ষদায়িনী দেবী 'বাংলা মহিলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকা এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

১৮৭০-এর দশকে বাংলা অভিনয় জগতেও জোয়ার এসেছিল। এই সময়কালেই নারী প্রথম মঞ্চে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করে। সুকুমার দত্ত

ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ ভালোভাবে মেনে না নেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অদম্য গতিতে এগিয়েছে -

> "আমরা যদি বিবেচনা করি মহিলাদের অভিনয়ের বিরুদ্ধে তখনকার সমাজের মনোভাব কী কঠোর ছিলো, তা হলে মনে হয় যে, আসলে তাঁদের ক্ষমতা ছিলো পুরুষদের থেকেও বেশি। সেকালে অভিনেত্রীদের বেশ্যা বলেই গণ্য করা হতো। এই বিশেষণ স্বীকার করে কোনো ভদ্রঘরের শিক্ষিত মহিলা অভিনয় করতেন না।" [৫]

সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে বঙ্গনারী: সেই আদি যুগ থেকে নারী অবহেলিতা ও বঞ্চিতা। বাংলার গ্রামীণ ও শহুরে সংস্কৃতিতে এই ধারা আজও বর্তমান। অবিবাহিত ও বিবাহিত মহিলাদের কিছু বিধিনিষেদের মধ্যে চলতে হয়। এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, নারী হবে গৃহকর্মনিপুণা, পতিব্রতা, নিত্যদিন শাশুড়ি-শ্বশুর-দেবর-স্বামীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্যকারিণী, প্রতিবাদহীন এবং পুরুষের কাম মেটাবার যন্ত্র বিশেষ। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে পর্দাপ্রথা বঙ্গনারীর জীবনে এক জীবন্ত অভিশাপ ছিল। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে পর্দাঘেরা জীবনের মর্মান্তিক কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পর্দাঘেরা জীবনে দুঃখের কথা আমরা জানতে পারি জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মজীবনী থেকে। একথা তো ইতিহাসসম্মত যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী তথা রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী গঙ্গাবক্ষে স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাড়ির কর্তাদের নির্দেশে পালকি করে নিয়ে যাওয়া হতো এবং পালকিশুদ্ধ জলে ডুবিয়ে আবার নিয়ে আসা হতো। পুরুষদের কাছে তো বটেই, এমনকি মেয়েদের সামনে দিনের বেলাতেও ঠিকঠাক ভাবে মেশা যেত না। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মত ব্রাহ্ম-পরিবারেও এমন বিধিনিষেধ ছিল। তিনি জানিয়েছেন-

> "বিয়ের পর পুরো পাঁচ বছর আমার মা তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে একটি কথাও বলেননি অথবা তাঁর সামনে ঘোমটাও খোলেননি। ঘরের কর্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত "আলাপ" সারতে হতো মাথা নেড়ে- উপরে নিচে সম্মতি এবং আড়াআড়ি নেড়ে অসম্মতি জানাতে হতো"। [৬]

মুসলিম পরিবারে পর্দাপ্রথার জোরালো প্রচলন ছিল। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, তাঁদের বাড়িতে কোন আত্মীয়া এলে তাঁকে দরজার আড়ালে, খাটের নিচে, অথবা চিলে কোঠায় লুকোতে হতো। এ রকমভাবে লুকিয়ে

থাকতে থাকতে তাঁর মা রাতের বেলায় খাবার দিতেও ভুলে যান।[৭] মুসলিমদের পর্দাপ্রথার এক নিষ্ঠুর পরিণতির পরিচয় আমরা পাই রোকেয়ার লেখা থেকে, তাঁর কোন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া কিউল স্টেশন ট্রেনে উঠতে গিয়ে ট্রেন ও স্টেশনের মাঝে পড়ে যায়। তাকে বোরকা ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে তার দাসী কিন্তু বিফল হলে কয়েকজন পুরুষ মানুষ এসে ওঠানোর চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। অগত্যা ট্রেন ছেড়ে চলে গেল তিনি চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান।[৮] এই মর্মান্তিক পরিণতি সত্যিই হৃদয়-বিদারক। উনিশ শতকের নবজাগরণে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া এদেশে এসে পৌঁছলে নারীদের প্রতি পুরুষের ব্যবহার অনেক নমনীয় হয়। নারীরাও সমাজে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। পর্দাপ্রথার বাইরে বেরিয়ে এসে তারা নিজেদেরকে মেলে ধরছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রথমজীবনে বাল্যবিবাহের শিকার হলেও শেষপর্যন্ত একাই বিদেশে গিয়েছেন, স্বামীর বন্ধুর পার্টিতে গিয়েছেন। কাদম্বরী দেবীও ঘোড়ার পিঠে চড়েছেন। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নির্মাণ করেছেন।

কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় অন্ত্যজ শ্রেণি বা দলিতদের মত নারীরাও সামাজিক নির্যাতনের শিকার বহু যুগ ধরে। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থে নারীদের প্রতি যে অনুবাদ মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়, তা সত্যিই খুব লজ্জাজনক। রামায়ণ ও মহাভারতে নারীদের সম্বন্ধে যে কত রকমের অবমাননাকর কথা বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পুরাণ ও রামায়ণে বারবার নারীদের সতীত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে কিন্তু পুরুষের লাম্পট্য নিয়ে কেউ বাক্যব্যয় করেনি। ভারতীয় শাস্ত্রে স্বামীকেই পরম দেবতা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সেখানে স্ত্রীর ধারণাটাই ছিল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। মুসলিম মেয়েদের প্রতি অবমাননার অন্ত আজও নেই। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে মুসলমানীদের নিরন্তর অত্যাচারের কথা তসলিমা নাসরিনের উপন্যাসগুলির পাতায় পাতায় জ্বলজ্বল করছে। উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে মহিলাদের অপহরণ ও বলপূর্বক ধর্ষণ করা হতো। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশভাগ:স্মৃতি আর সত্তা' বইয়ে উঠে এসেছে সেই সমস্ত জীবন্ত বাস্তব কথা-

> "গৃহস্থ বাড়ির বউদের রাতের পর রাত ধরে নিয়ে যাওয়া হত, সকালে ফেরত আসতেন তারা। বিপদের আশঙ্কায় পরিবারের কেউ অভিযোগ জানাতেন না। অশোকা গুপ্তার মতো সমাজকর্মীর ইচ্ছা

> থাকলেও কিছু করতে পারেননি। নোয়াখালির নমঃশূদ্র-প্রধান গ্রামে কাজ করার সময় অসংখ্য ধর্মান্তরিত মহিলার খোঁজ পেয়েছিলেন বীণা দাস। কিন্তু অত্যাচারের কথা বিশদে জানাননি কেউ। তিনি বলেছেন, 'মেয়েদের আর কি কি অত্যাচার সইতে হয়েছে সব জানি না- ওরা চেপে যেতে চায়, আমরাও ওসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করি না।'[৯]

সভ্যতার বুকে নারী যতই অবহেলিত হয়ে থাক, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনে নারীদের ভূমিকা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রামের চাষী-পরিবারের মহিলারা ফসল উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। ফসল লাগানো, কাটা, নিড়ানো, খামার তৈরি করা ইত্যাদি কাজ প্রধানত তারাই করে থাকে। গ্রাম-বাংলার বাড়িতে সবজি ও ফলের বাগান বাড়ির মেয়েরাই করে। গবাদি পশু পালনে যোগ্য সঙ্গত মহিলারা দেয়। এক একটি গ্রামে গড়ে ওঠা ছোট ছোট কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছে নারীদের জন্যই। শীতলপাটি, নকশি কাঁথা, বালিশের ওয়াড়, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, মাটির পুতুল, মাটির ঘট, কারুশিল্প ইত্যাদি নির্মাণে নারীদের ভূমিকা চলে আসছে বহু শতাব্দী ধরে। এদের মধ্যে কিছু কিছু কাজ তো কেবলমাত্র নারীদেরই। এমনকি ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্ম সুইয়ের কাজ নারীদের-ই করা।

বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ- রন্ধনশিল্প। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতিটি উৎসবে হরেক রকমের খাবারের আয়োজন না করলে বাঙালির মন ভরে না। খাদ্য রসিক বাঙালির রসনা পরিতৃপ্তির একমাত্র দায় এবং দায়িত্ব পরিবারের নারীটির বা নারীগুলির। পৌষ সংক্রান্তির দিনে একান্নবর্তী পরিবারে জা-জাউলি মিলে হরেক উপচারে পিঠেপুলি বানানো প্রায় সকলের জানা। মাংস, পায়েস, মিষ্টি, দই, নুক্তো, পিঠেপুলি, মুড়ি-মুড়কি ইত্যাদি বাঙালি রসনার দায়ভার বর্তায় বাঙালি রমণীটির।

রাজনৈতিকভাবে বাঙালি নারী সে-অর্থে পিছিয়ে ছিল না কোনদিন। বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি নারীর অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো। ঊনিশশতকের নবজাগৃতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল বাঙালি রমণীকুল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে স্বল্প সংখ্যায় এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকেই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমস্ত শ্রেণির মহিলারাই এসেছিলেন ব্যাপকভাবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির

নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন সবসময়। মহিলা প্রত্যক্ষভাবে বিদেশি দ্রব্য বর্জন, অনশন সত্যাগ্রহ, পিকেটিং, আইন অমান্য প্রভৃতি কাজে অংশ নেবার পাশাপাশি স্বদেশী/বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, গোপন খবরাখবর পৌঁছে দেওয়া, তাদের গোপন আস্তানা রক্ষা করা, পুলিশের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য নানাবিধ প্রয়াস গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে পরোক্ষভাবেও গ্রাম, শহর উভয় জায়গার নারীরাই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। কুমুদিনী মিত্র, হেমাঙ্গিনী দাস, সরলা দেবীর বোন হিরণ্ময়ী দেবী প্রমুখের নাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে তাতে বহু মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকেরা স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পরবর্তী অধ্যায়ে নারী আর থেমে থাকেনি। ১৯৩০-১৯৩২ -এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বঙ্গদেশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাসন্তীদেবী, উর্মিলাদেবী, সুনীতিদেবী, আশালতা সেন, বীণাপাণি দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীসহ আরও অনেকে। নির্মলনলিনী ঘোষ ছিলেন প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী।[১০] ১৯৩২ সালে জেল খাটেন পারুলবালা মুখোপাধ্যায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা মিত্র প্রমুখরা। ১৯৩০-এর দশকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যোগ দেন প্রীতিলতা ওয়েদ্দার ও কল্পনা দত্ত। বঙ্গভঙ্গের সমকালে বীরভূমের তরুণী দুকড়িবালার ঘরে একটি পিস্তল পাওয়া গেলে তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। সুতরাং নারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও যুক্ত ছিল।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গরমণী আজ বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত। সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িক শক্তি, বর্ণবিদ্বেষবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারীর অধিকার খর্ব করতে উদ্যত। কিন্তু তবুও বঙ্গরমণীদের জয়যাত্রা থেমে নেই। নারী আজ পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্মজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সরোজিনী নাইডু তাই বলেছেন, 'বিপদে আপদে ভারতের নারী সবসময়ই পুরুষের সহায়। পুরুষ যখন অবসন্ন বিভ্রান্ত, তখন নারীই আলোকবর্তিকা হস্তে তাহাকে পথ দেখাইবে'। পুরুষ তার

শৌর্য-বীর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে জগতের সৃষ্টি সম্ভার গড়ে তুললেও তার মূলে ছিল নারীর অবস্থান। গোলাম মুরশিদ বলেছেন, 'যেসব তাজমহল গড়ে তুলেছেন পুরুষরা, তার সামনে একজন শাহজাহান থাকলেও, অন্তরে ছিলেন মমতাজ'।[১১]

তথ্যসূত্র :
১. সমাচার দর্পণ, ৩ মার্চ, ১৮৩৮, সসেক ২, পৃ. ৯৯।
২. কোন এক ব্রাহ্মণের পত্র, সমাচার দর্পণ, ৩ মার্চ ১৮৩৮, সসেক ২, পৃ. ৯৯।
৩. বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ-এ (২৫ জুন ১৮৩১) উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ৯১-৯২।
৪. 'দুর্ভিক্ষ', কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা, ১৮৮৫), পৃ. ১২১-১২২।
৫. মুরশিদ গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১২,
৬. মুরশিদ গোলাম, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', "খাঁচা খোলা : অন্তপুর থেকে মুক্তির প্রয়াস", জানুয়ারী ২০০১, পৃ. ৫২-৫৩।
৭. রোকেয়া বেগম, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৪৮৮-৮-৪৮৯।
৮. রোকেয়া বেগম, রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৪৮২
৯. বহুস্বরে উদ্বাস্তু সত্তায় বাঙালি, সম্পা : সৌমেন চক্রবর্ত্তী, "লাঞ্ছিত মানবী ও দেশভাগ", ঝরণা ধর, পৃ. ১৫৮-১৫৯।
১০. মুরশিদ গোলাম, "হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি", 'বাঙালি নারী ও বাঙালি সংস্কৃতি', পৃ. ২৬৬।
১১. মুরশিদ গোলাম, "হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি", 'বাঙালি নারী ও বাঙালি সংস্কৃতি', পৃ. ২৬৬।

....

মসিজীবী বঙ্গনারী শৈলবালা ঘোষজায়া : আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে

সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার

মসিজীবী বঙ্গনারী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রচারের অন্তরালে থাকা এমন একজন লেখিকা, সত্যি করে বলতে গেলে যিনি আমাদের কাছে বড়ই অপরিচিত। অথচ তাঁর লেখনি থেকে উঠে এসেছে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস, যা আজ প্রায় অবলুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রের গবেষক ও সম্পাদকেরা শ্রমসাধ্যসাধনায় এই লেখিকাকে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ (১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন) বাংলাদেশের কক্সবাজারে জন্মেছিলেন। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের চাকরি করতেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে ঘোষ পরিবারে মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে শৈলবালার বিয়ে হয়। স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি পড়তেন। পাশ করার আড়াই-তিনবছর প্র্যাকটিস করার পরই তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। শৈশবে শৈলবালা পিতার কাছে যে শিক্ষালাভ করেন, পরবর্তীতে সেই শিক্ষাকে সম্বল করেই তার 'হাতেখড়ি' সাহিত্য সেবায়। এক্ষেত্রে তাঁর বড়ো ভাইও সাহায্য করেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার হাত ধরে শৈলবালার লেখালেখির জগতে পদার্পণ ঘটে। তিনি বিয়ের পর লেখালাখি করতেন এবং প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। জানা যায়, শৈলবালার স্বামী নিজে হাতে পত্রিকার দপ্তরে পৌঁছে দেন এবং লেখাটি মনোনীত হয়। ১৯১৪ সালেই 'সেখ আন্দু' উপন্যাসের মাধ্যমেই লেখিকা হিসাবে শৈলবালা আত্মপ্রকাশ করেন।

শৈলবালা ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ওপর গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে ও সাহিত্যচর্চার জন্য যথাক্রমে 'সরস্বতী', 'সাহিত্যভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি লাভ করেন। শৈলবালার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে

সাহিত্যচর্চাও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় পাই, তাতে জানতে পারি যৌথ পরিবারে বিয়ে হয় শৈলবালার। বিয়ের পর

স্বামীর উৎসাহকে সঙ্গী করে পরিবারের সবাইকে লুকিয়ে রাত জেগে সাহিত্যচর্চা করতেন। শৈলবালা স্বামীর সঙ্গে ন'বছর মতো সংসার করেন ঠিকঠাক , প্রায় ১৯১৯ সাল নাগাদ স্বামীর মস্তিষ্কবিকৃতির রোগ ধরা পড়ে। এই সময় শৈলবালার জীবনে নেমে আসে ঘোর দুঃসময়। দীর্ঘ দশ বছর এই উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে সংসার অন্যদিকে নিঃসন্তান হওয়ায় সমাজের সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্ত 'যুঝে' নিতে হয়েছে তাঁকে। উনবিংশ শতকের নারী হলেও শৈলবালার শ্বশুরবাড়ির মানসিকতায় মধ্যযুগীয় ছাপ সুস্পষ্ট। যদিও বর্তমান সমাজে পৌঁছেও এই নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে স্ত্রীকেই দোষের ভাগী করা হয় বহু পরিবারে, এক্ষেত্রে শৈলবালারও ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় একঘরে হয়েছিলেন। শৈলবালা পাঠরত স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন নিজের বই বিক্রির টাকা দিয়ে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিঃসন্তান দম্পতিকে প্রতারণা করতেও ছাড়েনি। ১৯২৯ সাল নাগাদ শৈলবালার স্বামী মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর লেখালেখিকেই সঙ্গী করে বাঁচার রসদ খুঁজে নেন। একের পর এক গল্প-উপন্যাস-শিশুসাহিত্য লিখে সাহিত্যজগতে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

সমাজের বস্তাপচা নীতির তীব্র সমালোচনা করে নারীর মুক্তির পথ খুঁজতে চেয়েছেন তাঁর লেখনির মাধ্যমে। উনিশ শতকে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। শৈলবালার গল্প এবং বিশেষ করে উপন্যাসে মেয়েদের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মের পক্ষপাতিত্ব ও সমাজের দু-মুখো নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মের ভেদাভেদকে অতিক্রম করার বলিষ্ঠ সাহস দেখিয়েছেন শৈলবালা তাঁর 'সেখ আন্দু' উপন্যাসে। বহু আলোড়িত এই উপন্যাসে 'অযোগ্য বিবাহ', 'বাল্যমাতৃত্ব', ও 'বহুসন্তানসৃষ্টি' এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। 'সেখ আন্দু'তে নায়ককে পেশাগতভাবে নিচের তলার মানুষ গড়ে মনিব কন্যাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে ভেঙেছেন চিরাচরিত প্রথা। হিন্দুবিধবা তরুণীর মুসলমান যুবকের প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতিতে ভেঙেছিল সম্প্রদায়গত সংস্কারের বাধা।

উনিশ শতকে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী এক সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যাতে বাংলার মেয়েদের জীবনযাপন অর্থাৎ ১৮২৯ সালে সতীদাহরোধ আইন, ১৮৫৬ সালে স্বীকৃত হয় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মত আইন এই সময় থেকেই নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার মত ক্রমজাগ্রত দাবির

গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বাংলায় এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে মেয়েদের জীবনে আসে এক নতুন মাত্রা। সমাজের চেতনায় আসে এক নতুন আলোর ঢেউ। মেয়েরা নিজেরাও নিজেদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। উনিশ শতকেই মেয়েদের উপন্যাস রচনার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তাতে নবজাগরণের ফলে জাগ্রত সমকালীন সমাজের নানা জীবনযাপনের নানা বৈচিত্র্য উঠে আসে অনায়াসে। উনিশ শতকের লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখনির মধ্যে তাই উঠে এসেছে সমকালীন একাধিক সমস্যা, নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং দাম্পত্যসংকটের চিত্র। আবার এরই মধ্যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইও দেখিয়েছেন শৈলবালা।

ধর্মের পক্ষপাতিত্ব ও সমাজের নারী-পুরুষের বৈষম্যের চিত্রে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা-হন্তারক সমাজের নিয়মরক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা তীব্র হয়েছে শৈলবালার গল্প-উপন্যাসে। মেয়েদের মুক্তিপথের সন্ধান পেতে চেয়েছেন বহু উপন্যাসে। শৈলবালা ব্যক্তিগত জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাসের সঙ্গে সংগ্রাম করে শান্তি পেতে নিজেকে জয় করার জন্য সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৫২-৫৩ হলেও ক্রমবিলুপ্তির পথে, সব বইয়ের সন্ধান আজ পাওয়া যায় না; ৩০-৩৫ খানি বই ছাড়া। বিবাহিত জীবনে নারী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি নিজেও বিবাহিত জীবনে স্বামীর উপাধি ব্যবহার করে 'জায়া' শব্দটির মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছেন। শৈলবালা স্বীকার করেছেন, তাঁর একান্ত নিজস্ব চর্চার জগৎটিকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সুনজরে গ্রহণ করেনি। বিবাহিত জীবনে সামাজিক প্রথানুযায়ী একটি মেয়ে বাবার বাড়িতে বড় হয়ে অন্য বাড়িতে বিয়ে হবার সূত্রে অন্যপরিবেশে মানিয়ে নিতে গিয়ে তাতে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় এবং পদে পদে মেয়েটিকেই ভুক্তভোগী হতে হয়, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারিত হতে হয়। শৈলবালার উপন্যাসের বেশিরভাগই বিবেকহীন অত্যাচারী স্বামী আর নিরুপায় অত্যাচার-সহ্যকারী স্ত্রীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েদের সত্যিকার অবস্থার নগ্নমূর্তি খুব গভীরভাবেই অনুভব করেছিলেন শৈলবালা। 'জন্ম-অপরাধী'(১৯১৯), 'জন্ম-অভিশপ্তা'(১৯২১), 'ঘৃণাহতা'(১৯২০), 'অরু'(১৯৩৯), 'শান্তি' প্রভৃতি উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে সেই নারীপেষণের বর্বরতার ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। 'অরু' বা 'স্নিগ্ধা' দুটি উপন্যাসেই অরু ও স্নিগ্ধা উপার্জনক্ষম স্বপ্রতিষ্ঠ, তাদের স্বামীরা উপার্জনহীন। নির্বিচার নির্যাতন, অপমান সহ্য করে স্বামী প্রতিপালন করে। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের দেখা যায় সমস্ত অপমান

সহ্য করেও পতিসেবা থেকে সরে আসে না। একটা ব্যাপার মনে হয় স্বামীদের মধ্যে এই অত্যাচারের স্পৃহার কারণ স্বামীদের হীনম্মন্যতা। স্বামীদের স্বামীত্ব বজায় রাখার ঝোঁকেই হয়তো স্ত্রীদের প্রতি এত অত্যাচার করতে দেখা যায়।

শৈলবালা সবসময় যে পুরুষের অত্যাচার দেখিয়েছেন তা নয়। সংসারে সুখের সন্ধান দেখিয়েছেন উদার পুরুষের শুভবুদ্ধিতে। তাঁর 'সই' উপন্যাসের মধ্যে হাস্কাহাসির মেজাজ দেখা যায়, আবার দেশি-বিদেশি নানা শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। হিতেন্দ্র-বিদ্যুৎলতার সম্পর্কটিও হাসিঠাট্টা, কথার চাতুর্যে গড়ে উঠেছে। 'অবাক' এবং 'মিষ্টি সরবৎ' উপন্যাসের মধ্যে উদারচেতা পুরুষের সন্ধান মেলে এবং সুখীদাম্পত্য জীবনের ছবি ধরা পড়ে। শৈলবালা হিন্দু পরিবারগুলির চেয়ে মুসলিম পরিবারগুলির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে শৈলবালার অন্ত্যজ পরিবারগুলির কাহিনিতেও ব্যতিক্রমের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণের সুশিক্ষিত হিন্দু -সমাজে তিনি আশার আলো খুঁজে পাননি। সেই আলো পেয়েছেন নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্ত মানুষগুলির জীবনের ছবিতে। 'রঙীন ফানুস' উপন্যাসে খন্তর কুর্মি যেমন কাজ করে মিস্ত্রির, প্রথাগত শিক্ষাও পায়নি কখনো, তবু নিজেকে সে গড়ে তুলেছে সংযমী, চরিত্রবান, সৎ ও আদর্শ মানুষের ছাঁচে। কিন্তু তার দাম্পত্যসংকট ঘনিয়ে তোলে সদা-অসন্তুষ্ট সন্দেহগ্রস্ত স্ত্রী পার্বতী। পার্বতী ক্রমে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মত্ত অবস্থায় খন্তরের লাঞ্ছনার বর্ণনা এবং শেষে পার্বতীর মানসিক হাসপাতালে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ভয়ানক দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছেন লেখিকা। নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে খন্তরের চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন শৈলবালা। আবার, 'গঙ্গাপুত্র' উপন্যাসের মধ্যে শ্মশানের ডোমের সঙ্গে ব্রাহ্মণ নারীর ঘর বাঁধার এক অদ্ভুত কাহিনি এবং মানবিক রূপে ডোমচরিত্রটির মধ্যে উদারতার ছাপ সুস্পষ্ট। লালু ও লক্ষ্মীর সুখী দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে শৈলবালা ভেঙেছেন ডোম ও ব্রাহ্মণের বিবাহের দ্বারা বর্ণসংস্কারের বাধা।

'ঘৃণাহতা' (১৯২০), 'জন্মঅভিশপ্তা', 'তেজস্বতী'(১৯৩৬), 'বিনীতাদি' (১৯৩৯) প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বারবার শিক্ষার অধিকারহীনতা নিয়ে মেয়েদের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। নারীকে পদদলিত রেখে পুরুষও যে সুখী হতে পারে না, উভয়ের মিলিত সুখেই হতে পারে সম্পূর্ণ সমাজে সুখের কল্পনা। শৈলবালা সুগৃহিনী হবার প্রশ্নে তিনি সমাজের দাবিকে একেবারেই

অস্বীকার করেছেন কিন্তু সুমাতা হবার প্রশ্নে তাঁর মধ্যেও কাজ করেছে সামাজিক ঐতিহ্যবোধ। সুমাতার সন্তানই যে সুন্দর সমাজ গড়বে ও উপযুক্ত শিক্ষার জন্য মাতার শিক্ষার প্রয়োজন বেশি তা তিনিও বিশ্বাস করেন। 'পণ' দিয়ে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারেও লেখিকা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন – 'শান্তি' উপন্যাসে নিপীড়িতা শান্তির আক্ষেপে সেই সুর স্পষ্ট– 'বিয়েই যেন মেয়েদের একটা বৃত্তি, একটা চাকরি, আর সেই চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতেও হয় অন্য আরও অনেক চাকরির মতো'। পুরুষ পেষণের মূল্যবোধের কাছে অসহায় নারীর হীনাবস্থাকে খুব তীব্রভাবে প্রকাশ করেছিলেন শৈলবালা।

শৈলবালার ছোটোগল্পগুলি প্রকাশের ভঙ্গিমাতে দেখা যায় অদ্ভুত কৌশল, যাতে মনে হয় সারাদিনের কাজের পর অবসরবেলায় একটু গল্প করা। গল্প বলার ভঙ্গির মধ্যে নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচারের ফন্দি আঁটার ব্যাপারগুলি এমন সরলভাবে প্রকাশিত, যেখানে অবিশ্বাস জন্মায় না কিছুতেই। সংসারে অন্যায়-অবিচার, চেনা-অচেনা,' বিচিত্র সম্পর্কের ঘটনার ঘনঘটায় গল্পগুলি গাঁথা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। 'অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি', 'বিজয়ার নমস্কার', 'সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান', ' লোকসানের সন্ধ্যায়', 'থিয়েটার দেখা', 'মনীষা', 'ঐন্দ্রজালিক', 'প্রেতাত্মার জবানবন্দী', 'মুচি', 'রুদ্রকান্ত', 'লাফো', 'দাদা মশায়ের বে', 'করুণা দেবীর আশ্রম', ' ক্ষমতার জয়' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের ঘটনায় ছোটোগল্পগুলিতে কখনো হালকা হাসির খোরাক কখনো হিংসার কঠোরতার প্রকাশ ঘটেছে। শৈলবালা শিশুসাহিত্যের জগতেও অবদান রেখেছেন তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় 'রঘুসর্দার' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে – 'ভূমিকম্প',. 'গবেষণা', 'বিদায়-গ্রহণ', 'নিরঞ্জন সর্দার', ' সৎসাহসের পুরস্কার', 'বোকার টুপি',. 'জয়পতাকা'। একখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় 'মোহের প্রায়শ্চিত্ত' নামে।

শৈলবালার বহু লেখা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু সেগুলি বই আকারে প্রকাশ পায়নি। ফলে বর্তমানে তাঁর কিছু গ্রন্থ, বিক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা ও দু'একটি গবেষণাপত্রের অংশবিশেষ ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। শৈলবালার প্রয়াণ ঘটে ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। এই প্রয়াণের খবরও তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি। এতে করে একটা কথা মনে হয় যে জীবিতকালেই তিনি অনেকটাই অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। সমস্যা জর্জরিত জীবনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে শৈলবালার লেখনির প্রতিভা এতটুকুও

ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবুও কালের বিপাকে আধুনিক লেখিকা হয়েও আজ বিস্মৃতপ্রায় নাম। লেখার যা উপকরণ তাতে বিখ্যাত সাহিত্যকদের সঙ্গে এক আসন লাভ করার কথা ছিল। যাই হোক, শৈলবালা ঘোষজায়া সমাজের প্রতি যে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অধঃপতিত সমাজের ও মেয়েদের মূল্যবোধের যে শক্তি ও সাহস জাগিয়েছেন, সেই শক্তির জোরেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

....

বাঙালির আবৃত্তি শিল্প

কিঙ্কর মণ্ডল

১

সংসারের প্রাত্যহিকতার বন্ধন যত জোরালো হয়, ততই প্রবল হয়ে ওঠে পিঞ্জর ভেঙে ওড়বার অভীপ্সা। বজ্রবাঁধনে আবদ্ধ মানুষের জীবনে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ফল্গুধারার মত বয়ে চলে। এ সত্য চিরকালের। বাঁচার মুক্ত আকাশ খুঁজে পেতে, মনের ভাতের সন্ধানে , মানুষ তাই বারবার হানা দেয় শিল্পের দরজায়। হৃদয়ের শূন্যতাকে সে ভরে নিতে চায় সঙ্গীতের মূর্ছনায়, কবিতার ভাষায় , চিত্রকলার সৌন্দর্যে কিংবা সাহিত্যের অঙ্গনে। দুঃখের গাঢ় বেদনায় অন্তরকে নীল না করে সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করার শিক্ষা সে পায় এ জগৎ থেকে। তখন শিল্প-সাহিত্যের সত্য তার জীবনসত্য হয়ে ওঠে। 'এক চাকাতে বাঁধা' জীবনকে নতুনভাবে ভরে নিতে হয়। নইলে জীবনের গতি হয় বড় একঘেঁয়ে, কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন। সংসারের শতবন্ধনের মধ্যে থেকেও জীবনকে অর্থময় করে নিতে হয়; না হলে সে জীবনের মূল্যই বা কোথায়? সংস্কৃতি চর্চার দিগন্ত তাই মানবজীবনকে অর্থময় করে তুলতে তাকে ক্ষুদ্রের সীমা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তহারা অসীমে। শিল্পের অন্যান্য আঙ্গিকের মত আবৃত্তিও আপামর বাঙালিকে আদৃত করেছে।

> যে মানুষ গান গাইতে জানে না।
> যখন প্রলয় আসে , সে বোবাও অন্ধ হয়ে যায়
>
> ['জন্মভূমি আজ', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

গানহীন জীবনের পরিণতি কবি প্রকাশ করেছেন কবিতার ভাষায়। দক্ষ আবৃত্তিশিল্পী তাঁর ধীরোদাত্ত কণ্ঠ আর ভাবপ্রয়োগের জাদুতে কবিতার ভাব ও ভাষাকে শ্রোতার হৃদয় দরবারে পৌঁছে দেন। আলোড়িত হয় তাঁর হৃদয়। কবিতা তথা একটি শিল্পের নবজন্ম ঘটে। প্রত্যেকটি শিল্প তার স্বতন্ত্রতার দাবি নিয়ে আপন গৌরবে ভাস্বর। তা সে সঙ্গীত হোক কিংবা চিত্রকলা, আবৃত্তি হোক কিংবা নৃত্যকলা। তবে প্রত্যেকটি শিল্পের প্রকাশগত নিজস্বতা থাকে। কথা-সুর-গায়কের উপস্থাপনার ত্রিবেণীসঙ্গমে সঙ্গীত মধুময় হয়ে ওঠে।

রঙ, তুলি, শিল্পীর কল্পনাশক্তির জাদুতে চিত্র হয়ে ওঠে জীবন্ত। ঠিক তেমনি একজন আবৃত্তি শিল্পী স্মৃতি, কণ্ঠ, উচ্চারণ, ছন্দ, উপস্থাপনার সংযোগে একটি কবিতাকে নতুনভাবে জন্ম দেন। আবৃত্তি তখন শিল্পের দাবি নিয়ে আপন গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রে বলা আছে – " আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" বৈদিক যুগে মানুষের উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তিধার্য ছিল। বৈদিক ঋষিকবিরা যা রচনা করতেন তা আবৃত্তির সাহায্যে ধরে রাখতেন মুখে মুখে। আর্যযুগে চৌষট্টিকলার মধ্যে দুটি প্রধান কলা হল – 'সংপাঠ্য' এবং 'মানসীকাব্যক্রিয়া'। সম্যকভাবে পাঠ করা অর্থে 'সংপাঠ্য' শব্দের ব্যবহার। আর 'কাব্যক্রিয়া' বলতে উত্তম কাব্যপাঠকে বোঝানো হত। আর তা লোকমনোরঞ্জনের জন্য পঠিত হত। একে আজকের ভাষায় 'আবৃত্তি' বা 'Recitation' বললে ভুল হয় না। সুতরাং আবৃত্তি যে বহুপ্রাচীন শিল্প এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সেই ধারা অদ্যবধি প্রবহমান। প্রথিতযশা নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সাহিত্য কিনা সে বিষয়ে জোরদার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তেমনিভাবে আবৃত্তিও কি শিল্পের সীমাকে ছুঁতে পারে – এ নিয়ে আবৃত্তিচর্চার সঙ্গে যারা যুক্ত তাঁদের মনেও প্রশ্ন জেগেছে। বাঙালির আবৃত্তিচর্চার আধুনিক ধারাটি আলোচনার পূর্বে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি – কবিতা আবৃত্তি কি প্রকৃতপক্ষে শিল্প?

আবৃত্তি পরিবেশনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষদিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এগুলি হল – স্মৃতি, কণ্ঠ, উচ্চারণ, ছন্দবোধ, উপস্থাপনা প্রভৃতি। কোনো কবিতা দেখে পড়া মোটেই আবৃত্তি নয়, কবিতাপাঠ। কবিতা প্রাথমিকভাবে আবৃত্তি হয়ে ওঠে আবৃত্তিকারের স্মৃতিতে তা পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে কিনা তার দাবিতে। কবিতা মুখস্থ বা স্মৃতিস্থ না হলে অসুবিধা অনেক। মঞ্চে উঠে কবিতা মনে করে করে আবৃত্তি করা কিংবা একবার বইয়ের দিকে চোখ রেখে তারপর লাইন বলা – উভয়ক্ষেত্রেই আবৃত্তি গতিরুদ্ধ হয়। স্বতঃস্ফূর্ততা যেকোন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই কবিতা মুখস্থ না থাকলে ভাব, ভাষা, ছন্দ, কবির অনুভব কোনো কিছুই সাবলীলভাবে শ্রোতার দরবারে পৌঁছয় না। একজন আবৃত্তিকারের কাছে তার কণ্ঠটাই সব। কণ্ঠের কারুকার্যে কবিতা প্রাণ পায়। ভগবত প্রদত্ত স্বর্ণকণ্ঠ (Golden Voice) হয়তো সকলের হয় না। তবে সাদা-মাটা কণ্ঠকে রেওয়াজ অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে আবৃত্তি করবার উপযোগী করে তোলা সম্ভব। কবিতা-শ্রোতার মধ্যস্থতা করে

আবৃত্তিকারের কণ্ঠ। কণ্ঠের মাধুরী আর উপস্থাপনার অভিনবত্বে কবির কবিতা-শ্রোতার অন্তরকে উদ্বেল করে তোলে। তবে খেয়াল রাখা জরুরী, কণ্ঠের মধ্যে আবেগ যেন অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ না পায়। ভাবাবেগের আধিক্য কবিতাকে আবেগসর্বস্ব করে তুলে ভাবের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। শ্রোতার কাছে কবিতাকে পৌঁছে দিতে ও বোধগম্য করে তুলতে উচ্চারণের স্পষ্টতা ও উচ্চারণের কৌশল যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। উচ্চারণের অস্পষ্টতায় শ্রোতার কাছে কবিতা শ্রুতিকটূভাবে পৌঁছায়। তবে আবৃত্তিশিল্পী সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই আবৃত্তি শিল্পগুণান্বিত হয় না। আবৃত্তির মধ্যে কবির অনুভবকে কণ্ঠে ও উপস্থাপনার ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে। কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে –

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর-

এই লাইনগুলো যখন পরিবেশিত হবে, তখন প্রভাত রবির করস্পর্শে প্রাণের যে জাগরণ, তা যদি পরিবেশনে ধরা না পড়ে তবে কবিতার অনুভবকে ছোঁয়া যাবে না। কিংবা এই কবিতাংশটি –

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে-
মনে হয় যেন শতজনমের আগে-
সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।

['শাশ্বতী', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

বর্ষণস্নাত রাত্রে প্রেয়সীর সঙ্গে নিবিড় মুহূর্তে স্মৃতিমেদুরতা কণ্ঠস্বরের সঠিক প্রক্ষেপণে প্রকাশ ঘটানো জরুরী। অথবা ধরুন, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রিয়তমাসু' থেকে সেই পংক্তিগুলি-

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতিজ্বালার সামর্থ্য
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে ভাবপ্রকাশ ও কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ কতটা জরুরী তা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শুধু আবৃত্তির জন্য' বইতে লিখেছেন, " এ কবিতা ..... প্রায় সমস্ত সৈনিক যারা নির্ঘুম চোখে পাহারা দেয় দেশকে, পৃথিবীকে, দেশকে সমাজকে শত্রুমুক্ত করতে

যারা মরণপণ বাজি ধরে তাদের প্রত্যেকের। এ কবিতা আবৃত্তিতে তাই সৈনিকের মনের অতল গহ্বরে লুকিয়ে থাকা এক অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রকাশ চাই। মুক্তছন্দে লেখা এই কবিতাতে সেই বাতিওয়ালার ছবি যেন শ্রোতার অন্তরে এঁকে দিতে পারা যায়।"[১]

ভাবের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবৃত্তিকারের ছন্দজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন কবিতা অক্ষরবৃত্ত, কোনটা মাত্রাবৃত্ত, আর কোনটাকে স্বরবৃত্তে প্রকাশ করতে হবে তা বুঝতে হবে। যে কোন কবিতার প্রেক্ষাপট না জানলে কবিতা বোঝার খামতি থেকে যায়। যেমন ধরুন 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাতে নজরুল কোন প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, তা না জানলে আবৃত্তিকারের কাছে কবিতাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুতরাং ভাব (Expression), কণ্ঠ (Voice), উচ্চারণ (Pronounciation), উপস্থাপনা (Presentation), স্মৃতি (Memory), ছন্দবোধ (Rhythm) প্রভৃতির সঠিক প্রয়োগ ও যথাযথ প্রকাশের মধ্যদিয়ে একজন আবৃত্তিকার আবৃত্তিকে শিল্পের জগতে মুক্তি দেন। সে-শিল্প কেমন শিল্প? অবশ্যই প্রয়োগশিল্প (Performing Art)।

২

উনিশ শতক নবজাগরণের কাল। বাঙালির আবৃত্তিচর্চার শিল্পরুচির যথাযথ সূচনা এই কালে। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকরা তাদের উদাত্ত ও অনুদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তিতে মোহিত করে তোলে নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের। ডিরোজিওর আশ্চর্য কবিকণ্ঠে অসামান্য আবৃত্তি বহুছাত্রকে কাছে টেনেছিল। তবে যে বাঙালিকবি প্রথম আবৃত্তিকে শিল্পরুচিযোগ্য করে তুলেছিলেন, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর কাব্য-কবিতা রচনায় আবৃত্তি নির্ভরতার দিক সুবিদিত। আমরা জানি যে, এক বা একাধিক কাব্যাংশ কিংবা নাট্যাংশ তিনি আবৃত্তি করে যেতেন আর লিপিকর পণ্ডিতরা শুনে শুনে তা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল দিক ছিল আবৃত্তি। মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) আমাদের প্রথম উপহার দিয়েছিলেন তাতে আবৃত্তিশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। উচ্ছ্বসিত মধুসূদন তাঁর এক পত্রে বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, "As old Runjit Singh used to say, when looking at the map of India, - " Sub lal ho jaga." I say "sub Blank verse ho jaga." [২]

সুখশ্রাব্যতা আবৃত্তিশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আবৃত্তি-অনুরাগী মধুসূদন

তাই শব্দকে সুখশ্রাব্য করে তুলতে তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্যে' বরুণের পত্নী 'বরুণানী' শব্দকে 'বারুণী' হিসাবে প্রয়োগ করেন । এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে, " The name is 'বরুণানী' but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as 'বারুণী' and I do not know why I should bother myself about Sanskrit rules."[৩] মধুসূদনের হাত ধরে প্রথম আবৃত্তিজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা প্রকাশ করতে গিয়ে এক স্থির বিশ্বাসে উপনীত হন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, " অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এই অর্থেই বৈপ্লবিক যে, এই ছন্দই বাংলা কবিতাকে পাঠের ভূমি থেকে আবৃত্তির আকাশে মুক্তি দিল। মিল গ্রথিত চরণে সমাপ্যবাক্যে বন্দী পদ্য কেবল পাঠযোগ্য কবিতা ছিল। আবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা তাতে ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দই নিছক একঘেঁয়ে পাঠের দাসত্ব থেকে কবিতাকে মুক্তি দিল। সে-মুক্তি চরণের শৃঙ্খল ভেঙে ক্রীতদাসকে স্বাধীনতা দেওয়ার মত বৈপ্লবিক ।

আবৃত্তিপটু মধুসূদনই সেই বিপ্লবের অগ্রদূত। তাই তিনিই আবৃত্তি শিল্পরুচির কবি।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাই আবৃত্তিযোগ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা মধুসূদনের আবৃত্তি ক্যাসেটে পাই না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির কয়েকটা রেকর্ড আমরা পেয়েছি। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নিস্তেজ কণ্ঠেও ভাবের কী অনবদ্য প্রকাশ, উচ্চারণের কী সাবলীলতা! রবীন্দ্র সমকালে নাট্যমঞ্চের দিক্‌পালেরা আবৃত্তিজগৎকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেন। এঁদের অগ্রপথিক হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আবৃত্তিশিল্পকে সমৃদ্ধ করে তার কাঠামোকে নবরূপ দিতে শিশিরকুমার অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'নিঃসঙ্গ সম্রাট' উপন্যাসে লিখেছেন, " শুধু কাব্যের টানেই নয়, বিশেষত অভিনয়ের দিনে শিশির এরকম একটানা কাব্যপাঠ করে চলেন, তাতে উচ্চারণ পরিশীলিত হয়, স্বরের বিস্তার হয়, আর কাব্যের অনুরণনে মন শিল্পমুখী হয়ে থাকে।"[৫] ঔপন্যাসিক প্রাসঙ্গিকভাবে দেখিয়েছেন, শিশিরকুমার ভাদুড়ী উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি করেন উচ্চারণকে পরিশীলিত করবার অভিপ্রায়ে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখেরা আবৃত্তিকে শৈল্পিক রূপদান করেছেন।

আবৃত্তিকে কেবল প্রেক্ষাগৃহে বন্দী রাখলে কিংবা 'প্রাণের আরাম' পাওয়ার

অভীপ্সায় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে জনমানসে তার বিস্তার ঘটে না, গণসংযোগে ঘাটতি থেকে যায়। আবৃত্তিকে গ্রামে-গ্রামান্তরে, খোলা আকাশের তলায় ছড়িয়ে দিতে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন শম্ভু মিত্র। গণনাট্যসংঘের ব্যানারে তিনি অক্লান্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করেছেন জনসমক্ষে, মাঠে-ময়দানে। শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি তাঁর উত্তরসূরি আবৃত্তিকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম যে মুগ্ধতার আবেশে ভরিয়ে দিয়েছিল, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন, " ভারতীয় গণনাট্যসংঘের সংস্রবে আসার পর , একদিন এক অনুষ্ঠানে সেই প্রথম শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শুনলাম, শুনে চমকে উঠলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার উত্তেজনা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম।"[৬]

আবৃত্তিজগৎকে কণ্ঠের উদ্দামতায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র কাজী সব্যসাচী। কবিতাকে বিশেষ করে নজরুলের কবিতাকে আবৃত্তিশিল্পের উচ্চাঙ্গমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠের মাধুরী ও উদাত্ততা শ্রোতার হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। তিনি আবৃত্তিকে পেশাদারী শিল্পের জগতে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ, উদাত্ত, অথচ মধুর কণ্ঠের 'বলবীর, বল উন্নত মম শির' কিংবা 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত' প্রভৃতি লাইনের আবৃত্তি একজন আনাড়ি শ্রোতার হৃদয়কেও ভরিয়ে দেয়, এ বোধহয় বলবার অপেক্ষা রাখে না। কাজী সব্যসাচীর জনপ্রিয়তা ও সাফল্যে একদিকে যেমন বহু তরুণ আবৃত্তিকার উদ্বুদ্ধ হয়ে আবৃত্তিশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি কিছু 'দুর্লক্ষণ' ও 'আবিলতা' মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আবৃত্তিকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কাজী সব্যসাচীর তড়িৎ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হুবহু তাঁরই অনুকারী কয়েকজন তরুণ আবৃত্তির আসরে নেমে পড়লেন;.... প্রয়োগশিল্প হিসেবে আবৃত্তির শক্ত বনিয়াদ গড়ে উঠতে না উঠতেই প্রকৃত আবৃত্তিকারের সংজ্ঞা ও কুলশীল গোত্র নির্ধারণের ভেদবুদ্ধিতে কেউ কেউ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। পূর্বসূরীদের অবদানের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা না দিয়ে কাজী সব্যসাচীকেই আদি আবৃত্তিকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে সামনে রেখে আত্মগরিমা প্রচারে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।"[৭] বাঙালির আবৃত্তি শিল্পের ধারাকে এরপর সমৃদ্ধ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু, অমিতাভ বাগচী প্রমুখ সুদক্ষ শিল্পী।

৩

আবৃত্তি শিল্পকে প্রবল জনপ্রিয় করে তুলেছেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি বাঙালি, এমনকি অবাঙালিদেরও হৃদয়ে অনুরণিত হয় তাঁর কণ্ঠের আবৃত্তি। দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে বাংলা আবৃত্তিজগৎকে তিনি ভরিয়ে রেখেছেন তাঁর হিরন্ময়ী কণ্ঠের জাদু দিয়ে। আবৃত্তি শিল্পের যথার্থ ও উত্তুঙ্গ উত্তরণের নাম বোধহয় ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতার মেজাজ বুঝে , এক কলম কবিতা না-পড়া ও না-বোঝা মানুষের কাছে কবিতাকে পৌঁছে দেওয়া আবৃত্তিশিল্পীর কাছে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মত। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বারবার , বহুবার। আবৃত্তিকে মনোগত বিলাসের সীমা থেকে বের করে ঘাটে , মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার যে পথ শম্ভু মিত্র, কাজী সব্যসাচী প্রমুখেরা দেখিয়েছেন, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথের যোগ্য উত্তরসূরি। মধুসুদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় থেকে জয় গোস্বামী, মল্লিকা সেনগুপ্ত, শ্রীজাত প্রমুখ কবিদের কবিতা তাঁর কণ্ঠে নতুন প্রাণ পায়। আবৃত্তিতে যন্ত্রানুষঙ্গের যথার্থ ব্যবহার করে কবিতাকে অনুভূতির অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেন ব্রততী। আবৃত্তির সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে শিল্পকে তিনি অভিনবত্ব দান করেন।

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন – " কবিতা আমার প্রথম কদমফুল, কবিতা আমার শেষ পারানির কড়ি", কিংবা "অন্যায়ের স্বীকারোক্তি, প্রতিবাদের ভাষা।" পরিপূর্ণ আত্মমগ্ন শিল্পী ব্রততীর আবৃত্তি শিল্পে যথাযথ যাত্রা শুরু ১৯৯৬ সালে রবীন্দ্রসদনে 'এক সন্ধ্যায় একা ব্রততী' অনুষ্ঠান দিয়ে। তারপর একক আবৃত্তিতে তিনি যোগ করেছেন নানান মঞ্চ প্রকরণ। ব্রততী আবৃত্তি শিল্পের চিরাচরিত সংজ্ঞা ভেঙে নতুন সংজ্ঞা রচনা করলেন, শ্রাবণিক মাধুর্যে ভরিয়ে তুললেন আপামর শ্রোতা, দর্শকের হৃদয়। আবৃত্তিকে সত্যিকারের অডিও-ভিসুয়াল করে তুললেন তিনি। আলো, ধ্বনি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলাপ, দৃশ্যায়ন দিয়ে আবৃত্তিকে শিল্পের উঁচু সীমায় পৌঁছে দেন তিনি। তখন শুধু কবিতা নয়, ব্রততীর শৈল্পিকসত্তা প্রতিবিম্বিত হয় শ্রোতা-দর্শকের হৃদয়মুকুরে। ১৯৯৯ সালের ১৮ জুন 'সানন্দা' পত্রিকার 'একক সন্ধ্যার বহুতা' শীর্ষক কলমে লেখা হয় – " আবৃত্তি পরিষদের আয়োজনে রবীন্দ্রসদনে ' এক সন্ধ্যায় একা ব্রততী' বন্দ্যোপাধায়ের একক আবৃত্তির আসরে চমকিত হবার মত ঘটনা এই যে, প্রথমত, সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে টানা তিন ঘন্টা ব্রততীর গল্প কবিতা আবৃত্তি ক্ষমতা, নিশ্ছেদ নির্ভুল অনর্গল তাঁর

স্মরণের ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত, কলকাতা শহরে কেবল একজনের একক আবৃত্তির আসরে সব কটি আসন ভর্তি হয়ে যাওয়া ভারতের আর কোন শহরে এইভাবে আবৃত্তি শুনতে হল উপচে পড়া শ্রোতার সমাগম হয় না, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"[৮] আসলে সে সব জায়গায় তো ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিল্পী নেই। দিনের পর দিন বাড়তে থাকে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। কণ্ঠের হিরণ্ময়তা, ভাবের যথাযথ অনুভূতিময় প্রকাশ, উচ্চারণের ধীরোদাত্ততা, দীর্ঘকালীন চর্চা, অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং যন্ত্রানুষঙ্গ ও দৃশ্যপট রচনা – সব মিলিয়ে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তিশিল্পকে সারস্বত দরবারে উঁচু আসন দান করেছেন। আর নিজেও হয়ে উঠেছেন আবৃত্তিশিল্পের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত এই মর্মে লেখেন – "Bratati has elevated the art of recitation to new height by dint of her total commitment to pronounciation, modulation and emotive powers that bring the best out of each piece carefully selected by her forgiving her voice to . It is a rare equation between the thought and its expression that proclaim her professionalism." [৯]

নিজের শিক্ষাকে কেবল নিজের মধ্যে বন্দী রাখলে সমাজ বঞ্চিত হয়, সেই মানুষের অর্জিত শিক্ষার দ্যুতি থেকে, হয়তো সারস্বত সাধনার জগৎও অপমানিত হয়। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল তাঁর অর্জিত শিক্ষাকে বাংলার প্রান্তে, প্রান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে তাঁর আবৃত্তিচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। গড়ে ওঠে 'কাব্যায়ন'; যা কাব্যের আশ্রয়, আবার কাব্যের গতিও। মাত্র ৫-৬ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কাব্যায়নের যাত্রা শুরু ১৯৯৯ সালে। আজ কাব্যায়নের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক হাজারের কাছে। গল্ফগ্রীন, টালিগঞ্জ, সল্টলেক, সোনারপুর, দাশনগর, বৈদ্যবাটী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি জায়গায় কাব্যায়নের শাখা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবর্ষে 'আনন্দঘরে'র এইডস্ রোগাক্রান্ত বাচ্চাদের জন্য তাঁর 'চিরসখা' অ্যালবামের অর্থ নিবেদন করেন ব্রততী। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন শিল্পীকেও মানুষ হিসাবে বড় করে। ব্রততী বড় শিল্পী, বড় মানুষও। হয়তো অত্যুক্তি হবে। তবু বলি, একমাত্র একনিষ্ঠ এই আবৃত্তিসাধকই মঞ্চে উঠে আবৃত্তি করতে পারেন –

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম , শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য

অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক;
.... শুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।[১০]
[' শুধু কবিতার জন্য', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

বাঙালির আবৃত্তিশিল্পের প্রবহমান ধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন আরো অনেক আবৃত্তিশিল্পী। এদের মধ্যে রয়েছেন – মেঘ বসু, শোভনসুন্দর বসু, প্রণতি ঠাকুর, সুমন্ত্র সেনগুপ্ত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আবৃত্তি শিল্পের ব্যাপক ও সর্বাত্মক রূপ দিনের পর দিন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার পাশাপাশি আবৃত্তিও আজ সারস্বত সমাজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্দেহ নেই।

৪

আমরা আগেই জেনেছি আবৃত্তি একটি সুপ্রাচীন শিল্পমাধ্যম। এই সুপ্রাচীন শিল্পের লৌকিক রূপ এবং উপভাষাগত আঞ্চলিকরূপও বর্তমান। এগুলি হল ব্রতকথা, পাঁচালি, বিভিন্ন আঞ্চলিক কবিতা প্রভৃতি। ব্রতগুলি পরিপূর্ণভাবে মেয়েদেরই। তাদের ইপ্সিত কিছুলাভের কামনা ব্রতগুলির মধ্যে প্রকাশ পায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে বিভিন্ন ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থ থেকে মেয়েদের তোষলা ব্রতের কামনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে –

কোদাল কাটা ধান পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার – আলো বেটা পাব,
সভা – আলো জামাই পাব........
তোমার কাছে মাগি এই বর –
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।[১১]

এই সংলাপধর্মিতা আবৃত্তির বিশেষ একটি দিক। মেয়েরা তাদের সরল বাচনিকভঙ্গিতে আবৃত্তির মধ্যদিয়ে তাদের ভাবনাকে প্রকাশ করে। ব্রতকথার পরে আসি পাঁচালির কথায়। পাঁচালি আবৃত্তিতে পুরুষের সংযোগ ঘটল। মধ্যযুগে পাঁচালি রচনা অন্যমাত্রা লাভ করেছিল। সত্যনারায়ণের পাঁচালি,শনির পাঁচালি ইত্যাদির কথা বলা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে পাঁচালি পাঠ তথা আবৃত্তির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সমবেত আসরে 'শ্রীরাম পাঁচালি' তথা

রামায়ণ পাঠ শ্রোতার হৃদয়হরণ করত। এখনও রামায়ণ পাঠের জনপ্রিয়তা আছে। জনমনোরঞ্জনের জন্য পাঁচালি পাঠ করা হত। তবে এই আবৃত্তিতে ছন্দের পুনরাবৃত্তি একঘেঁয়েমির সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন ঔপভাষিক অঞ্চলে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক কবিতাও বাংলার আবৃত্তিশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

একথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে, বাংলা ভাষা একটি প্রাদেশিক ভাষা। আর সেই ভাষায় রচিত শিল্প ও সাহিত্য প্রাদেশিক শিল্পসাহিত্য। কিন্তু এই প্রাদেশিক শিল্পকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াস চলেছে। বাংলা আবৃত্তিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালি আবৃত্তিশিল্পীরা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশের সীমানায় বাংলা ভাষার আবৃত্তিকে আবদ্ধ না রেখে প্রবাসের অঙ্গনে তাকে ছড়িয়ে দেওয়ায় আবৃত্তি শিল্পেরও যেন বিশ্বায়ন ঘটে গেছে। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়রা আমেরিকা, ইউরোপ, বাংলাদেশ প্রভৃতি জায়গায় বাংলা আবৃত্তিকে সম্মানের আসন দান করেছেন। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ওয়েবসাইটের 'Tours' শিরোনামাঙ্কিত অংশে- " In this venture, the Muse has blessed me with such equations that I have archieved in over a thousand live performances all over the country and to astute audiences in the USA and the Middle East.

In a memorable series of elocution tours of New York, New Jersey, Philadelphia, Detroit, Kansas and other cities in USA during July-August, 2000 and in Kuwait City in November 2002, I had the wonderful opportunity to reach out to Indians residing over there and nationals of those countries as well. It is really memoirs to be cherished as they had given me incredible chance to imbibe multi-cultural ethnicity."[১২] ঐতিহ্যের টানে বিশ্বের নানান প্রান্তের বাঙালিরা আজ আবৃত্তিচর্চায় সামিল হয়ে প্রাদেশিক বাংলার অবহেলিত ছায়াময় মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করেছেন। বুক ঠুকে তারা আজ বলতেই পারে –

বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ,
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।।

।। তথ্যসূত্র ।।

১। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় – 'শুধু আবৃত্তির জন্য', দীপ প্রকাশন, এপ্রিল ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৪৩-১৪৪।

২। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত - 'মধুসূদন রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ, মার্চ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫৩২।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩১।
৪। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত – 'বিষয়: আবৃত্তি', নেপথ্য পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭।
৫। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – 'নিঃসঙ্গ সম্রাট', শারদীয় দেশ, ১৪১১, পৃষ্ঠা-৩৮১।
৬। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত – 'বিষয়ঃ আবৃত্তি', নেপথ্য পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৭।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৪।
৮। www.bratati.com > Bratati > Press Releases
৯। Ibid > Ibid > opinions
১০। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় – 'শুধু আবৃত্তির জন্য', দীপ প্রকাশন, এপ্রিল ২০১০, পৃষ্ঠা-১৯৫।
১১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর – 'বাংলার ব্রত', বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৪১২, পৃষ্ঠা– ৩৩।
১২। www.bratati.com > Bratati > Tours

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ বাচিকশিল্পী নরেশ নন্দী, বন্ধুবর অয়ন পাল।

....

বাঙালির কল্পবিজ্ঞান চর্চা

ঈশিতা খাঁ

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আমি' কবিতার উপরিউক্ত কয়েকটি চরণে যে সবুজ পান্না, রাঙা চুনি, আলোময় আকাশ, সুন্দর গোলাপ ইত্যাদি অতি পরিচিত বিষয়বস্তুর কথা উঠে এসেছে, তাদের সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের চেতনাস্থিত দুর্লভ কল্পনাশক্তির গুণেই অসাধারণত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যেকোন দেশের, যেকোন সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই তার হাত ধরেছে কল্পনা; শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তাকে নব নব রূপও দান করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল- আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের আসরটি যখন মূলত কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রবহমান, ঠিক তখনই সেই আসরে হাতে কল্পনার তুলি ও পাত্রে বিজ্ঞানের রঙ নিয়ে এক বিশেষ ঘরাণার আবির্ভাব ঘটেছে, যার নাম 'কল্পবিজ্ঞান'।

'কল্পবিজ্ঞানে'র শব্দতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্ব : 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটি 'কল্পনা' ও 'বিজ্ঞান'– এই দুটি পৃথক মৌলিক শব্দকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠা একটি যৌগিক শব্দ এবং এটি ইংরাজি 'Science Fiction' – এর বাংলা তর্জমা। আর শ্রেণিবিন্যাসের দিকথেকে গল্পগুলি কিশোরসাহিত্যের অন্তর্গত। তবে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও তার রস গ্রহণ করতে পারে।এখন প্রশ্ন হল, কল্পবিজ্ঞানের গল্পকে কিশোরসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল কেন? উত্তরে বলা যায়, কৈশোর

(১২-১৮ বছর) উপনীত হয়েই মানসিক পরিণমনের (Maturation) দিকে মানুষ অগ্রসর হয়। তার ধারণার(Concept) বিকাশ যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহও এই বয়সেই বাড়ে। সবচেয়ে বড় কথা হল, কিশোর বয়সে কতকগুলি চাহিদা তৈরি হয়। যেমন – জ্ঞানের চাহিদা, দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা ইত্যাদি, যা পূরণ করতে কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলোর জুড়ি মেলা ভার।

প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও তার সময়কাল : বাংলা সাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান লেখক হলেন হেমলাল দত্ত। তাঁর রচিত গল্পের নাম – 'রহস্য'। গল্পটির নায়ক নগেন্দ্র, যে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে এমন অনেক অবাস্তবতায় মোড়া, অলৌকিকতায় ঘেরা প্রযুক্তি বা টেকনোলজির সম্মুখীন হয়, যেগুলি আজকের বিচারে ততটা আশ্চর্যজনক না হলেও, সেই সময়কার পাঠকসমাজে অবশ্যই বিস্ময় উদ্রেককারী। যেমন –

১) স্বয়ংক্রিয় ডোরবেল – ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় ডোরবেল। ফলে এটি সেযুগে এবং এযুগে অত্যাশ্চর্য বস্তু না হলেও তার স্বয়ংক্রিয়তায় তৎকালীন যুগের মতো আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে।

২) বিপদসূচক ঘণ্টা বা চোরধরার ঘন্টা (burglar alarms) - গল্পটির রচনাকালে এটির আশ্চর্যময়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আজ এই যন্ত্রের সঙ্গে আমরা অতি পরিচিত।

৩) জামাকাপড় পরিষ্কারের যান্ত্রিক ব্রাশ – তখন ব্রিটিশদের আগমনের কারণে কোর্ট-প্যান্ট পরিচ্ছন্ন রাখার হস্তচালিত ব্রাশ সম্বন্ধে মানুষ ওয়াকিবহাল হলেও তার যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। আজকের দিনে ওয়াশিং মেশিন বা ইলেকট্রিক ব্রাশ ইত্যাদি সত্যিকথায় বা বাস্তবে পর্যবসিত হয়েছে।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলিকে অবশ্যই তার সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পিছনে ফেলে কয়েক গুণ এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের গল্পে এমন সব উপাদানের কথা থাকবে, যা মানুষের অধীত বিদ্যা বা জ্ঞানের অতীত, সময়ের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। শুধু তাই নয়, বর্ণনীয় উপাদানগুলি প্রতিফলিত করবে উন্নততর এবং আধুনিকতর বিজ্ঞানকে, যা মানবজাতির দীর্ঘলালিত আকাঙ্ক্ষার ধন। তবে সেই সঙ্গে একথাও বলাবাহুল্য যে, কল্পবিজ্ঞানের গল্প অবশ্যই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও সহায়তাকারী। তাই Samuel R. Delany বলেছেন –

" the essential element of science fiction is that which may be possible." Rod Serling's একইরকমভাবে বলেছেন – " science fiction is the improbable made possible."

এবার আসা যাক, গল্পটির প্রকাশকাল বিষয়ক আলোচনায়। গল্পটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্র সাধুর সম্পাদিত 'বিজ্ঞানদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সময় আমাদের দেশ বণিক ব্রিটিশের পদানত। কিন্তু ইতোমধ্যে এই শতাব্দীর সূচনাতেই বাংলায় নবজাগরণ ঘটে গেছে। ফলে মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে মানবতাবোধ, যুক্তিবাদ, ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, নব্যভক্তিবাদ, স্বদেশচেতনা, ইংরাজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা। তারই ফলস্বরূপ দেশের মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চাইছে, চাইছে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার উর্ধ্বে উঠতে। এরই পাশাপাশি আরও দেখা যাচ্ছে যে, ডালহৌসির আমলে রেললাইন পাতা হয়েছে। আমাদের দেশ পরপদানত হয়েই ধীরে ধীরে আত্মস্থ করেছে নিত্যনতুন প্রযুক্তিকে, যন্ত্রকে। গড়ে উঠছে নানান শিল্প। শুরু হচ্ছে শিল্পযুগ বা Industrial Age, নির্মাণ হচ্ছে কলকাতা নগরীর নতুন শহুরে এলিট সমাজের।

সময়কে এবং বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে কিভাবে Science fiction গড়ে ওঠে, সেই সম্বন্ধে Isaac Asimov বলেছিলেন – " True science fiction could not really exist until people understood the rationalism of science and began to use it with respect in their stories." - উক্তিটি অনুসরণে বলা চলে যে, বঙ্গ রেনেসাঁসের যুক্তিবাদকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার পর তাকে নিজের মতো করে জারিত করেই হেমলাল দত্ত তাঁর কল্পবিজ্ঞানের গল্পে তখনকার সময়কে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন। তখন 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' হয়ে যায় 'পলাতক তুফান' গল্পটির প্রথম পর্ব, তার নতুন নাম হয় 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। একটি বোতলে রাখা কেশতেলের (hair oil) কয়েক ফোঁটায় কিভাবে সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় তা নিয়েই জমে ওঠে মূল গল্প। ঝড়ের তাণ্ডব, ভয়াবহতা– সবমিলিয়ে গল্পটি পাঠকের মনে টানটান উত্তেজনাময় শিহরণ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, লেখক গল্পটিতে ঔপনিবেশিক অবদমনের বিরুদ্ধাচারণ করে তাতে চারিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করার ধারণা ও তাদের ধ্বংসমূলক আঘাত করে তৎকালীন পাঠকের হৃদয়ে জমে থাকা ক্ষোভ, রোষেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই সব দিক থেকেই গল্পদুটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তাহলে দেখা গেল, উনিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা সাহিত্যের

রাজপথে কল্পবিজ্ঞানের গল্পের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬ খ্রি.) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫ খ্রি.) – এই দুটি প্রবন্ধগ্রন্থের যে অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে সেকথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ, বাঙালির চিন্তার রাজ্য যাতে প্রসারিত হয় এবং বিজ্ঞানবিষয় যাতে জনপ্রিয়তা লাভ করে সেই উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষার শৈশবকালের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রাবন্ধিকদের দ্বারা বিজ্ঞানবিষয়ক উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল। ফলে বাঙালির চিন্তায়, চেতনায় বিজ্ঞানচর্চা একটা বিশেষ আসন লাভ করল। বিজ্ঞানকে খুব কাছ থেকে জানতে পেরে তাকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তায় উৎসাহবোধ করল বাঙালি সাহিত্যিকগণ। তাদের কলমের যাদুর ছোঁয়ায় কল্পনার ডানায় ভর করে বিজ্ঞান অপূর্ব এক ধারার সৃজন ঘটাল, যে ধারায় আপামর বাঙালি পাঠক গা না-ভাসিয়ে পারলো না।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় : বিংশ শতাব্দীতে এসেও বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলির গতিরুদ্ধ হয়নি, উপরন্তু বলা যেতে পারে যে, এই শতাব্দীতেই কল্পবিজ্ঞান স্পর্শ করেছে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখর। কারণ, এই সময়ে বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে – তার জীবনের পরতে পরতে এসে মিশেছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি; সাহিত্যক্ষেত্রে বেড়েছে বিজ্ঞাননির্ভর প্রবন্ধের সংখ্যা, যেমন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিজ্ঞান সভা' প্রবন্ধ, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রবন্ধ, 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সৌরজগত' প্রবন্ধ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত 'প্রকৃতি' প্রবন্ধ ইত্যাদি। আবার সাহিত্যে উঠে এসেছে নানা বিজ্ঞানীর চরিত্র, উদাহরণ – যন্ত্রবিদ্ অভীক ('রবিবার'), ভূবিজ্ঞানী নবীনমাধব ('শেষকথা') ইত্যাদি। আর বিজ্ঞানকে খুব কাছ থেকে এইভাবে অনুভব করার ফলেই তার সঙ্গে কল্পনার মিথষ্ক্রিয়ায় তৈরি কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো এই যুগে অন্যতর এক মাত্রা লাভ করেছে। এখন, যাঁরা অনন্য লেখনীশক্তির দ্বারা কল্পবিজ্ঞানকে সাফল্যের উচ্চশিখরে উঠতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১) সুকুমার রায় : বাংলা সাহিত্যে উদ্ভটরসের পরিবেশনে সুকুমার রায়ের খ্যাতি কিংবদন্তী তুল্য। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি এই উদ্ভট বা ছেলেভুলানো আজগুবি রসের সাহিত্য বা (nonsense) সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থভাবে বিজ্ঞানেরও মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন এবং সেই বিজ্ঞানকে

গড়ে তুলেছিলেন অদ্ভুতুড়ে কল্পলোক থেকে আহৃত উপাদান সহযোগে। 'খুড়োর কল' নামক কবিতাটি তার যথার্থ উদাহরণ। তবে এইরকম উদ্ভট, অর্থহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ, খামখেয়ালীপূর্ণ সাহিত্যের পাশে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনীভিত্তিক প্রবন্ধ-ও রচনা করেছিলেন তিনি। যেমন – 'পাস্তুর', 'গ্যালিলিও' ইত্যাদি। আর এসবের পথ ধরেই তাঁর সাহিত্যের জগতে স্থান পেল 'হেসোরাম হুশিয়ারির ডায়রি' ও 'শনির দেশে'র মতো দুটি কল্পবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ।

আর্থার কোনান ডয়েলের 'The Lost World' রচনাটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা 'হেসোরাম হুশিয়ারির ডায়রি' নামক প্রবন্ধটিতে কল্পনা, বিজ্ঞান ছাড়াও আছে উদ্ভট, অর্থহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং খামখেয়ালি গল্পরস। প্রবন্ধটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর এই প্রবন্ধের মাধ্যমে কল্পবিজ্ঞানের জগতে প্রথম পদার্পণ করে সুকুমার রায় যে সমস্ত বিশেষত্বের চিহ্ন রেখে গেলেন, সেগুলি হল –

ক) মজার মেজাজে, হাসির মোড়কে, কল্পবিজ্ঞানকে যে আবৃত করা যায় তা প্রমাণ করে দিলেন।

খ) শব্দতত্ত্বকে অতিক্রম করে শব্দ নিয়ে এক মজার খেলায় মেতে (ছড়াতেও তিনি ব্যাকরণকে ছাড়িয়ে বাংলা শব্দকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন – 'ট্যাঁশগরু'; 'হুকোমুখো হ্যাংলা'; 'বকচ্ছপ'; 'হাঁসজারু' খিচুড়ি ইত্যাদি) বিভিন্ন জীবের (এই সমস্ত অদ্ভুত জীবকে প্রোফেসর হুঁশিয়ারি দেখেছিলেন বান্দাকুশ পর্বতে ভ্রমণকালে) প্রকৃতিকে অনুসরণ করে সেই প্রকৃতিকে বাংলা শব্দের দ্বারা বুঝিয়ে শেষে ল্যাটিন শব্দ যোগ করে তাদের এমনসব নামকরণ করলেন, যে সমস্ত নাম সচরাচর আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন – 'খিটখিটে খুঁতখুঁতে গোমড়া মেজাজের জন্তু'র নাম 'গোমড়াথেরিয়াম'। এখানে 'গোমড়া' এই বাংলা শব্দটি জন্তুটির প্রকৃতিকে নির্দেশ করছে, 'থেরিয়াম' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ। এইরকম আরো নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমস্ত প্রবন্ধটি জুড়ে। যেমন – 'হ্যাংলা থেরিয়াম', 'চিল্লানোসোরাস' ইত্যাদি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে জেমস জয়েসও এইরকম কিছু গবেষণাধর্মী আধুনিক মেজাজের শব্দবন্ধের খেলায় মেতেছিলেন। আর আমাদের বাংলা সাহিত্যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই 'bi-lingual words'-এর পত্তন ঘটালেন সুকুমার রায়।

অন্যদিকে 'শনির দেশে' প্রবন্ধটিতে দেখা যায় Fun -এর উপস্থিতি। আর

কল্পবিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশ পেয়েছে, সেটি হল – মহাকাশ ভ্রমণের সূত্রে মহাশূন্যের দৃশ্যাবলির উল্লেখ। এছাড়া আর কোন কল্পবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধটি গ্রহণ করেনি। বরং এটি কল্পনানির্ভর বিজ্ঞান অপেক্ষা মহাকাশবিজ্ঞানের যথাযথ তথ্যে পরিপূর্ণ। তাই একে পুরোপুরি কল্পবিজ্ঞান-মূলক প্রবন্ধ বলা ঠিক নয়।

তবে সবদিক থেকে বিচার করে একথা অবশ্যই বলা চলে যে, প্রবন্ধদুটি কল্পবিজ্ঞানের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনাকারী।

২) হেমেন্দ্রকুমার রায় : ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে হেমেন্দ্রকুমার রায় 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন তাঁর রচিত কল্পবিজ্ঞান গল্প 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন'। আবার 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর 'ময়নামতীর মায়াকানন'(১৯২৬-২৭), 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন'(১৯৩৯) ইত্যাদি গল্প। আর ১৯50 খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করলেন 'অমানুষিক মানুষ' গল্পটি, যার কাহিনিবিন্যাসকে অনুসরণ করে আমরা বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্পের দুটি বিশেষ লক্ষণকে খুঁজে পেলাম। আর সেগুলি হল –

ক) উচ্ছেদ বা ধ্বংসপ্রবণতা

খ) অনুকরণের মনোভাব

এগুলি কল্পবিজ্ঞানের গল্পের অতি প্রচলিত বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও এই দুটি বৈশিষ্ট্য যে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্পে স্থান করে নিল, তার কারণ হল – বাঙালি চরিত্রের দ্বিবিধ সত্তার উপস্থিতি।

(১) একদিকে স্বাধীনতার পূর্বে কিছু বাঙালির ইংরেজ শাসকদের প্রতি বশ্যতাজনিত মনোভঙ্গির কারণে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও আমাদের দেশ ইংরেজ-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে এই অনুকরণাত্মক মানসিকতা ফুটে উঠেছে সাহিত্যে।

(২) অন্যদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্ন কিছু মানুষের মধ্যে লালিত হয়েছে বলেই সাহিত্যে অতিমানবিক গুণসম্পন্ন দৃঢ় ও প্রবল পরাক্রমশালী নায়ক কল্পিত হয়েছে জাতির সেই চরমদুর্দশার দিনে, যার দ্বারা ঔপনিবেশিক ইংরেজদের উচ্ছেদ করার বা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়েছে।

(৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রেমেন্দ্র মিত্র যেসমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল– 'সেকালের কথা'(১৯২৭), 'পাতালে পাঁচ বছর'(১৯৩১,রামধনু), 'কুহকের দেশে'(১৯৩১-৩৩,মৌচাক), 'পিঁপড়েপুরাণ'

(১৯৩১), 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (১৯৩৭, রংমশাল), 'ঘনাদা সিরিজ' (১৯৪৫-১৯৮৮), 'মনুদ্বাদশ' (১৯৬৪), 'সূর্য যেখানে নীল' (১৯৮৮) ইত্যাদি। তবে উপরিউক্ত গল্পগুলির মধ্যে ঘনাদা সিরিজের গল্পগুলি কল্পবিজ্ঞান হিসাবে সবচেয়ে অনবদ্য। ঘনাদা বা ঘনশ্যাম দাসের যাত্রা শুরু ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'মশা' গল্পটির মাধ্যমে, যেটি 'আলপনা' পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার নানা গল্প লিখেছেন। এই ঘনাদার গল্পগুলোর নতুনত্বের দিক হলো –

এক।। এখানে লেখক কল্পবিজ্ঞানকে নিয়ে এলেন আড্ডাসাহিত্য বা বৈঠকীসাহিত্যের ফ্রেমে অর্থাৎ, কল্পবিজ্ঞানের গল্পে আনলেন আড্ডার বৈশিষ্ট্য।

দুই।। গল্পগুলোতে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেল, সেগুলি হল-

ক) রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, যার ফলে গল্পগুলোতে ফুটে উঠল 'বিস্ময়রস'।

(খ) আমাদের চারপাশের সমাজে ঘটে চলা নানা ঘটনার বিবরণ। যেমন – যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি।

(গ) ব্যঙ্গ-কৌতুকের মোড়কে অদ্ভুতভাবে রাজনীতি ও ভূগোলের বর্ণনা।

(ঘ) কল্পনায় ঘেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির কথা।

সবমিলিয়ে গল্পগুলি টিনএজার পাঠকের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সচেতনতা এনে তাদের পরিণত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজের কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলোকে বলা যায় Soft science fiction বা নমনীয় কল্পবিজ্ঞান। আবার, সমাজবিজ্ঞান (মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিদ্যা) এই গল্পগুলোর অবলম্বন হওয়ায় এবং এতে চরিত্র আর তার অনুভবের উপর জোর থাকায় এদের সামাজিক কল্পবিজ্ঞান বা social science fiction-ও বলা চলে।

(৪) বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ও কেশীতিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য: এই তিন ভট্টাচার্য 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদনাকালে সেই পত্রিকাতেই তাঁদের কল্পবিজ্ঞান গল্পের প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁদের রচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি হিন্দু পুরাণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে – যেখানে চরিত্র হয়ে এসেছে নানা পৌরাণিক চরিত্র – কখনো পুরাণের দেবতাগণ,

কখনো বা দেবতাতুল্য ব্যক্তি। আবার যেখানে পৌরাণিক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানে চরিত্রবিহীনতায় গল্পগুলো অন্যরকমের হয়ে উঠেছে। আর গল্পগুলোর পুরাণনির্ভর শিরোনামে এসে মিশেছে অসামান্য কৌতুকময়তা। যেমন– ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'রামধনু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মঙ্গলপুরাণ' গল্পে দেখা যায় মহাভারতের কাহিনির অনুসৃতি। কিন্তু এরই সঙ্গে আছে মঙ্গলগ্রহের কল্পনাভিত্তিক বিজ্ঞাননির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনা – যার ফলে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্প আধুনিকতা ও ঐতিহ্য দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে নতুনত্বের দিকে আরো একধাপ অগ্রসর হতে পারল।

(৫) লীলা মজুমদার: লীলা মজুমদারের 'বাতাসবাড়ি'(১৯৪৮) কল্প-বিজ্ঞানের এক অসাধারণ গল্প।

(৬) রাজশেখর বসু : ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কজ্জলী' গ্রন্থের অন্তর্গত রাজশেখর বসুর 'উলটপুরাণ' গল্পটি কল্পবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই রচিত। আর সেই বৈশিষ্ট্য বলে যে – সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং নতুন সমাজতন্ত্রের কথা স্থান পাবে কল্পবিজ্ঞানের গল্পে। উলট পুরাণেও আছে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের এক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা, যেখানে ইংরেজ ও ভারতীয়রা তাদের নিজ বাস্তব অবস্থান থেকে সরে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের জায়গা দখল করেছে। যেমন– বাস্তবে ইংরেজরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আর গল্পে আছে যে, ভারতীয়রা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এইরকম বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আরো অজস্র উদাহরণ গল্পটিতে বিদ্যমান। সেই দিক থেকে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে গল্পটি সামাজিক বা নমনীয় কল্পবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করেছে।

অবশ্য এর কিছু বছর পরেই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পরশুরাম রচনা করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক কল্পবিজ্ঞানের গল্প – 'গা মানুষ জাতির কথা'। এই গল্পে কল্পবিজ্ঞানের যে যে বৈশিষ্ট্য উঠে এল সেগুলি হলো –

(ক) অদেখা-অজানা-অপরিচিত প্রাণী, যেমন- গা-মানুষ জাতিরা, যারা প্রকৃতপক্ষে ইঁদুর, কিন্তু পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য নিক্ষিপ্ত বোমার থেকে নির্গত গামারশ্মির প্রভাবে এদের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে।

(খ) বৈজ্ঞানিক চরিত্র এবং কিছু চেনা চারপাশে দেখা মানুষের উপস্থিতি। যেমন– বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ ভৃঙ্গরাজ নন্দী, কর্মযোগী ধর্মদাসজী, বৃহত্তর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ।

(গ) উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপস্থিতি। গল্পটিতে উক্ত

ভেরোসিটিন ইঞ্জেকশান, বিশ্বশান্তিস্থাপক বোমা- এর উদাহরণ। সবমিলিয়ে গল্পটি হাসির মোড়কে পরিবেশিত একটি অনবদ্য কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এছাড়াও পরশুরামের লেখা আরো দুটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প হলো 'পরশপাথর' (১৯৪৮) ও 'মাঙ্গলিক' (১৯৫৫)।

(৭) সত্যজিৎ রায় : ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নামের কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মাধ্যমে এক বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটল, তার নাম প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। সত্যজিৎ রায় প্রফেসর শঙ্কুর ৩৮ টি পূর্ণাঙ্গ এবং ২০ টি অসম্পূর্ণ ভ্রমণকাহিনি বা অভিযানের বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাগুলির প্রত্যেকটিই ডায়েরির আকারে লেখা। তবে লেখক গল্পগুলিতে ডায়েরি বা দিনপঞ্জির যে একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন– অন্তরঙ্গতা, এপিসোডিক ঘটনাময়তা, দিন-ক্ষণচিহ্নিতকরণ, নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কল্পবিজ্ঞানের কিছু বৈশিষ্ট্য। সেগুলি হল-

(ক) গল্পগুলিতে মহাকাশভ্রমণের সূত্রে মহাশূন্যের দৃশ্যাবলির উল্লেখ আছে। উদাহরণ – 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'র বর্ণনা – " এখন দেখছি সারা আকাশময় সাপের মতো কিলবিলে সব আলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে....."।

(খ) অনেক বিজ্ঞানী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়।

(গ) সৌরজগতের পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্যগ্রহ বা এই সৌরজগতের বাইরে অবস্থিত অন্যতর আরেক জগত বা পৃথিবীর উপস্থিতি গল্পগুলোতে দেখা যায়। যেমন– 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পের মঙ্গলগ্রহ বা টাফাগ্রহ ইত্যাদি।

(ঘ) গল্পগুলিতে চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে ভিনগ্রহের অদ্ভুত, অজানা জীব (উদাহরণ – মঙ্গলগ্রহ এবং টাফাগ্রহের প্রাণী), শঙ্কুর মনুষ্যোচিত রোবট বিধুশেখর ইত্যাদি।

(ঙ) উন্নততর প্রযুক্তির উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন- Fish pill, যা একবার খেলে বিড়ালকে সাতদিন আর কিছু খেতে হয়না। এছাড়াও আছে Snuff gun বা নস্যাস্ত্র, বটিকাইণ্ডিকা বড়ি, অ্যানাইহিলিন পিস্তল, লিঙ্গুয়াগ্রাফ ইত্যাদি। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত মানুষের ব্যবহার্য ওষুধ, অস্ত্র, যন্ত্রগুলির নামকরণে পিতা সুকুমার রায়ের মতোই সত্যজিৎ রায়ের মধ্যেও দেখতে পাই শব্দ নিয়ে খেলার প্রবণতা।

(চ) গল্পগুলিতে আছে paranormal abilities এর কথা। 'শঙ্কুর সুবর্ণসুযোগ' গল্পে প্ল্যানচেটের উল্লেখ আছে।

(ছ) গল্পগুলি জুড়ে আছে অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, ও রহস্যময়তা।

(জ) গল্পগুলির মূলরস হলো 'বিস্ময়রস' অর্থাৎ আশ্চর্যময়তা এই গল্পগুলির প্রধান বিশিষ্টতা।

- উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও শঙ্কুর গল্পের লক্ষণীয় বিষয় হলো – লেখক শঙ্কুর শেষ ৪০তম অভিযানের কাহিনি অবলম্বন করে তার সম্পর্কিত প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' রচনা করেছেন। তারপরে তার প্রথম অভিযানের কাহিনি থেকে ৩৯তম অভিযানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ক্রমপর্যায়ে। বিষয়টিকে একটি চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যেতে পারে –

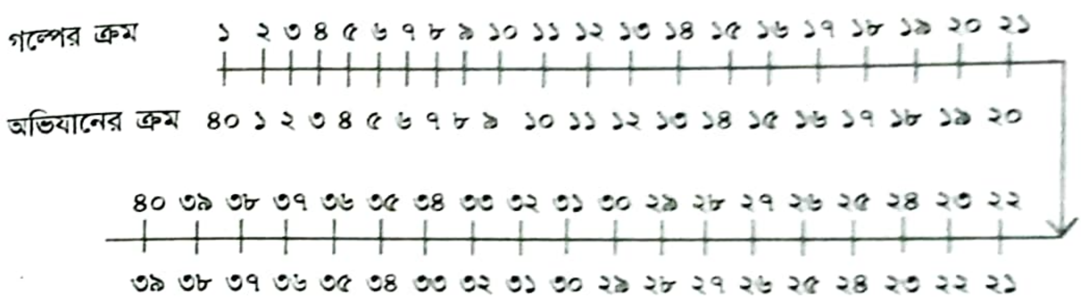

অর্থাৎ লেখক শঙ্কুর কাহিনি শেষ থেকে শুরু করেছেন। আর এই চমকপ্রদ শৈলির মাধ্যমে শঙ্কুকে এবং তার কাহিনিকে লেখক যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্যতা দান করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, হালকা হাসির ছোঁয়ায় গল্পগুলিতে এক অন্যমাত্রা অন্বিত হয়েছে। ফলে পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থেকেছে মন্ত্রমুগ্ধ। এছাড়াও সত্যজিৎ রায় টুকরো টুকরো কিছু কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন। যেমন – 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', 'বৃহচ্চঞ্চু' ইত্যাদি।

(৮) অদ্রীশ বর্ধন: ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'আশ্চর্য' পত্রিকায় অদ্রীশ বর্ধন প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখা শুরু করেন। এছাড়াও প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সিরিজের গল্পগুলো তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞানের গল্প। আবার 'বিশ্ব সায়েন্স ফিকসন' গ্রন্থটি তাঁর কল্পবিজ্ঞানচর্চার একটি আশ্চর্য নমুনা বা উদাহরণ।

সুতরাং, উপরিউক্ত সমস্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গৌরবোজ্জ্বল যুগে একের পর এক লেখকেরা এসেছেন, একজন লেখক যদি কল্পবিজ্ঞানের

গল্পের একজাতীয় ধারা তৈরি করেছেন, তো পরের লেখক সেই ধারার মূলে কুঠারাঘাত করে পুনরায় নতুন এক ইমারৎ গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ, এই যুগের লেখকেরা পাঠকের মনকে গতানুগতিকতায় আবদ্ধ করেননি, পরিবর্তে নিত্য-নতুন ভাবনায় তাদের চিত্তকে ভরিয়ে রেখেছেন।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের চর্চা : এযুগে কল্পবিজ্ঞান বাংলা সাহিত্যের একটি মূল ধারা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কারণ, কল্পবিজ্ঞান হলো 'the literature of the technological era' - অর্থাৎ, কল্পবিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নততর যুগের সফলতম সৃষ্টি। আর বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কর্পোরেট সংস্থায় কর্মরত বাঙালির কানে মোবাইল, হাতে কম্পিউটার। তাই কল্পবিজ্ঞানের গল্পেরও বইছে জোয়ার । এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হারানো জিপের রহস্য' (১৯৭২-৭৩, পক্ষীরাজ), 'মন্দার গাদির রহস্যময় জ্যোৎস্না' (১৯৯৫), 'নীল মানুষ' (২০০৫, 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান সমগ্র) ইত্যাদি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা-- 'ভেলা' (১৯৭৫-৭৬), 'ভুতুড়ে ঘড়ি' (১৯৮৪), 'পাতালঘর' (২০০০) ইত্যাদি। এছাড়াও রণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাশ, সুজিত ধর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অনীশ দেব, সমরজিৎ কর, দিলীপ রায়চৌধুরী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা কল্পবিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছেন। এঁদের হাতে উঠে আসছে নানা ধরনের কল্পবিজ্ঞান। যেমন –

(ক) সামাজিক জটিলতাকে নিয়ে লেখা নমনীয় বা সামাজিক কল্পবিজ্ঞান (উদাহরণ – 'ভেলা')।

(খ) প্রচলিত বিজ্ঞানের শাখা যেমন – পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অনমনীয় কল্পবিজ্ঞান বা hard science fiction । যেমন – 'পাতালঘর'। এতে থাকে উন্নততর প্রযুক্তির বর্ণনা, যা কখনো বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয় না। এই গল্পে থাকে ভবিষ্যত সম্বন্ধে পূর্বসংকেত – যা কখনো কখনো ভুল বা কখনো কখনো নির্ভুল-ও হতে পারে।

(গ) নিকট ভবিষ্যৎ এবং সাইবার সন্ত্রাস নিয়ে লেখা 'সাইবার পাঙ্ক' জাতীয় কল্পবিজ্ঞান।

(ঘ) টাইমমেশিনে চড়ে অতীত বা ভবিষ্যতে গমন, বিকল্প সময়রেখা বা Alternate timeline -এর ব্যবহার অর্থাৎ time setting সময়যোজনাকে কেন্দ্র করে 'টাইম ট্রাভেল' জাতীয় কল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি।

-এগুলি ছাড়াও শুরুর কাল থেকে এখন পর্যন্ত যে জাতীয় কল্পবিজ্ঞান প্রায়শই দেখা গেছে তার মধ্যে আছে Space Opera (উদাহরণ – 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি') , Super Human (উদাহরণ – 'নীলমানুষ', 'অমানুষিক মানুষ) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে কল্পবিজ্ঞানের ধারা : শুধু এপার বাংলার কথা বললেই বাঙালির কল্পবিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে পুরোটা বলা হয়না। কারণ, ওপার বাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে তার একটা জোরালো ধারা আছে, যে ধারার প্রণেতা কাজী আবদুল হালিম, আর তাঁর গল্পের নাম 'মহাশূন্যের কান্না'। এছাড়াও হুমায়ুন আহমেদ এবং মহম্মদ জাফর ইকবাল সেই ধারাকে পুষ্ট রেখেছেন। হুমায়ুন আহমেদ লিখেছেন 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা', 'তারা তিনজন', 'ইরিনা', 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি', 'ফিহা সমীকরণ' ইত্যাদি গল্প। মহম্মদ জাফর ইকবালের কীর্তিগ্রন্থ হলো – 'কপোট্রনিক', 'সুখদুঃখ', 'মহাকাশে মহাত্রাস' ইত্যাদি। আবার, 'মৌলিক' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আহসান হাবিব, রাবিতুল হাসান অভি, অনীক খান, আসরার মামুদ, সাজ্জাত কবীর, রুমেল আহমেদ, মীনাজুর রহমান প্রমুখেরা লিখে চলেছেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প।

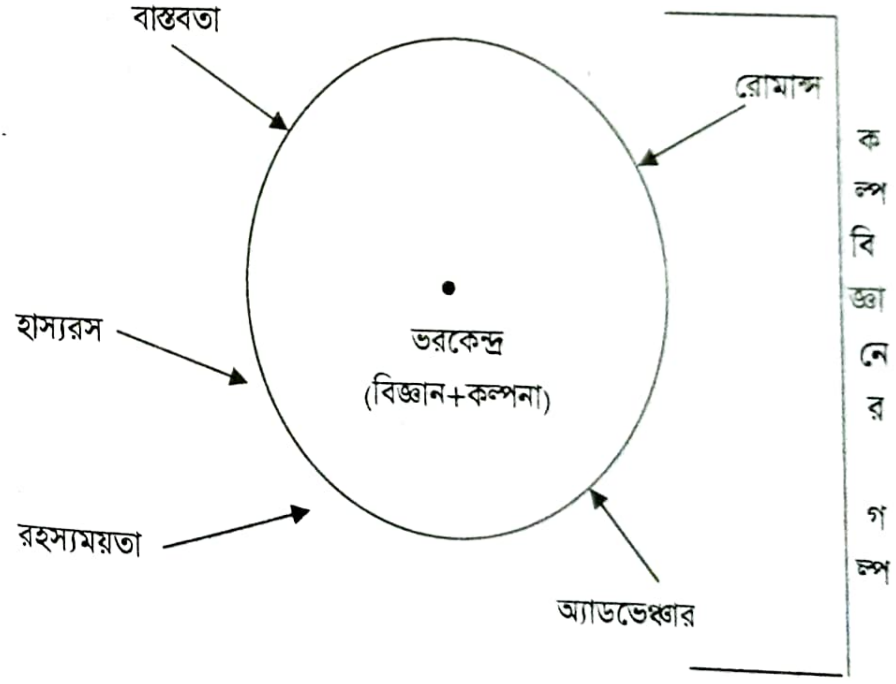

বাংলা কল্পবজ্ঞানের প্লট : প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে ধারণাটি স্পষ্ট করা যাক। কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি গড়ে ওঠে কল্পনা ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানে।

গল্পগুলির ভরকেন্দ্রে থাকে বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনা বা কল্পনানির্ভর বিজ্ঞানের উপস্থিতি। আর এছাড়াও বাস্তবতা (সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক), রহস্যময়তা, রোমাঞ্চ, হাস্যরস, অ্যাডভেঞ্চার, ইত্যাদি বিষয়কে কল্পবিজ্ঞান টেনে নেয় নিজের মধ্যে।

সবশেষে বলা যায় যে, কল্পনাই সাহিত্যের প্রধান উৎসমুখ, কল্পনার ধারাতেই তারও ধারার পরিপুষ্টি। তাই 'গোরা' ও 'নৌকাডুবি'- এই দুটি উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, " 'গোরা' ও 'নৌকাডুবি'র কল্পনা সম্পূর্ণই আমার মাথার থেকে বেরিয়েছে। এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিনে, কিন্তু ঘটলে কী হতে পারত সেইটে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছি"- এই মন্তব্য যেকোন সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সাহিত্যের মূলভিত্তি কল্পনার বিপরীতার্থক শব্দ হলো বাস্তব, যার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কিন্তু যখন এই প্রচলিত ছককে ওলোট পালট করে দিয়ে সাহিত্যের বিষয়-বিজ্ঞান মিলল, তখন ঘটল অভূতপূর্ব ঘটনা – নীরস সত্য-মিথ্যার যাচাইয়ের বাস্তবতায় ঘেরাজগৎ থেকে বিজ্ঞানকে বার করে এনে কল্পনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে চারহাত এক করে দিয়ে রঙিন স্বপ্নের জগতে পাঠককে নিয়ে গেলেন কল্পবিজ্ঞানের লেখকগণ।

সেই সুদূর 'চর্যাপদে'র কাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পেরিয়ে, রূপকথা –পশুকথা-ঘুমপাড়ানি ও ছেলেভুলানো ছড়াকে সঙ্গে নিয়ে এবং আরো পরে উইলিয়াম কেরী, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিখ্যাত সমস্ত সাহিত্যিকের সৃষ্টিজগৎ কল্পনার রসেই সঞ্জীবিত। কিন্তু সেই কল্পনাকে যে মানুষ আরো কোন্ উচ্চতর অনির্বচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি।

....

বাঙালি মধ্যবিত্তের বাসস্থানসংকট : বারো ঘর এক উঠোন

গায়ত্রী আচার্য

বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও দেশভাগের পটভূমিতে গ্রাম-বাংলার নিরন্ন মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে ভিটেমাটি ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হয়ে ওঠে। ক্ষুণ্ণিবৃত্তির সুযোগ মিললেও সুস্থ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ জীবন অধরাই থেকে যায়। ক্রমে তারা শহুরে ক্রিমিকীটের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। আহার যদিবা জোটে, মাথার উপর মনের মতো একটা ছাঁদ জোটে না। এই সঙ্কট তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের এই বাসস্থান সঙ্কটকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক অনবদ্য শিল্পরূপ দান করেছেন।

'বারো ঘর এক উঠোন' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যতম স্মরণীয় উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের বিষাদময় অবক্ষয়প্রাপ্ত অধ্যায়কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। অভাব, বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতিতে বারোটি পারিবার চিরাভ্যস্ত ভদ্রজনোচিত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে একটি উঠোনকে কেন্দ্র করে একই শৌচালয় , পরস্পরের পারিবারিক গোপনতার অংশীদার হয়ে উঠেছে ,স্নানাগার। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাঙনের পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক অবস্থানগত রূপান্তরযুগোপযোগী নতুন পেশার আম ,দানিনতুন শ্রে ,ণির উদ্ভব এবং শহরের মানচিত্রের বদলে যাওয়া রূপ । কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে ওঠা শহর থেকে যেমন ক্রমশ বিদায় নিয়েছে প্রকৃতি, গড়ে উঠেছে আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট বাড়ি, তেমন এখানে বসবাসকারী মানুষগুলি ক্রমশ হারিয়েছে তাদের দৃষ্টির উদারতা ও চিন্তার মুক্তি।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল একটি ছোটগল্পের মধ্যে। ঔপন্যাসিক প্রথমে ' তারিণীর বাসাবদল ' নামে রচিত একটি ছোটগল্প 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই থেকেই

নির্মিত হয় 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের মার্মিক স্থাপত্য। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী অর্থনৈতিক সংকটে বিপন্ন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্র। তারিণী আটদশটি সন্তানের পিতা ও প্রেসকর্মী-। যুদ্ধকালের অনিশ্চিত সমাজব্যবস্থায় উচ্চমূল্য ও দুর্ভিক্ষের বাজারে হঠাৎ চাকরি হারায়। ফলে তারিণী তার সংসার ও সন্তানাদিসহ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়। এই অবস্থায় উদ্ভূত বিপর্যয় সামলাতে, এক দুপুরে সে আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাসাবাদলের অসহায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার তাই ভদ্র স্বচ্ছল সম্পন্ন পাড়ার দুটি কোঠাঘর ছেড়ে দিয়ে বেলেঘাটার দুঃস্থ এক অঞ্চলের দিকে গোটা সংসার নিয়ে ভেসে যাবার জন্য সে একটা ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

গল্পের তারিণী ক্রমশ হয়ে উঠেছে উপন্যাসের শিবনাথ। যদিও তারিণীর মতো সে আটদশটি সন্তানের পিতা নয়। তবুও তার অস্তিত্বের রূপকল্প - তারিণীসমান।- উপন্যাসের শুরুতেই আমরা শিবনাথের মধ্যে বাসাবদলের ঘটনাটি পুনরায় ফিরে আসতে দেখি। এখানেও দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্ক ফেল করার পর চাকরিচ্যুত ম্যানেজার শিবনাথ তার স্কুলশিক্ষিকা স্ত্রী রুচি ও পাঁচ বছরের কন্যা মঞ্জুর হাত ধরে উপায়হীন বাধ্যতায়, নাগরিক ভদ্র পরিমণ্ডল মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে বেলেঘাটার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য ট্যাংরাকুলিয়া বস্তির বারো ঘরের একটি ঘর।

পারিজাতবাবুর ট্যাংরাকুলিয়া বস্তির বারো ঘরের বারো বাসিন্দারা আপাত দৃষ্টিতে কেউ কারো সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না;তারা পরস্পরের থেকে পৃথক , কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তারা সকলেই দারিদ্রপীড়িতপরচর্চায় ব্যস্ত-পরনিন্দা ,পরশ্রীকাতর ,। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়এই বারো ঘরের বারো পরিবারের মধ্যে বারো নম্বর ঘরের , বাসিন্দা হতে এসেছে শিবনাথ। এগার নম্বর ঘরের বাসিন্দা একদা পার্কস্ট্রীটের ফ্ল্যাট ভাড়াবাড়ির কেদার গুপ্ত ওরফে কেগুপ্ত। বিলিতি মার্চেন্ট অফিসের অফিসার কেগুপ্ত চাকরি হারিয়ে স্ত্রী সুপ্রভা ও মেয়ে বেবি এবং ছেলে রুনুকে নিয়ে এগারো নম্বর ঘরের বাসিন্দা হয়েছে। দুই নম্বর ঘরের বাসিন্দা প্রমথের পরিবার। তিন নম্বর ঘরের বাসিন্দা বিধুবাবুচার সন্ ,তাদের পিতা বিধুবাবু দরিদ্র স্কুলমাস্টার। আর চার নম্বর ঘরে থাকে শেখরবাবু। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শেখরবাবু স্ত্রী প্রভাতকণা ও কন্যা সুনীতিকে নিয়ে তার ছোটো সংসার। আট নম্বর ঘরে থাকে বিমল হালদার ও তার স্ত্রী হিরণ এবং দশ

নম্বর ঘরে থাকে অমল চাকলাদার ও তার স্ত্রী বিমল। অমল ও বিমল দুজনেই শ্রমজীবী ফ্যাক্টরির মজুর। , নয় নম্বর ঘরে বাস করছে ভুবন চৌধুরী। এক সময় যার বৌবাজারে নিজের বাড়ি ছিল। বাস রাধাবাজারে এক পার্শির ঘড়ির দোকানের চাকরি হারিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে স্ত্রী ও দুই মেয়ে প্রীতিবীথিকে নিয়ে বারো ঘরের এক ঘর হয়ে উঠেছে।এছাড়া বাকি - (নার্স)পেশায় সে সেবিকা ,চার ঘরের মধ্যে এক ঘরে রয়েছে কমলা। অন্যজন হল ফেরিওয়ালা বলাই। এক সময় বড়বাজারে ডাল কলের ব্যবসা ছিল। ব্যবসায় সব হারিয়ে স্ত্রী ও মেয়ে ময়নাকে নিয়ে বারো ঘরের বাসিন্দা হয়েছে। ছয় নম্বর ঘরে রয়েছে রমেশ। পেশায় সে চা ও কাঠের ব্যবসায়ী। স্ত্রী মল্লিকা , ভাই ক্ষিতীশ ও ছেলে হীরুকে নিয়ে তার বাস। বাকি এক ঘরে থাকে পাঁচু ভাদুড়িযার একটি সেলুনের দোকান আছে। ,

বিচিত্র পেশা ও রুচির মানুষের বাস গড়ে উঠেছে একটি উঠোনকে কেন্দ্র করে। সেখানে দারিদ্র্য তাদের একসাথে বাস করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু রুচির হীনতাশ্রদ্ধার অভাব সর্বত্র লক্ষিত। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন ,-

> " মনের অপ্রশস্ততা হিংসা কলহ নিন্দা পরচর্চা কুৎসা কদর্য স্বভাব এ বাড়ির বাতাস ভারী করে রেখেছে। এখানকার মানুষ মানুষই নয়। একজন আর একজনের চোখে দেখেছে বলেই এ অবস্থা, পর্দা নেই বলেই এত বিপদ!" (৩য় পরিচ্ছেদ)

উপন্যাসে শিবনাথের মধ্যেও তা বর্তমান। তাই চাকরি হারিয়ে বারো ঘরের এক বাসিন্দা হয়ে উপার্জনের চেষ্টা না করে স্ত্রীর চাকরিতে ভরসা করে নিজেকে গর্বিত মনে করেছে। এর ফলে বারো ঘরের মধ্যে বাস করেও যে একধরনের আত্মকেন্দ্রিক অহংসুলভ বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে শিবনাথ তাই পারিজাতের বাড়িতে যেতে গর্ব ও আগ্রহ দু ই-বোধ করেছেসেক্ষেত্রে বারো , ঘরের প্রতিবেশীরা তার কাছে তুচ্ছ, করুণা ও অবজ্ঞার পাত্র। রুচির চাকরি না থাকলে তার অবস্থাও যে বারো ঘরের অন্যদের মতোই হত, এই নিদারুণ সত্যটা সে এক বারও তলিয়ে ভাবেনি।

তাই শিবনাথ সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বদলে তার সখের অ্যাশট্রে কিনেছে। আবার প্রাইভেট ট্যুইশানি করা প্রসঙ্গে রুচিকে বলেছে-

> " প্রাইভেট ট্যুইশানি করা ছোটোলোকদের কাজ। দেখতে পাও না বিধুমাস্টারকে কী বা পোশাক, কী বা চেহারা। মাস্টারগুলোকে দেখলে ঘেন্না করে।" (১৩ পরিচ্ছেদ)

এমনকি সে যা নয়, তা মিথ্যা করে বলতেও দ্বিধা করে না । তাই রুচির 'বিকলাই ইনফেশান' নাম করে কলকাতার বন্ধুর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে আনে। ফেরার সময় বাসের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে তবু তার মনে হয়- 'কত অভিজাত, কত ভদ্র এই চেহারা'। আবার মায়ের জ্বর হয়েছে বলে বেবি রুচিকে ডাকতে এলে রুচিকে শিবনাথ তাদের ঘরে যেতে দেয়নি- 'ও ঘরে তুমি যেতে পারবে না'। এর কারণ পারিজাতের গাড়িতে বেবির দাদা রুনুর অ্যাকসিডেন্টে শিবনাথ সম্পূর্ণভাবে পারিজাতের পক্ষে। সেই সঙ্গে রমেশের মৃত্যুর পর সেই স্থানপূরণে সে উদ্‌গ্রীব।

শুধুমাত্র শিবনাথ নয় 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এই মূল্যবোধহীন আপোষের প্রবণতার ছাপ পড়েছে নানাভাবে, নানাদিক থেকে। চলমান সমকালের এই প্রেক্ষিতে শিবনাথ নিজেও যেমন চাকরি হারানো এক ডুবন্ত মানুষ, তেমনই বস্তির অন্যসব মানুষগুলো এই রকম সব ডুবন্ত মানুষ। সর্বত্রই এক অদ্ভুত ধরনের ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশান। এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশানের সুযোগ নিয়ে পাঁচু তার সেলুনের ওপর ম্যাসাজ ক্লিনিক (ব্যবসাকেন্দ্র-আসলে দেহ) খুলে বসেছে আর ম্যাসাজ ক্লিনিকের নোংরা পাঁকে বিধু মাস্টার তার দুই মেয়ে মমতা ও সাধনাকে রোজগারের আশায় নির্বিকারচিত্তে সমর্পণ করেছেন। এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশানের সুযোগ নিয়ে রমেশ তার ভাই ক্ষিতীশকে দিয়ে চায়ের দোকান তথা রেস্টুরেন্ট খুলে নানা রকম চোরাকারবার চালু করে দিয়েছে আর সেই চোরাকারবারের অবৈধ পাপকর্মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু একটু করে জড়িয়ে গেছে মার্চেন্ট অফিসে উচুঁ চাকরি হারানো কেগুপ্তর একদা লরেটা স্কুলে পড়া কন্যা বেবি। সংসার ও বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছেই নিজেকে বলি দিতে সে বাধ্য হয়েছে। এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশানের সুযোগ নিয়ে ফিল্ম-মেকার(Film-Maker) চারু রায় বস্তিজীবনে ঢুকে অমল চাকলাদার ও তার স্ত্রী কিরণের নকল হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে চরম বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতা করে। বিনিময়ে চলন্ত রিক্সায় চারু রায় অমলের সামনেই কিরণের কোলে অশ্লীল ভাবে হাত রাখে।এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশানের সুযোগ নিয়ে মধুলোভী মৌমাছির মতো লম্পট রোগাক্রান্ত সুধীর ঘোষ প্রায় নিয়মিত শেখর ডাক্তারের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। লক্ষ্য তার সুনীতি, শেখর ডাক্তারের স্ত্রী ও সুনীতির মা সব বুঝেও সুধীরকে প্রশ্রয় ও প্ররোচনা দেয়। অবশেষে সুনীতিকে নিয়ে একরাতে সুধীর পালায়। এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশানের সুযোগ নিয়ে বারো ঘর বস্তির কর্তা পারিজাত

সমাজসেবার নামে শুধুমাত্র মেয়েবৌদের জন্য গেঞ্জির কারখানা খুলে বসে।- সেই গেঞ্জির কারখানায় বস্তির মেয়েবৌদের আনার জন্য সে কখনো ব্যবহার - করেরমেশকেয়নার বাবা অভাবগ্রস্ত কখনো বা রমেশ খুন হয়ে যাবার পর ম . তখন রুনুর ,বলাইকে। এমনকি রুনুকে যখন পারিজাত গাড়ি চাপা দেয় সঙ্গেই ছিল ময়না। রুণুকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়ার অর্থ কিশোরী ময়নাকেই দখল করবার সুপ্ত ইচ্ছা।

আসলে ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চারদিকেই তখন ছিন্নমূল জীবন স্রোতের বিশ্বাসহীন অবস্থান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখেছেন ,শুধু দেখেছেন বলা ভুল . অর্ন্তভেদীচৈতন্য দিয়ে খনন করেছেন। এই জন্যই 'কালপুরুষ' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার প্রদানকালে যখন তাকে বলা হয় "আপনি অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী' তখন তিনি এই প্রদত্ত অভিধা প্রায় মেনে নিয়ে স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন- ' এটা তো সত্যি কথাই।'(জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, সাক্ষাৎকার-২, প্রাক্ শারদীয়, ২০০৯) ।

তবে নৈরাশ্যপীড়িত মূল্যবোধহীন অবক্ষয় ও অপচয়ের মধ্যেই কিছুটা যেন যাত্রাপালার বিবেক চরিত্রের মতো কে. গুপ্ত ক্রমাগত মধ্যপান করতে করতে আর্তনাদ করেছে- 'give beauty back , beauty beauty beauty ' কিন্তু সমাহিত সৌন্দর্য কোথায় ?নষ্ট ভ্রষ্ট বাস্তবের সবটাই তো-নোংরা,কুৎসিত, বিবর্ণ ও নিরানন্দ। তারই বলি হচ্ছে মানুষ তারই শিকার হচ্ছে মানুষ। ; ভয়াবহ কদর্মাক্ত বাস্তবতায় আবদ্ধ প্রায় প্রত্যেকেটা মানুষের মধ্যেই হয়তো এখনো কিঞ্চিৎ সৌন্দর্যতৃষ্ণা সুপ্ত হয়ে আছে ,কিন্তু চলমান সমকালের নৈতিক পতনবিশ্ব বারবারই তীব্র ও নিষ্ঠুরভাবে মানুষের এই সৌন্দর্যতৃষ্ণাকেই প্রতিহত ও প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে পূর্ণ করবার মত শক্তি এবং শুশ্রূষা করবার মতো সামর্থ্য তার আর নেই। ফলে একদিকে বারো ঘরের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্যেই একের পর এক সৌন্দর্যতৃষ্ণার জন্ম হচ্ছেআর অন্যদিকে সেই কুৎসিত বস্তুবিশ্বের ভেতরেই এইসব অ ,স্ফুট অর্ধস্ফুট সৌন্দর্যতৃষ্ণার মৃত্যুও ঘটে যাচ্ছে দ্রুত । শিবনাথকে আমরা এসবের - ,মধ্যেই দাঁড়াতে দেখি ঢুকতে দেখি, ঘুরতে দেখি, কিন্তু একবারের জন্যও তাকে আমরা বার হয়ে আসতে দেখি না। অথচ তার মধ্যেও কিন্তু একটা অতৃপ্ত সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধসম্পৃক্ত স্বপ্নবোধও ছিল-

> " শিবনাথের হাঁটতে ভাল লাগছিল এই জন্যই যে, কোমল নীলাভ বেশ বড়সড় আকাশের রূপোর পাতের মতো এক চিলতে চাঁদ

মাথার ওপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক দূর এগোবার পরও সে দেখতে পাচ্ছিল।.....সেখানে আকাশ আরো বড়, চাঁদ আরো উজ্জ্বল। যেন জলের উপর চাঁদ ঝুলছে।"

এর মধ্যে শিবনাথ ভেবেছে বারোঘরের মশামাছি নোংরা ভরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে উন্নতমান ফ্ল্যাটজীবনের কথা-

" জোৎস্নার ঝিলমিলে অনেকগুলি রেখা শিবনাথ এক জায়গায় এক সঙ্গে দেখতে পেল। সল্টলেক অঞ্চলের শিগ্‌গির ডেভেলপমেন্ট হবে। এ সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিত তখন অবশ্য লোক নাক সিঁটকাবে না, নিন্দা করবে না এখানে টিনের ঘরে কেন সে রুচিকে নিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে থাকতে এল। ঘরের জায়গায় ঘর হয়ত থাকবে, কিন্তু বারোটা পরিবারের সভ্য সুশ্রী ও সুস্থভাবে বাস করার মত উপযোগী কারখানা পরিচ্ছন্ন কামরা হবে তখন।.....হয়তো এটাই একটা খুব ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিণত হবে...।"

সময়ের সাথে সাথে বারো ঘরের বাসাবাড়ি ভেঙে গড়ে উঠেছে একাধিক ফ্ল্যাটবাড়ি। কোথায়ও একান্নবর্তী পরিবার একটি ফ্ল্যাট বাড়িকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগের ফ্ল্যাটবাড়ি বাসিন্দারা বিভিন্ন রুচি ও পেশার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম ও প্রদেশেরও। একটি ফ্ল্যাটকে কেন্দ্র করে একাধিক জাতিষের বাস।পেশার মানু ,রুচি ,ধর্ম , তারা পরস্পরের থেকে পৃথক, তাদের মধ্যে কোথাও আত্মিক যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই খবরের কাগজে প্রায়শ উঠে আসে- বহুতল ফ্ল্যাটের একটি ঘরে খুন হয়েছে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কিংবা তীব্র দুর্গন্ধের জেরে তিনদিন বাদে ঘরের ভেতর থেকে দেওয়া লক ভেঙে পুলিশ উদ্ধার করেছে এক মৃত মহিলার দেহ। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে মৃত মহিলা ডিপ্রেশানের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই সব খবর একাধিক সংবাদপত্রে উঠে আসতে দেখা যায়।

আসলে আমরা পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি থেকেও এতটাই দূরে যে একটি দেওয়ালের প্রাচীর ভেঙে মনের গভীরে পৌঁছাতে পারি না। আসলে আমরা সেই যন্ত্রসভ্যতায় এসে দাঁড়িয়েছি, যাতে মানুষ আজ এক প্রকার যন্ত্র. তাই আমরা আজ যন্ত্রমানব আর আমাদের মানসিকতাগুলি যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত। সকালে ঘুম থেকে ওঠা শুরু করে যন্ত্রের মতো রুটিন মাফিক কাজ করে চলেছি। সেখানে প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া দূরের কথা পরিবারের অন্য সদস্যদের কথাও আমরা প্রায়শই ভুলে যাই।

তবে যুগ বা সময় আমাদের যতই ঘোড়দৌড় করাক না কেন বা কাজের - চাপে যন্ত্রের পরিণত করুক না কেন তবু আমাদের মনের মানবিক গুণগুলিকে সম্পূর্ণ মারতে পারেনি। তাই উৎসবে, অনুষ্ঠানে আমরা সকলে একত্রিত হই। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই।

আসলে যুগ বা সময় সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে ও স্রোতের আনুকূল্যে ভাসতে বাধ্য করে। কিন্তু তার অন্তরে অবস্থান করে সুপ্ত মানবীয় সত্তা আর এক সময় সবকিছুকে ছাপিয়ে সেই মানবীয় সত্তার জাগরণ ঘটে।

....

প্রবাসী বাঙালি : প্রসঙ্গ প্রবাসী পত্রিকা

ড. প্রত্যূষকুমার রীত

১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (ইংরেজি ১৯০১) এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' থেকে। প্রবাসী বাঙালি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মুদ্রাকর ছিলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ। পরবর্তী সময় 'কুন্তলীন প্রেস' ও 'ব্রাহ্মমিশন প্রেসে' প্রবাসী ছাপা হয়েছে। ১৯২৪ থেকে প্রবাসী ছাপা হয়েছে তার নিজস্ব প্রেসে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম (১৮৬৫, ২৮ মে) বাঁকুড়া জেলায়। ১৮৯০ সালে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। ১৮৯২-এ তিনি 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার আগে ১৮৮৮ তে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' (সম্পাদক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) পত্রের সহকারী সম্পাদক হন। ইংরেজি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে রামানন্দের রচনাদি পাঠকের প্রশংসালাভ করে (১৮৯০)। ১৮৯০-তে তিনি সম্পাদনা করেন 'ধর্মবন্ধু' পত্রিকা। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রবাসী হন এলাহাবাদে। সেখানে থেকেও 'দাসী' সম্পাদনাকর্ম চালান ১৮৯৭ পর্যন্ত। তারপর তিনি সম্পাদনা করেন 'প্রদীপ' পত্রিকা। 'প্রদীপ' পত্রিকার পর তিনি ইংরাজি 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকা দুটি সম্পাদনায় হাত দেন।

'দাসী' পত্রিকায় রামানন্দের যে ভাবনা-আদর্শ ছিল, 'প্রবাসী' পত্রিকার ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী হয়েছিল। তা হল বাঙালি সমাজের উন্নয়ন। সামাজিক কুসংস্কার, বৈষম্য দূর করে বাঙালিদের কুসংস্কারমুক্ত করা, বাঙালি অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো, শিক্ষায় বাঙালিদের অগ্রসর করার ভাবনা ইত্যাদি নানা ভূমিকা পালন করেছিলেন 'প্রবাসী' সম্পাদক।

প্রবাসীর মুখবাণীতে পত্রিকার আদর্শ পরিস্ফুট। প্রতি সংখ্যার প্রারম্ভেই মুদ্রিত হত মুখবাণী, কবি Tennyson – এর কবিতার এক পংক্তি। পরবর্তী সময় (১৩১৪ থেকে) সেখানে যুক্ত হয় দুটি সংস্কৃত নীতি। আরো পরে

(১৯১৫) প্রবাসীর মুখবাণীতে ঘোষিত হয়েছে পরাধীন জাতির মর্মবেদনা, গোবিন্দচন্দ্র রায়ের একটি কবিতাংশ,-

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে।

বাঙালিকে আত্মসচেতন করতে, জাগ্রত করতে, আধুনিক করতে, সংস্কৃতি-মনস্ক করতে রামানন্দ সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবাসী পত্রিকা বাঙালিদের জন্য স্বদেশি ও বিদেশি চিত্রকরদের বিখ্যাত চিত্রকলায় সজ্জিত করেছেন, তেমনি বাংলার মাঠে-ঘাটে হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতকে পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন 'হারামণি' বিভাগে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে বাঙালির কার্যকলাপের বিবরণ তিনি পত্রিকার পাতায় ক্রমশ তুলে ধরেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালির অবস্থা, তাদের অভাব–অভিযোগ-সমস্যা ও তাদের সংস্কৃতির সংবাদ প্রভৃতি নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে বিস্তর। শুধু সেকালেই নয়, মনে হয় একালেও তা বাঙালিকে আত্মসচেতন করে তুলবে।

প্রসঙ্গক্রমে, উল্লেখ করি, দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে রামানন্দের একটি আবেদন প্রবাসী পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩৩, পৃ.৪৫৭-৫৮) প্রকাশিত হয়। প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশ্য করে সেখানে রামানন্দ বলেছেন – " যদিও বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙালীদের বিরূদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও একথা কেহই অস্বীকার করেন না যে বাঙালীরা অপরাপর প্রদেশের মানসিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন।..... আমাদের গবর্ণমেন্ট বুঝিয়াছেন বাঙালীর স্থান যত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে ইংরেজের ভারতের উপর প্রভুত্বের দিক দিয়া ততই মঙ্গল। এই কারণে দেখিতেছি যে যেখানে যে কোন উপায়ে বাঙালীকে অন্য প্রদেশে কাজ পাওয়া হইতে বঞ্চিত করা যায়; সেখানেই বাঙালী বঞ্চিত হইতেছে।........ এই যে সর্ব্বত্র বাঙালীর বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ইহার মূলে কোন গোপন চেষ্টা নিহিত নাই তাহা কে বলিবে? কাজেই বর্ত্তমানে যে সকল বাঙালী বাংলার বা বাংলার বাহিরে নানা কাজে লিপ্ত তাহাদের উচিত এইসব বাঙালীর প্রতি অবিচার না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা।"

উক্ত সম্মেলনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করতে

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আহ্বানও জানান।

উল্লেখযোগ্য কথাটি হল এই যে , প্রবাসী বাঙালিদের সম্বন্ধে বাংলার বাঙালিদের সতর্ক-সচেতন করবার কারণে রামানন্দ প্রবাসী পত্রিকায় প্রবাসী বাঙালিদের ইতিহাস উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পত্রিকাকে সে-কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। সেকারণেই তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রবাসী বাঙালিদের ইতিহাস লেখার জন্য চারটি স্বর্ণপদক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এমন নমুনা আর দ্বিতীয় কোথাও দেখা যায়নি।

স্পষ্টত প্রবাসী পত্রিকা ছিল বাঙালিদের প্রতি সংবেদনশীল। তবে উগ্র প্রাদেশিকতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিরোধিতা দেখা যায় প্রবাসীতে। যে কোন ধরনের শ্রেণি-বৈষম্যকে পত্রিকা প্রতিবাদ করেছে, আবার ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ বলে মান্য করে তার প্রচার করেছে। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয় (আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃ.৫৩৯) – " প্রবাসী ধর্ম্মমতের আলোচনার কাগজ নয়। কিন্তু ধর্ম্মমতের আলোচনা না করিয়াও এ প্রসঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।"

শুধু স্বর্ণপদক পুরস্কার ঘোষণাই নয় প্রবাসী-সম্পাদক এ পত্রিকায় 'প্রবাসী বাঙালী' নামে এক বিভাগ খুলেছিলেন। সেখান থেকে কতিপয় রচনার তালিকা বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরব, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। - সেগুলিতে মিলবে নানা দুর্লভ তথ্যাদি। কয়েকটি নমুনা:

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস - 'দেরাদুনে বাঙ্গালী': কালীমোহন ঘোষ, ঈশানচন্দ্র দেব, বিমলাচরণ সোম, রমাপ্রসাদ রায়। [আষাঢ় ১৩২৯, পৃ.৩৩১।]

- 'অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে বাঙ্গালী' : রামকালী চৌধুরী, প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। [ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮, পৃ.৪।]

'প্রবাসী বাঙ্গালী': ভূপতিচরণ ঘোষাল, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, সারদাপ্রসাদ সান্যাল। [জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ.১৮৭।]

গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী- 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা' : প্রফুল্লচন্দ্র বসু, সত্যসুন্দর দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার, নগেন্দ্রচন্দ্র বসু। [অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃ.৪৩৭।]

-'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' : বিজয়চন্দ্র চৌধুরী,

ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। [বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ.১৩৮।]

রমেশচন্দ্র মজুমদার-'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' : বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য, ঈশান শিব। [অগ্রহায়ণ ১৩২৭, পৃ.১১৩।]

বরেন দত্ত - 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা' [শ্রাবণ১৩১৪, পৃ.২২৯।]

বলাবাহুল্য প্রবাসী পত্রিকার 'প্রবাসী বাঙালী' বিভাগের সমস্ত লেখাগুলি ঐ শিরোনামেই সংকলন করলে সেকালের কিছু প্রবাসী বাঙালির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে এ সংকলনটি হবে গুরুত্বপূর্ণ। অবিলম্বে পুরো বিষয়টি সংকলন-সম্পাদনা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া গেল। পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট লেখাগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে অজস্র ছবি। রচনাগুলি নানা তথ্যের আকরস্বরূপ। প্রস্তাবিত গ্রন্থটিতে বিষয়টির সম্পূর্ণ ইতিহাসটিকে তুলে ধরা হবে।

প্রবাসী , পৌষ ১৩২৪ (পৃ.৩২৪) সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যামিনীকান্ত সোম লিখিত 'একজন প্রবাসী বাঙ্গালী'। ১৩২২, ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ.৫২৭) 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা' নামক আলোচনায় লেখা হয় – গত ১৪ বৎসর প্রবাসীতে 'প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি, পরবর্তী দীর্ঘসময়ব্যাপী পত্রিকায় প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২২-এর ফাল্গুন সংখ্যার এই আলোচনায় দেখা যায়, দিল্লীর 'বান্ধব সমিতি'র কথা; জানা যায় দিল্লীর 'বঙ্গসাহিত্য সভা'র কথাও।

প্রবাসী পত্রিকার আষাঢ় ১৩২২ সংখ্যায় (পৃ.৪৩৪) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমরা সেই সমালোচনাটুকু উদ্ধার করলেই প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করব। সমালোচনাটি হল :

> "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী- শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলি। ডবল ডিমাই ষোড়শাংশিত ৫৫৭+ণ+১৬+ ? পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, সোনালি অক্ষরে নাম লেখা। বহু লোকের মূর্ত্তিচিত্র-সম্বলিত। মূল্য – তিন টাকা মাত্র।
>
> শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের প্রবাসী বাঙালীর বৃত্তান্ত যে কিরূপ উপাদেয় ও বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ তাহা প্রবাসীর পাঠক মাত্রেই জানেন। প্রবাসীর প্রথম বৎসর হইতে এ পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রবাসী বাঙালী দের কীর্ত্তি, সাহস, উৎসাহ, কর্ম্মপটুতা , মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব দেশবাসী বাঙালীদের পরিচিত করিবার জন্য যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে উত্তর ভারতের বাঙালীদের প্রবাসবাস ও উপনিবেশ সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি এই পুস্তকে

সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতেই এত পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনকাহিনী আলোচিত হইয়াছে যে শুধু তাঁহাদের নামের তালিকাই বর্জ্জাইস অক্ষরে ছাপিয়াও এই প্রকাণ্ড আকারের পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে। এই পুস্তকের প্রশংসা করা প্রবাসীর পক্ষে অনেকটা আত্মপ্রশংসারই সামিল। তবে বাঁচোয়া এই যে প্রবাসীর সকল পাঠক পাঠিকারই এই পুস্তকের গুণপনা কিছু না কিছু জানা আছে। সুতরাং যাহা বলিব তাহার সত্য মিথ্যা প্রত্যেকেই কতকটা নিজের মনে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

বইখানি উত্তর ভারতে বাঙালীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পঞ্জী হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে-সমস্ত বাঙালীর গৌরব আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরদের ত ইহা আদরের সামগ্রী হইয়াছেই, সেই সঙ্গে ইহা প্রত্যেক বাঙালীরই সমাদরের যোগ্য। বহু অনুসন্ধান ও কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই সমস্ত জীবনের কাহিনী ও প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাঠক সাধারণ এবং বিশেষ করিয়া যাঁহাদের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরেরা এই বহুবৎসরব্যাপী চেষ্টার ও পরিশ্রমের ফলকে সাদরে ঘরে ঘরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করি।Greater Bengal বা বিস্তৃততর বঙ্গের কাহিনী প্রত্যেকের জানা উচিত।

রচনার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। তবে তাহার মধ্যে সরসতা বা সাহিত্যরস বা বিশেষ রচনাভঙ্গীর (Style) কারিকুরি খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। ইতিহাসের ভাষায় তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় না।

গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভূমিকায় বাঙালীর কৃতিত্বের একটি মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বাঙালীর আত্মপ্রত্যয় আত্মসম্মান আত্মবোধ বাড়িবে।

গ্রন্থমুখে উপনিবেশ স্থাপনের কারণাবলীর যে অনুক্রমচিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও মৌলিক।

গ্রন্থখানি কিনিয়া ঘরে রাখিবার উপযুক্ত।

মুদ্রারাক্ষস।"

সবশেষে বলি, বাঙালি সমাজের উন্নতিকল্পেই সম্পাদক প্রবর্তন করেছিলেন প্রবাসী পত্রিকাটি। বাঙালিদের আধুনিকমনস্ক, সাংস্কৃতিকমনস্ক করতে চেয়েছিলেন তিনি। পায়ে চলা পথে, মাঠে, ঘাটে হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতকে যেমন 'হারামণি' বিভাগে তুলে ধরেছিলেন, তেমনি বাঙালিদের ইতিহাসকেও সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন সম্পাদক এবং এক বাঙালি- ব্রত উদ্‌যাপন করেগেছেন তিনি, যার ঐতিহাসিক দলিল পত্রিকাটিতে বিরাজমান - যা পাঠক বর্তমান নিবন্ধের আলোচনায় লক্ষ করতে পারবেন।

....

বাঙালি খ্রিস্টান-সংস্কৃতি : ধর্মীয় মূলানুগত্য ও বঙ্গীয় ঐতিহ্য

নির্মলকুমার বিশ্বাস

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন ভারতীয় সংস্কৃতি মূল কথা 'ঐক্য'। আজ একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সভ্যতা এক মিশ্র সভ্যতা। যুগে যুগে বহুজাতির সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উদারকণ্ঠে সে বার্তাই ঘোষিত –

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রিষ্টান।
....
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ-নীরে
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।।" – (ভারততীর্থ)

বহুজাতির সংমিশ্রণে গঠিত হলেও ভারতাত্মা যে খণ্ডিত নয়, তার মূল রসায়ন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই ভারধারার মধ্যে নিহিত। আর এই একতার পিছনে রয়েছে ভারতে আগত জাতিগুলির জাতিসত্তা বিশাল ভারতাত্মায় বিসর্জন দেওয়ার ধারাবাহিকতায়। এই জন্য আর্য থেকে শুরু করে ভারতে আগত শক্, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি কোন জাতিই শেষপর্যন্ত তাদের জাতিসত্তা অক্ষুণ্ন রেখে চলতে পারেনি ; ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ধারায় বিসর্জিত হয়েছে তাদের বিদেশি পরিচয়। কালক্রমে তারা হয়ে উঠেছে ভারত সন্তান। তাই দেখা যায়, ভারতে আগত বহিস্থঃ জাতিগুলির অধিকাংশই লুটেরা হিসাবে এদেশে এলেও বেশিরভাগই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেনি, বরং এদেশের মোহে স্বদেশকেই ভুলেছে। তবে এই ধারার প্রধানতম ব্যতিক্রম

ঘটেছে ভারতে আগত সর্বশেষ বিদেশি ইউরোপীয় এবং তাদের প্রধান প্রতিনিধি ইংরেজের ক্ষেত্রে। আধুনিক সভ্যতার আলো তাদের হাতে, কিন্তু তার ছটায় বিশ্ব তথা ভারতকে আলোকিত করা মূল উদ্দেশ্য তাদের নয়, যেমন নয় তাঁদের স্বীকৃত মহামানব ঈশ্বরপুত্র প্রভু যিশুর মহান আদর্শের প্রচার। বরং ভারতের ধনসম্পদের প্রতিই পাখির চোখ নিয়ে তাদের এদেশে আগমন। তাই দেখা যায় ভারতশোষণ যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল; তখন এদেশের প্রতি তাদের মোহও কাটল ; স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হয়ে উঠল প্রিয় এবং বাধ্যতার ব্যাপার।

ইংরেজ তথা ইউরোপীয়রা স্বদেশে ফিরল বটে কিন্তু রেখে গেল তাদের আনিত মহান আধুনিক সভ্যতাকে। আর ইউরোপীয় মিশনারী যাঁরা এদেশে এসেছিলেন মানবত্রাতা প্রভু যিশুর পরিচয় করাতে, তারা রেখে গেলেন খ্রিস্টধর্ম ও তার আদর্শ, অসংখ্য চার্চ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেবাপ্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র ইত্যাদি।

ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় এই প্রথম দেখা গেল, কোন জাতি এদেশে দীর্ঘদিন বসবাস করেও এখানে স্থায়ী হল না। কিন্তু তাই বলে ভারতাত্মা তাদের উপেক্ষা করেনি ; বরং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনেক বিষয় সে নিজেই আত্মস্থ করেছে এবং তার সন্তানদের কেউ কেউ ইউরোপীয়দের খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেছে। খ্রিস্টান মিশনারী, যাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল প্রভু যিশুর মহান বাণী ও আদর্শ প্রচার করা এবং তাঁকে ত্রাণকর্তা হিসাবে তুলে ধরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে ভারতীয় তথা বাঙালিদের উৎসাহিত করা ; তাঁরা কিন্তু একাজে অনেকটাই সফল হয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রাজশক্তির বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে না কালক্রমে একথা তারা বুঝে গিয়েছিলেন। আর তাই একাজে মিশনারীরা বাঙালি তথা ভারতীয়দের মনোভাব বুঝে এগিয়ে ছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, রক্ষণশীল বাঙালির মনে এক নতুন ধর্মের আদর্শের বিস্তার ঘটানো মোটেই সহজ কাজ নয়, ভাষাও এক্ষেত্রে বড়ো বাধা। কিন্তু এই দুরূহ কাজেও তাঁরা হার মানেননি। তাঁরা বাঙালির সহজবোধ্য করে বাইবেলের অনুবাদ করেছেন; শুধু তাই নয়, আচার-অনুষ্ঠান প্রিয় বাঙালির মতো করে খ্রিস্টধর্মের বাঙালিকরণ করেছেন। আর তাই প্রয়োজনে খ্রিস্টধর্মের রক্ষণশীলতা তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে সেখানে বাঙালি সংস্কৃতির রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে বাংলাদেশে প্রবর্তিত খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় আদর্শের দিক থেকে মূলানুগত্য বজায় থাকলেও আচার-

অনুষ্ঠানের বহুবিধ ব্যাপারে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতায় অনেকাংশে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বাঙালি খ্রিস্টান যারা, তাদের খ্রিস্টানত্বে খ্রিস্টধর্মের মূল তত্ত্বগুলি অক্ষুণ্ণ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে সেখানে স্থান করে নিয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত আচার-আচরণ, রীতি-নীতিগুলি ; যেগুলি তাদের পক্ষে ত্যাগ করা মোটেই সম্ভব হয়নি। আর সেজন্যই তাদের নবগৃহীত ধর্মে এই সংস্কৃতির বহুবিধ দিকগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার জন্য বাঙালি খ্রিস্টানরা ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্মের আদর্শ মেনে নিলেও তাদের আচার-সংস্কৃতিগুলিকে বাঙালি সংস্কৃতির জারকে জারিত করে নতুন ভাবে গড়ে নিয়েছে। ফলে বাঙালি খ্রিস্টানদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা অনেকের কাছেই অজানা এবং সেইসঙ্গে আকর্ষণীয়। আমরা বাঙালি সংস্কৃতির সেই বহুমুখী দিকগুলি এই আলোচনায় তুলে ধরব-

১. ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ ও শক্তিতে খ্রিস্টান জীবনের সূচনা– বাপ্তিস্ম গ্রহণ : খ্রিস্টানধর্মে কোনো শিশুর জীবনের চলার সূচনা ঘটে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তি বাপ্তাইজ গ্রাহকের উপর নেমে আসে। যেমন এসেছিল জর্ডন নদীতে যোহনের কাছে যিশুখ্রিস্টের বাপ্তাইজ গ্রহণের সময়। সেখানে দেখা যায় কবুতরের আকারে স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা যিশুর মাথার উপড় নেমে আসে এবং স্বর্গ থেকে এই বাণী শোনা যায়- "ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র এবং আমি এঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট।" খ্রিস্টানধর্মের বিশ্বাসীরা যিশুর জন্মের কয়েকমাস পরেই তাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করান। তারা চান যিশু বাপ্তাইজেব মাধ্যমে প্রাপ্ত পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয়ে জীবন শুরু করুক। এই বাপ্তাইজ গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমা অবশ্য নেই। তবে ব্যাপ্তিস্ম গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এটা গ্রহণ না করলে কোনো খ্রিস্টান ব্যক্তির হস্তার্পণ ও বিবাহ ধর্মীয় মতে দেওয়া হয় না।

বাঙালি খ্রিষ্টানরাও তাদের সন্তানদের বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকেন। চার্চে পুরোহিতের প্রার্থনা এবং পবিত্র জলে স্নাত্ হওয়ার মধ্যদিয়ে শিশুর বাপ্তাইজম ঘটে। এক্ষেত্রে বাঙালি একটা রীতি পালনে বিশেষ আগ্রহ দেখান। তা হল শিশুর বাপ্তিস্মের সময় তার জন্য ধর্ম পিতা-মাতা নির্বাচন। এই ধর্ম পিতা-মাতা নির্বাচনরীতির সাথে বাঙালিহিন্দুদের গুরুঠাকুর ও গুরুমা গ্রহণে

ঐতিহ্যের ভাব-সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাঙালি খ্রিস্টানরা ধর্ম ত্যাগ করলেও বাঙালি রীতিনীতিগুলিকে রক্ত থেকে মুছে ফেলতে পারেনি।

২. হস্তার্পণ গ্রহণ: খ্রিস্টানধর্মে কিশোর-কিশোরীদের 'হস্তার্পণ' নামক বিশেষ ধর্মীয়বিধান মেনে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশপের পৌরাহিত্যে খ্রিস্টান কিশোর-কিশোরীদের খ্রিস্টধর্মের পালনীয় মূল তত্ত্বগুলি জ্ঞাত করানো হয় এবং এরপর তারা 'প্রভুর ভোজ' পাওয়ার প্রথম অধিকার পায়। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন, প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত। আর এগুলি গ্রহণের মধ্যদিয়ে পবিত্রতা প্রাপ্তি ঘটে ও ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠা যায়। বাঙালি খ্রিস্টানরাও উক্ত বিধি মেনে তাদের সন্তানদের 'হস্তার্পণ' করান এবং পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভরে প্রভুরভোজ গ্রহণ করেন।

৩. নামসংস্কৃতি ও বাঙালি খ্রিস্টান : বাঙালি খ্রিস্টান সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সংস্কৃতির মিশেলের একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল বাঙালি খ্রিস্টানদের ব্যক্তিনাম প্রদানের বিষয়টি। বাঙালি খ্রিস্টানরা ব্যক্তিনাম প্রদানে পাশ্চাত্য খ্রিস্টানি নাম বা বাঙালিদের নাম কোনটাই একতরফা গ্রহণ করেনি। বাঙালি খ্রিস্টানদের ব্যক্তিনাম প্রদানের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজে প্রচলিত নামগুলিই বেশি গৃহীত হয়েছে কিন্তু তাই বলে হিন্দু দেব-দেবীদের নাম যেমন – গণেশ, নারায়ণ, মহাদেব, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, লক্ষ্মী, পার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি যেগুলি আবার হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে সাধারণত প্রচলিত সেগুলি কিন্তু বাঙালি খ্রিস্টানগণ গ্রহণ করেননি। আবার পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত সাধারণ ব্যক্তি নামগুলি যেমন, জন, পিটার, যোষেফ, আব্রাহাম, সামুয়েল, মেরী, মেরিলিন, সেরাফিন, গাব্রিয়েল, পৌল প্রভৃতি বাঙালি খ্রিস্টান সমাজে গৃহীত হলেও তা মোটেই সার্বিক স্থান লাভ করেনি। বাঙালি খ্রিস্টানদের ব্যক্তিনাম প্রদানের ক্ষেত্রে বরং যেটা মোটামুটি জনপ্রিয়, সেটা হল পাশ্চাত্য খ্রিস্টানসমাজের খ্রিস্টানি নাম এবং বাঙালি সমাজে প্রচলিত দেব-দেবী বিহীন সাধারণ নামের মিশেল ঘটিয়ে সংকর নাম, যেমন – আব্রাহাম সুদীপ্ত, রোজমেরী সৃজিতা, জুলিয়েট রূপা, পৌল জীবন, রাফায়েল আকাশ, মার্ক শৌমি, মারিয়া শুভ্রা প্রভৃতি। ব্যক্তিনাম প্রদানের এই মিশ্রসংস্কৃতি অবশ্য বাঙালি সমাজে প্রচলিত চিরন্তন সাধারণ দেব-দেবীবিহীন নামগুলির দ্বারাই পরিচিতি পেতে আগ্রহী। আসলে ধর্ম পরিবর্তিত হলেও যে বাঙালি সংস্কৃতি তাদের দেহ-মনকে সর্বদা পরিপুষ্ট করে চলেছে তার প্রভাব, তার দাবি

বাঙালি খ্রিস্টানদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই অসীম, অভীক, সম্রাট, নীরেন্দ্র, সঞ্চয়িতা, মালা, রীতা, চৈতালী প্রভৃতি বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রচলিত নামগুলি বিনা দ্বিধায় বহুলাংশে গৃহীত হয়ে বাঙালি খ্রিস্টানদের ব্যক্তিনামকে অলংকৃত করেছে।

৪. শাঁখা-পলা-সিঁদুরে রাঙানো বিবাহ : বাঙালি খ্রিস্টান সমাজে চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব এবং সেই প্রভাবের কাছে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সংস্কৃতির পরাভবের বড় দৃষ্টান্ত বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন। বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির যে গভীর প্রভাব পড়েছে, সেই প্রভাব খ্রিস্টান অপেক্ষা দীর্ঘকাল আগে ধর্মান্তরিত হয়েও মুসলমান সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানে পড়েনি। বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহে বাঙালি হিন্দু বিবাহ সংস্কৃতির নানান রীতি আচার-পদ্ধতি আকর্ষণীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই দেখা যায় বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহ পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মতো চার্চে সূচিত হয়ে একটি জমকালো পার্টির মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত এবং সমাপ্ত কোনটাই হয় না। বাঙালি খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠান এমনভাবে উদ্‌যাপিত হয়, যার দ্বারা দুই পরিবার আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়ে। তাই দেখা যায় ঘটা করে পাত্র-পাত্রী দেখতে যাওয়া, তাদের পরস্পরের পছন্দ হওয়া, এরপর ঘর-বাড়ি দেখা প্রভৃতি প্রাক্‌বিবাহ পর্বকালীন অনুষ্ঠানগুলি বেশ উদ্‌যোগের সঙ্গে পালিত হয়। বাঙালি খ্রিস্টানদের পালিত এই রীতিগুলি যে চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবজাত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪.১. কবে ঘটবে সেই শুভদিন : বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যেও অনেককে পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিন স্থির করতে দেখা যায়। অনেকে আবার কোষ্ঠীও মেলান, যা নিতান্তই তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু-বাঙালি মানসিকতার অনুবর্তন। কারণ খ্রিস্টানধর্মে এই জাতীয় কোষ্ঠী বিচারের কোনো রীতি বা মান্যতা নেই। যদিও বাঙালি খ্রিস্টানরা এই নিষেধের তোয়াক্কা করে না, আর তাই ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র মাসে, জন্মমাসে বিবাহ না দিয়ে তাদের বাঙালি মননকেই তুলে ধরে। যা হোক সমস্ত কিছু মোটামুটি বিচার করেই বাঙালি খ্রিস্টানরা তাদের বিবাহের দিন ধার্য করে এবং সেই সঙ্গে বিবাহের ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। তবে এ প্রসঙ্গে বলা জরুরী যে, পঞ্জিকানুযায়ী বিবাহের দিন স্থিরীকরণ একটা রীতিমাত্র, কোনো সমস্যা হলে এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়।

৪.২. বাগদান পর্ব : বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিতে বিবাহের পূর্বে যেমন মনোনীত পাত্র-পাত্রীদের 'আশীর্বাদ' অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বাগদান পর্ব সেরে

ফেলা হয়, বাঙালি খ্রিস্টানসমাজেও এই রীতি প্রচলিত। বাগদানের রীতি খ্রিস্টান ধর্মে সেই আদিকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। বাইবেলে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রভু যিশুর মাতা মরিয়ম ছিলেন সাধু যোষেফের বাগদত্তা। বাঙালি খ্রিস্টানরা বিবাহের পূর্বে এই বাগদান অনুষ্ঠান করে। তবে এখানে খ্রিস্টানধর্মের আচারবিধির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির মিশেল লক্ষ করা যায়। তাই পাশ্চাত্য খ্রিস্টান পাত্র-পাত্রীর মত সুট-গ্রাউন পরে নয়, বাঙালি খ্রিস্টান পাত্র-পাত্রী পাজামা-পাঞ্জাবী শাড়ী পড়ে বাগদান পর্ব উদ্‌যাপনে বেশি আগ্রহী আবার পাশ্চাত্যের মত আংটিবদলের পাশাপাশি বাঙালিদের মতো মালাবদলেও বাঙালি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পায়। আর খ্রিস্টান হলেও তাদের মন-মানসিকতা যে বাঙালিরই তা প্রকাশ পায় যখন দেখা যায় পাশ্চাত্য পাত্র-পাত্রীদের বাগদান পর্বে চুম্বনের মতো আবশ্যক ব্যাপারটি বাঙালি খ্রীষ্টানরা আপত্তিকর ভেবে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেন ।

৪.৩. বিশেষ রীতি বাণপ্রকাশ : খ্রিস্টান বিবাহে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তা হল বাণপ্রকাশ ডাকা। এই ব্যবস্থায় দেখা যায়, পাত্র-পাত্রী যে চার্চের সদস্য-সদস্যা সেই চার্চে বিবাহের পূর্বে তিন সপ্তাহ এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, এদের বিবাহে কারো কোনো আপত্তি থাকলে কারণ-সহ লিখিতভাবে পুরোহিতের কাছে জানাতে হবে এবং তা না করলে চিরদিনের মতো চুপ থেকে যেতে হবে। পুরোহিত লিখিত আপত্তি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী পক্ষের ব্যক্তিদের এবং আপত্তিকারীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা নেন। এই পদ্ধতি খ্রিস্টান বিবাহকে অনেকাংশে স্বচ্ছ করে তুলেছে। খ্রিস্টান ধর্মে এই আদর্শ স্বয়ং যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে, যাদের (স্বামী-স্ত্রী) ঈশ্বর এক করেছেন তাদের মানুষ পৃথক না করুক। তাই বিবাহের পূর্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বাণপ্রকাশ ডাকা হয়, যাতে বিবাহবন্ধন কোনো সমস্যায় ভেঙে না যায়। এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে খ্রিস্টানবিবাহকে অনেকবেশি পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ় করে তোলে। বাঙালি খ্রিস্টানরাও এই বিধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

৪.৪. গায়ে হলুদ : আচার-অনুষ্ঠান প্রিয় হিন্দু বাঙালির মতোই খ্রিস্টান বাঙালিরাও মূল বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে নানান আচার পালন করে থাকে। গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো, থুবড়ো (মিষ্টিমুখ) ইত্যাদি পালনীয় আচারগুলি খ্রিস্টানরা বাঙালি সংস্কৃতি থেকে আমদানি করেছে। পাশ্চাত্য খ্রিস্টানি বিবাহে এই পালনীয় সংস্কারগুলি নেই। যা হোক এই আমদানীকৃত

সংস্কৃতিতে গায়ে হলুদের সময় পাদ্রী বা ফাদারের পৌরহিত্য খ্রিস্টানি রঙ এনে দেয় মাত্র। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে পাত্রের গায়ে হলুদ মাখানোর পর সেই গাত্রস্পর্শ করা হলুদ পাঠানো হয় কন্যাকে মাখানোর জন্য কন্যার বাড়ি। তবে এই হলুদ পাঠানোর বিশেষ নাম আছে তা হল 'বিবাহের তত্ত্ব' পাঠানো, যা বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহের বিশেষ সংস্কার। বাঙালি খ্রিস্টানরাও পাত্রীর বাড়িতে পাঠানো তত্ত্বের হাঁড়িতে নিয়ম মেনে নানান সামগ্রী দেন। সুন্দর মাটির হাঁড়িতে সেখানে যেমন থাকে কাঁচা হলুদ বাঁটা, তেমনি থাকে এই হলুদ মাখার সময় ও তা ধুয়ে স্নান করার পর কনের পরার আলাদ আলাদা শাড়ি। যা আবার হলুদ-লাল বিশেষ দুই রঙের হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু এগুলিই নয়, তত্ত্বের হাঁড়িতে দেওয়া হয় চিঁড়ে, মুড়কি, রসগোল্লা, সাবান-তেল সহ নানান প্রসাধন সামগ্রী এবং একটি আস্ত রুই মাছ যা বাঙালি রসনা তৃপ্তির সেরা উপাদেয় হিসাবে বিবেচিত।

বিবাহের দিনও খ্রিস্টান বাঙালিগণ যে সব আচার-পালন করে, তার অধিকাংশই বাঙালি সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত। বরযাত্রী যাওয়া, বরের সাথে কোলবর এবং কনের সাজ-সজ্জার সামগ্রী বাহক ডোলার ঢিপির উপস্থিতি প্রভৃতি সংস্কার যেগুলি চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ সেগুলি বাঙালি খ্রিস্টান বিবাহ সংস্কৃতির সাথেও জড়িয়ে আছে। সেইসাথে অনেকে ব্যাণ্ডপার্টি সহকারে বরযাত্রীসহ আনন্দের মহারোল তুলে বিয়ে করতে যান যা বাঙালি তথা ভারতীয় বিবাহের জাঁকজমককে স্মরণ করায়।

খ্রিস্টানদের বিবাহ হয় চার্চে পাদ্রী / ফাদার প্রমুখের পৌরহিত্যে। পুরোহিত খ্রিস্টধর্মের রীতি অনুযায়ী বর-কনেকে ঈশ্বরের সামনে শপথ গ্রহণ করান এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পন্ন করেন। এইসব রীতি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান বিবাহেও দেখা যায়। কিন্তু বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহে এর অতিরিক্ত আরো কিছু দেখা যায় যা, নিতান্তই চিরন্তন বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবজাত; সেইসব ক্রিয়াকলাপগুলি এবার দেখে নেব। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান পাত্র-পাত্রী যথাক্রমে সুট ও গ্রাউন পরে বিবাহ করে। বিবাহে পোশাকের এই আদর্শ অনেক বাঙালি খ্রিস্টান মানেন না। বাঙালি খ্রিস্টান নারীরা বিবাহে চিরায়ত বেনারসি পরতেই বেশি আগ্রহী। এতেই যেন তাদের বধূশ্রী বেশি খোলে। আর পুরুষেরা বিশেষত গ্রামের দিকে ধুতি-পাঞ্জাবীই পরে থাকে, তবে মফঃস্বল ও শহরে খ্রিস্টান পাত্র সুট পড়ে বিবাহ করতেই ঔৎসুক্য দেখান।

পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান নারীদের সিঁদুর পরার কথা ভাবা সোনার পাথর বাটি ছাড়া কিছু নই। কিন্তু বাঙালি খ্রিস্টান কনে বিবাহকালে পাত্রের হাতে সিঁদুর পরে থাকে; সেই সাথে বাঙালি বিবাহ সংস্কৃতির অঙ্গ পাত্র-পাত্রী পারস্পরিক মালাবদলও করে থাকে। আবার শাঁখা-পলা-নোয়া পরে বধূশ্রী মণ্ডিত হওয়া যা খ্রিস্টান ধর্মে নেই, তা বাঙালি খ্রিস্টান নারীরা আবার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। বিবাহের এই বহুমুখী আচার এবং সধবা নারী রূপে পরিচিত হওয়ায় এইসব নানারকম চিহ্নাবলি খ্রিস্টান বাঙালিরা বাঙালিসংস্কৃতি থেকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪.৫. খ্রিস্টানসংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির বৈপরীত্য : তবে বাঙালি হিন্দুবিবাহ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি খ্রিস্টানদের বিবাহের কয়েকটি ব্যতিক্রমও লক্ষ্যণীয়। বাঙালি খ্রিস্টানরা হিন্দুদের মতো রাত্রে নয়, দিনে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরের দিন কালরাত্রি পালন না করে ঐ দিনই বৌভাত অনুষ্ঠিত করে। খ্রিস্টানদের কালরাত্রি পালন না করাটা অবশ্যই খ্রিস্টানধর্মে মূলগত বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে ও তাকে সম্মান জানিয়ে। হিন্দুরা কালরাত্রি পালন করেন মা-মনসার ভয়ে। সর্প দেবী মনসার কোপে বিবাহের পরের দিনই বাসর ঘরে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়োগান্তক পরিণতির কথা বাঙালি কখনই ভোলে না। তাই বিবাহের পরের দিন কালরাত্রি হিসাবে পালন করে। সর্পদেবী মনসার কোপ থেকে নিজেদের আড়াল করতে চান। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে সর্প শয়তানের প্রতীক। আর তাকে তাদের ভয় করারও প্রশ্ন ওঠে না। কারণ খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে একমাত্র ঈশ্বর ভয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তিনাশক। তাই সর্পভয় তথা কালরাত্রিকে গুরুত্ব না দিয়ে পরের দিনই বাঙালি খ্রিস্টানরা বৌভাত অনুষ্ঠান করে এবং সেখানে কন্যার বাড়ির আত্মীয়গণ কন্যাযাত্রী রূপে সাদরে আপ্যায়িত হয়।

বিবাহের পর 'অষ্টমঙ্গলা' অনুষ্ঠান বাঙালি হিন্দুসংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ, বাঙালি খ্রিস্টানরাও তা পালন করেন। তবে হিন্দু আচারগুলি এক্ষেত্রে পালন করেন না, যেমন করেন না 'জামাইষষ্ঠী' অনুষ্ঠান। 'জামাইষষ্ঠী'-র সময় কেউ কেউ দুর্গাপূজার সময় জামাই-মেয়েকে ঘটা করে খ্রিস্টান বাঙালিরা তাদের বাড়ি নিয়ে আসেন। এবং নানাবিধ খাদ্য খাবারে পোশাকে জামাইয়ের মন তৃপ্ত করে থাকেন। আসলে উৎসব প্রিয় বাঙালি মানসিকতা বাঙালি খ্রিস্টানদের মন থেকে অপসৃত হয়নি; যতই তারা ধর্মান্তরিত হোন না কেন,

তাই কন্যাকে ঘরে আনা তাদের কাছে গৌরীকে ঘরে আনার সমতুল বলে বিবেচিত হয়।

৫. মামার হাতে খোকা খাবে প্রথম ভাত – অন্নপ্রাশন : মূল খ্রিস্টধর্মে অন্নপ্রাশন বলে অনুষ্ঠেয় কোনো রীতি নেই। কিন্তু বাঙালি খ্রিস্টানরা তাদের সন্তানদের অন্নপ্রাশন পালন করেন। আসলে বাঙালি ঐতিহ্য বাঙালি খ্রিস্টানদের নাড়ীতে বাজে। অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে বাঙালি খ্রিস্টানরা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপগুলি খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী রূপান্তরিত করে নিলেও বাঙালি সংস্কৃতির বহু আচার কিন্তু তারা আজও ভোলেননি। মামার কোলে বসে প্রথম অন্নগ্রহণ, সোনা বা রূপার চামচ নিদেনপক্ষে টাকার কয়েনে করে সেই অন্ন সন্তানের মুখে তুলে দেওয়া প্রভৃতি ঐতিহ্য বাঙালি সংস্কৃতিরই প্রভাবজাত।

৬. পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম : কোন খ্রিস্টান বাঙালির মৃত্যু হলে তার পারলৌকিক কার্য মূলত খ্রিস্টধর্ম মেনে অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মানুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে, নূতন পোষাক পরিয়ে, গায়ে গন্ধ ছড়িয়ে কফিনে রেখে কবর দেওয়া হয়। সৎকার্যেই এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসারী। এছাড়া তিন দিন, সাত দিন এবং চল্লিশ দিন পর পর যে ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয় সেটাও খ্রিস্টধর্মের বিধান অনুসারী। উক্ত দিনগুলিতে খ্রিস্টধর্মের পুরোহিতের পৌরহিত্যে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক জীবনের শান্তি কামনা করা হয়– এটি হয় খ্রিস্টধর্মীয় বিধান মেনে। কিন্তু এর অতিরিক্ত আরো কিছু কিছু আচার বাঙালি খ্রিস্টানরা পালন করেন, যেগুলি বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। মৃত ব্যক্তি পারলৌকিক কার্যের মূল অনুষ্ঠান চল্লিশ দিনের সভার দিন অনেক খ্রিস্টান যে নখ কাটেন তা বাঙালি হিন্দুদের ক্ষৌরকার্যের অনুসারী। মৃত ব্যক্তির কফিন কবরস্থানে বয়ে নিয়ে যায় মূলত তার সন্তানরা, তবে এর অতিরিক্ত যারা সাহায্য করেন এবং যারা কবর কেটে সাহায্য করেন তাদের চল্লিশের সভার দিন বিশেষ যত্নের সাথে আপ্যায়নের রীতি খ্রিস্টান বাঙালিরা হিন্দু বাঙালিদের কাঁধী (যারা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে কাঁধ দেন) সৎকারের রীতি থেকে গ্রহণ করেছে। আবার মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য তার সমাধিতে রাখার বিষয়টাও অনেকটা বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবজাত।

খ্রিস্টান বাঙালিদের অনেকেই চল্লিশের সভায় দিনে ভোজের আয়োজনের পর রাত্রিতে ধর্মীয় সংগীতের আয়োজন করেন। এই ধর্ম-সংগীতের অনুষ্ঠান বাঙালি খ্রিস্টানরা যে হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্টানে কীর্তনগানের সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ

করেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্মে এই রীতি নেই। এপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়, উক্তধর্মীয় সংগীতে অনেক হিন্দুব্যক্তিও আসেন খোল, করতাল বাজিয়ে সহায়তা করতে, যা উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন ও ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে তোলে।

৭. সধবা খ্রীষ্টান নারীর সংস্কার : খ্রিস্টান বাঙালি নারীরা সধবা নারীর চিহ্ন স্বরূপ সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা-পলা-নোয়া পরেন। অনেকে আবার গলায় মঙ্গলসূত্রও পরে থাকেন, যদিও এটা পরা খুব একটা জনপ্রিয় নয়। যা হোক, খ্রিস্টান বাঙালি নারীর সধবার চিহ্নস্বরূপ এইসব অলংকারে বিভূষিত হওয়া যে বাঙালি ঐতিহ্য মেনে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই; কারণ খ্রিস্টধর্মে সধবা নারীর চিহ্নস্বরূপ উক্ত অলংকার গ্রহণের কথা কোথাও বলা নেই। আসলে বাঙালি রক্তই খ্রিস্টান বাঙালিদের উক্ত ঐতিহ্যগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও বাড়ির গুরুজনদের সামনে ঘোমটা পরে বের হওয়া, তাদের প্রণাম করার রীতিগুলি খ্রিস্টান নারী সমাজ চিরায়ত বাঙালি সমাজ থেকে গ্রহণ করেছে।

৮. বিধবা খ্রিস্টান নারীর সংস্কার : বিধবা বাঙালি খ্রিস্টান নারী অবশ্য বিধবা বাঙালি হিন্দু নারীর মত নানান আচার-সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। খ্রিস্টান সমাজের উদার মনোভাবের জন্যই বোধহয় বিধবা খ্রিস্টান বাঙালি নারীর খাদ্য-খাবার গ্রহণে, পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। তাই হিন্দু বিধবার মতো নিরামিষ খাবার বা সাদা থান পরে তাদের জীবন কাটাতে হয় না। তবে বিধবা বাঙালি খ্রিস্টান নারীরা সধবার মতো রং-বেরঙ-এর চটকদার পোশাক পরেন না বরং মার্জিত রঙের পোশাকই তারা পরে থাকেন। বাঙালিহিন্দু বিধবার কৃচ্ছ্রসাধনের ঐতিহ্য পুরোটা না মানলেও কিছুটা মেনে চলার উক্ত প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙালি সংস্কারের মানসিকতাই পরিস্ফুট হয়েছে খ্রিস্টান বাঙালি নারীদের ব্যবহারে।

৯. খাদ্য সংস্কৃতি : খ্রিস্টান ধর্ম যাঁর উপর বিশ্বাস করে গড়ে উঠেছে সেই প্রভু যিশুখ্রিস্টই জানিয়েছেন যে, বাইরে থেকে যা মানব সরীরে প্রবেশ করে তা তাকে অশুচি করে না, কিন্তু ভিতর থেকে (মন) যা বেরিয়ে আসে (মন্দ চিন্তা) তাই মানুষকে অপবিত্র করে। সুতরাং খ্রিস্টের কথা মানলে খ্রিস্টধর্মে কোন খাদ্যই অশুচি নয়। হিন্দু-মুসলমান ধর্মে যে সব খাদ্য (মাংস) নিষিদ্ধ তা বাঙালি খ্রিস্টান সমাজে গ্রহণ করতে ধর্মত কোনো বাধা নেই। তাই বাঙালি খ্রিস্টানদের অনেকেই উক্ত দুই সমাজে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করে থাকেন

আবার অনেকে কিন্তু করেনও না। এই অনীহার পিছনে রুচির একটা ব্যাপার থাকলেও আরো একটি কারণ রয়েছে। তা হল দীর্ঘ দিনের বাঙালি সংস্কার। বাল্যকাল থেকে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে খ্রিস্টান বাঙালির দেহ-মন গড়ে উঠেছে, সেই পরিবেশের খাদ্যের ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা তাদের মনে প্রভাব ফেলেছে। তার ফলে হিন্দু-মুসলিম পরিবৃত্ত অঞ্চলের খ্রিস্টানরা এদের সমাজের নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ পুরোপুরি এড়িয়ে যান।

এতো গেল বাধ্য-বাধকতার ব্যাপার। পারস্পরিক সংস্কৃতি ও আত্মীকরণের একটা উজ্জ্বল দিকও আছে। প্রত্যেক ধর্মের সবচেয়ে আনন্দের সময় হল তাদের আনন্দের দিনগুলি। খ্রিস্টান ধর্মের সবথেকে আনন্দের উৎসব হল 'বড়োদিন' (খ্রিস্টমাস)। অন্যান্য ধর্মের মানুষদের মতো খ্রিস্টানরাও তাদের এই আনন্দের দিনে ভালো ভালো খাদ্য খেতে ভালোবাসেন। বিশ্বের বেশিরভাগ খ্রিস্টানই খ্রিস্টমাস-এর দিন কেক কেটে যিশুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন। বাঙালি খ্রিস্টানদের বেশিরভাগই খ্রিস্টমাস-এ কেক বানান বা কেনেন। কিন্তু এই বিদেশি কেকের সাথে সাথে চিরায়ত ঐতিহ্যের পিঠে বানাতে না পারলে তাদের মন হাঁফিয়ে ওঠে। তাই পিঠে-পুলি-নারকেল নাড়ু-সরু-চাকলি, নলেন-খেজুর গুড়ের পায়েস, লুচি-আলুরদম প্রভৃতি বাঙালি খাদ্যগুলি বাঙালি খ্রিস্টানদের বড়োদিনের আনন্দকে বহুগুণ বিবর্ধিত করে দেয়। এজন্য শহুরে বাঙালি খ্রিস্টানরাও এইসব খাদ্যগুলির জন্য মুখিয়ে থাকেন আর অনেককেই তাই এইসময় গ্রামে ঢু মারতে দেখা যায়।

পাশাপাশি এটাও দেখা যায় আপামর বাঙালি বড়োদিন উপলক্ষে কেক উৎসবে যোগ দেন। কলকাতা থেকে মফঃস্বল বাংলার সর্বত্রই এসময় কেকের ছড়াছড়ি। সারাবছর নানান স্বাদের কেক পাওয়া গেলেও বড়োদিনের কেকের আস্বাদ নিতে আপামর বাঙালি যেন মুখিয়ে থাকে। খাদ্য সংস্কৃতির এই বিস্তার সত্যই আকর্ষণীয়।

বাঙালি খ্রিস্টানদের খাদ্য সংস্কৃতিতে বাঙালি চিরায়ত সংস্কৃতির প্রভাবের আরো এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর সেটা হল খ্রিস্টানদের দুঃখের পরব 'গুডফ্রাইডে'র দিনকার খাদ্য নির্বাচনে। এই দিনেই প্রভু যিশু ক্রুশে সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের পবিত্র প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের পরিত্রাণের পথ খুলে দেন। এজন্যই এই দিনটি পুণ্য শুক্রবার নামে অভিহিত। মানবজাতির মুক্তির পথ উন্মোচিত হওয়ার জন্য গুডফ্রাইডে আনন্দের ব্যাপার হলেও খ্রিস্টানরা তাদের পরিত্রাণ কর্তাকে হারানোর দুঃখে এদিন শোকেই

কাটান। বাইবেলে দুঃখ প্রকাশের নিমিত্ত ইহুদিদের জামা ছিঁড়ে, চট পড়ে, ছাই মেখে শোক করতে দেখা গেছে। বাঙালি খ্রিস্টানরা কিন্তু এভাবে দুঃখ প্রকাশ করেনা। বরং তারা দুঃখ প্রকাশ ঘটায় মানসিক শোক করে। আর তাই মনের দুঃখ হেতু তারা গুডফ্রাইডের দিন খাদ্যতালিকায় শুধু নিরামিশপদকে স্থান দেয়। নিরামিশ খেয়ে দুঃখ প্রকাশের এবং নিজেকে পবিত্র রাখার এই সংস্কৃতি বাঙালি খ্রিস্টানগণ বাঙালি ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় গুডফ্রাইডের আগে চল্লিশদিন খ্রিস্টের উপবাসকালীন দুঃখভোগের সময়ও অনেক বাঙালি খ্রিস্টান উপবাস করেন এবং নিরামিশ খান।

১০. সংগীত : খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনার অন্যতম অঙ্গ ধর্মগীত। বাঙালি খ্রিস্টানরাও তাদের উপাসনায় ধর্মীয় সংগীত গেয়ে থাকেন। বিভিন্ন বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের উপাসনায় নিজস্ব 'ধর্মগীত পুস্তক' ব্যবহার করে থাকেন। এইসব ধর্মগীতের কিছু কিছু বিদেশি ধর্মীয় সংগীত থেকে অনূদিত আর বেশিরভাগই বাঙালিদের নিজের লেখা। যেসব ধর্মগীত বাঙালির লেখা সেই সংগীতগুলির সুর অধিকাংশই চিরায়ত বাংলা সংগীতের সুর থেকে নেওয়া। বাঙালি মুসলমানেরা তাদের উপাসনার কিছু কিছু অংশ বাংলা ভাষায় গেয়ে গেয়ে পাঠ করলেও তার সুর আরবীয় ইসলামীদের মত। কিন্তু বাঙালি খ্রিস্টানরা এদের বিপরীতে অবস্থান করছে। কারণ বাঙালি খ্রিস্টানদের ধর্মগীতগুলি চিরকেলে কীর্তন, একতাল, বাউল, কাওতালি ইত্যাদি বাংলাদেশে ব্যবহৃত সুরের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো আইকন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানও "আগুনের পরশমণি" খ্রিস্টান বাঙালিদের ধর্মগীত পুস্তকে অবলীলায় স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টান বাঙালিদের উদার মনোভাবের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

১১. ধর্মীয় উদারতা, সেবামূলক সংস্কৃতি ও বাঙালি খ্রিস্টান : খ্রিস্টান সংস্কৃতির একটি বড়ো দিক হল তার ধর্মীয় উদারতা এবং সেবাদান। আর তাই যে কোন ধর্মের মানুষ খ্রিস্টানদের উপাসনালয় চার্চ বা গীর্জায় প্রবেশ করতে পারেন। প্রয়োজনে উপাসনাও করতে পারেন। বাঙালি খ্রিস্টানরাও এই ধর্মীয় উদারতার ধারার ব্যতিক্রম নন; সেইসাথে সেবার আদর্শও তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। আর তাই বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তারা ফেরান না, প্রয়োজনে সাধ্যানুযায়ী খাদ্য, পথ্য, পোষাক পর্যন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। আর খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থাগুলি তো প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সেবার মহান আদর্শ তুলে ধরেছে। তারা সাধারণ শিক্ষা, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ, চিকিৎসা, যে কোন

সেবামূলক কাজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলায় এরকম সেবামূলক কাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেসব খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা তার মধ্যে উজ্জ্বল হল মাদার টেরেসার 'মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ', 'নির্মল হৃদয়' প্রভৃতি। এছাড়াও এধরনের অসংখ্য ছোটো-বড়ো খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা বাংলার মানুষকে নানাভাবে সেবা করে যাচ্ছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত 'মহিলা সমিতি' নামক সংস্থা মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে এবং আর্থিক সহযোগিতা করতে ঋণ দান করছে এবং মানুষগুলিকে ছোটো ছোটো স্বপ্ন দেখাতে ও পূরণ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

১২. বাঙালি খ্রিস্টান সংস্কৃতিতে বাঙালিয়ানার স্বরূপ : বাঙালি খ্রিস্টানদের রক্তে রয়েছে গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটির পেলবতা। নদীমাতৃক বাংলার জল হাওয়ায় কোমলতায় বেড়ে উঠেছে বাঙালি খ্রিস্টানরাও। সেইসাথে তাদের রক্তে রয়েছে পূর্বপুরুষদের বাঙালি ঐতিহ্য। তাই তারা আর পাঁচটা বাঙালির মতো স্নেহে বিগলিত, দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। আর এই বাঙালিয়ানার দরুণ তারা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েও পূর্বতন ধর্মীয় সংস্কার-আচারগুলি যেমন ভুলতে পারেনি, তেমন পারেনি ইংরেজদের মতো 'GOD' উচ্চারণে স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরকে ডাকতে। তারা GOD কে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সাযুজ্য রেখে ঈশ্বর বা ভগবান নামে প্রাণের সুরে ডাকতেই স্বচ্ছন্দ, যেমন স্বচ্ছন্দ Jesus (জিজাস)-কে যিশুবাবা বলে ডেকে। আর এজন্যই বাইবেলের বহুনাম বাইবেল বাংলায় অনুবাদের সূচনা লগ্ন থেকেই বাঙালির উচ্চারণ অনুযায়ী সরলীকরণ করে নেওয়া হয়েছে। যার ফলে – অ্যাডাম > আদম, ইব > হবা, পিলেট > পিলাত, পিটার > পিতর, পল > পৌল ইত্যাদি নামের এই পরিবর্তনগুলি ঘটেছে।

আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা প্রতিভাত হয় যে, বাঙালি খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত হলেও তারা কিন্তু বাঙালিই থেকে গেছে। আচারে-বিচারে-সংস্কারে-মননে তাদের রক্তে বাঙালি রক্তের ঐতিহ্যই চিরবহমান। তাই বাঙালি খ্রিস্টানগণ কখনও বাংলা থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখেন না। বাংলা মা তাদের 'মাদার' নয় শুধুই 'মা'। তাই বাঙালি খ্রিস্টান সংস্কৃতিকে বাংলার সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে না দেখে তারই অঙ্গ হিসাবে দেখলেই যথার্থ সংস্কৃতিমনা মনের পরিচয় দেওয়া হবে।

....

UDDALAK
2012-2013
Vol. 12

D.L.No. 55 JM 03
ISSN: 2320-9275

উদ্দালক পাবলিশিং হাউসের বই

রবীন্দ্রবিষয়ক

পুলিন দাস রচিত

মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ : ২৪০ টাকা

সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত ও সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য : ১০০ টাকা

রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন (সম্পাদিত) : ১১০ টাকা

বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে রবি কিরণে নবপুষ্প : ৬০ টাকা

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য রূপ ও রূপান্তর : ৯০ টাকা

প্রতিযোগিতামূলক

নেট-সেট জেনারেল প্রথম পত্র : দ্বিভাষিক ৩০০ টাকা

নেট- সেট বাংলা দ্বিতীয় পত্র : বৈকল্পিক ৪৮০ টাকা

নেট বাংলা তৃতীয় পত্র : বৈকল্পিক ৩৪০ টাকা

সেট বাংলা তৃতীয় পত্র : সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী ৩৬০ টাকা

এস.এস.সি. টেট : ১৮০ টাকা

এস.এস.সি. বাংলা (পাস) : ১৮০ টাকা

এস.এস.সি. বাংলা(অনার্স/পি.জি.) : ১১০ টাকা

সি.টেট (প্রাইমারি) : ৩০০ টাকা

উদ্দালক সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

মধুসূদন-দীনবন্ধু, রবীন্দ্র উপন্যাস, চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি, রবীন্দ্র নাটক, মহাকাব্য ইত্যাদি সংখ্যা সংগ্রহের জন্য পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

দপ্তরের ঠিকানা : ১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা ৭০০০৪৯
দূরভাষ : ০৩৩-২৫৪১-৪৬১৭

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, প্রজ্ঞা বিকাশ, পাতিরাম